মুকাশাফাতুল-ক্বুলূব

বা

আত্মার আলোকমণি

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল

হুজ্জাতুল ইসলাম

ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-গায্যালী (রহঃ)

অনুবাদ

মুফ্তী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

মুহাদ্দিস, জামেয়া আরাবিয়্যাহ্, ফরিদাবাদ, ঢাকা

খতীব, ১নং সিদ্দিক বাজার জামে মসজিদ, ঢাকা

দারুল ইফ্‌তা প্রকাশনী

১নং সিদ্দিক বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ

(নওয়াবপুর রোড সংলগ্ন ঢাকা হোটেলের বিপরীতে)

মুকাশাফাতুল-কুলুব

অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ ঃ
শা'বান, ১৪১৩ হিঃ
মাঘ, ১৩৯৯ বাং
জানুয়ারী, ১৯৯৩ ইং

পরিবেশক ঃ
হক লাইব্রেরী
১৮, বায়তুল মুকাররম
ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র।

MUKASHAFATUL-QULOOB
Written in Arabic by : Huzzatul-Islam Imam Gajjali.
Translated into Bengali by : Mufti Muhammad Ubaidullah.

ইসলামী সাহিত্যের গৌরব, বিশিষ্ট জ্ঞানতাপস, মাসিক মদীনা সম্পাদক
মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের

ভূমিকা

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক লোক-শিক্ষক হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-গাযালী (রাহঃ)-রচিত মুকাশাফাতুল-কুলূব একটা মহামূল্যবান গ্রন্থ। একশত এগারটি অধ্যায়ে সমাপ্ত এই বিরাটায়তন গ্রন্থটি ইমাম সাহেবের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'এহ্য়াউ উলুমুদ্দীন'-এর প্রায় সমপর্য্যায়ের। এ অমূল্য গ্রন্থটি আমাদের দেশে একপ্রকার অপরিচিত রয়ে গিয়েছিল। বৈরুত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শায়খ মুহাম্মদ রশীদ আল-কোব্বানী দুষ্প্রাপ্য সেই গ্রন্থটি সম্পাদনা করে সম্প্রতি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছেন। ফলে ইমাম গাযালীর (রাহঃ) এ গ্রন্থটির সাথেও আধুনিক বিশ্বের পরিচিতি লাভ সহজ হয়েছে।

ইমাম গাযালীকে (রাহঃ) হিজরী পঞ্চম শতকে প্রকাশিত হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা অত্যুজ্জ্বল মোজেযারূপে চিহ্নিত করা হয়। কারণ, প্রাথমিক পাঁচশো বছরের সময়কালের মধ্যে অর্জিত অকল্পনীয় পার্থিব সমৃদ্ধি মুসলিম উম্মাহ্র দৃষ্টিকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ়করণের কথা যখন অনেকটা ভুলিয়ে দিয়েছিল, ঠিক সেরূপ একটা ক্রান্তিকালে ইমাম গাযালীর (রাহঃ) আবির্ভাব ঘটে। তাঁর সাধনাঋদ্ধ ক্ষুরধার লেখনী পথহারা মুসলিম উম্মাহকে নতু করে জাগিয়েছিল। আর সেটা ঘটেছিল আত্মার জাগরণ। বলা হয় যে, ইমাম গাযালীর (রাহঃ) লেখনী দ্বারাই পরবর্তীকালে নূরুদ্দীন জঙ্গী সালাহউদ্দীন আইয়ূবী প্রমুখ দরবেশ রাজন্যবর্গের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। ইতিহাস যাঁদে

করেছে উম্মতের শ্রেষ্ঠ সন্তানরূপে। ইমাম গাযালীর (রাহঃ) নির্দেশেই তাঁর জনৈক সাগরেদ মাগরেব বা মরক্কোয় একই ইসলামী দল গঠন ও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন।

ইমাম গাযালীর (রাহঃ) দর্শন পবিত্র কোরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ নির্ভর। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অন্তরমধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় ও আখেরাতের জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ একীন সৃষ্টি না করা পর্যন্ত পশুজীবনের সাথে মানুষের পার্থক্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। ভয় ও একীন ছাড়া মানুষ হিংস্র পশুর চাইতে কোন অংশে কম তো নয়ই বরং বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণী হওয়ার কারণে অবিশ্বাসী মানব সন্তান হিংস্র পশুর চাইতে অনেক বেশী মারাত্মক হয়ে থাকে। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত মনুষ্যত্বের জাগরণ শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা গতানুগতিক ধর্মাচরণ দ্বারা সম্ভবপর নয়। কারণ, মানুষের শত্রু তার নিজের মধ্যেই অবস্থান করে। নাফ্‌স রূপী সে শত্রুই শয়তানের বাহন। সুতরাং সে শত্রুর মুখে লাগাম এঁটে ওটা খোদাভীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব। এ উপলব্ধি তে উদ্বেলিত হয়েই যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীপুরুষ গাযালী (রাহঃ) রাজকীয় পদমর্যাদা এবং বর্ণাঢ্য জীবন পরিত্যাগ করে নিরুদ্দেশের যাত্রী হয়েছিলেন। সে যাত্রারই অমৃতময় ফসল তাঁর রচিত সবগুলি অমর গ্রন্থ।

আধ্যাত্মিকতা কি এবং তা অর্জন করার পথই বা কোন্‌টি তা অনুধাবন করার জন্য ইমাম গাযালীর গ্রন্থাবলী পাঠ করাই যথেষ্ট। জীবনের তাৎপর্য ও তা উপভোগ করার যেসব পদ্ধতি তিনি বলে গেছেন, জীবনপথে চলতে গিয়ে যে সব বৈরী শক্তির মোকাবেলা করতে হয়, সেগুলিকে যেভাবে তিনি চিহ্নিত করেছেন, তা সর্বকালেই চিরনতুন হয়ে থাকবে। প্রায় হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এখনও গাযালীর লেখা পুরাতন হয়নি। দেশ-কালের সীমানা পেরিয়ে যারাই তাঁর লেখার সাথে পরিচিতি লাভ করতে চায়, তাদের চোখেই সর্বপ্রথম যে সত্যটি ধরা পড়ে, তা হচ্ছে, ইমাম সাহেব যেন সে যুগ এবং সে যুগের লোকগুলিকে লক্ষ্য করেই কথা বলছেন। মানবমনের এতটা গভীরে অন্য কোন দার্শনিক বা লোকশিক্ষক প্রবেশ করতে পেরেছেন বলে আমার জানা নাই। তাই ইমাম গাযালীর রচনা পাঠ করে কোনদিনই রেখে দেওয়া যায়

না। যতই পড়া যায়, ততই যেন আত্মার ক্ষুধা বাড়তে থাকে। মনে হয় প্রতিটি মানুষের নিজস্ব চিন্তা-চৈতন্য নিয়েই বুঝি তিনি কথা বলেছেন।

বাংলাভাষায় ইমাম গাযালীর (রাহঃ) বেশ কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এখনও এমন অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রয়ে গেছে, যেগুলির নামও এদেশে অনেকের জানা নাই। স্নেহভাজন মাওলানা মুফতী উবায়দুল্লাহ্ সাহেব বছরখানেক আগে বিশেষ একটি প্রশিক্ষণ উপলক্ষে কায়রোতে কিছুকাল অবস্থানের সুযোগে সেরূপ কয়েকখানা দুষ্পাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। তন্মধ্যে 'বিদায়াতুল-হিদায়াহ্' নামক পুস্তকখানি তিনি ইতিপূর্বে অনুবাদ করে বাংলাভাষাভাষী পাঠকগণকে উপহার দিয়েছেন। 'মুকাশাফাতুল-ক্বুলূব' তাঁর দ্বিতীয় উপহার। আলোচ্য গ্রন্থটি নিয়ে বিস্তর তাত্ত্বিক আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এতে যেন ইমাম সাহেব পাঠকগণকে সহজ-সরল পন্থায় আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। বইটি পাঠ করলে মনে হয়, পরম প্রিয় মাওলার সান্নিধ্য লাভ করাটাই বুঝি বান্দার নিতান্তই সহজাত একটা সাধনা। এ পথে জটিলতা বা রহস্যময়তা বলতে বুঝি কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই।

আমাদের দেশ আজ আধ্যাত্মিকতার নানা দাবী-দাওয়ার সয়লাবে টই-টুম্বুর হয়ে রয়েছে। কত কিছিমের মারেফাত-চর্চা যে এদেশে হচ্ছে, তা শুমার করে শেষ করাও কঠিন। আর এসব নামধারী মারেফাতসেবীদের প্রধান শিকারই হচ্ছে প্রকৃত ধর্মজ্ঞান বর্জিত সমাজের শিক্ষিত-উচ্চবিত্ত শ্রেণীটা।

উম্মতের মধ্যে যে যুগে যে ধরনের গোমরাহীর প্রাদুর্ভাব বেশী হয়, দ্বীনের সেবক আলেম সমাজের দৃষ্টি আল্লাহ পাক সে সবের প্রতিবিধান-চিন্তার দিকে ফিরিয়ে দেন। বিগত ইতিহাসের বহু ক্রান্তিলগ্নে এ সত্যটি বারবার প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইমাম গাযালী (রাহঃ) পরিবেশিত অমৃতধারার প্রয়োজনীয়তা বড় বেশী বলে মনে করি। আনন্দের বিষয় যে, এ যুগের কিছুসংখ্যক প্রতিভাদীপ্ত আলেমের শ্রম-সাধনা গাযালীর রচনাবলী বাংলাভাষায় প্রকাশ করার প্রতি নিয়োজিত হয়েছে। মাওলানা মুফতী উবায়দুল্লাহ তাঁদেরই

একজন। এলেম ও আমলের মাপকাঠিতে গাযালীর (রাহঃ) রচনাবলী অনুবাদ করার মত যোগ্য কর্মী বলেই আমি তাঁকে বিবেচনা করি। আমার আন্তরিক দোয়া, আল্লাহ্ পাক যেন তাঁর প্রতিভাদীপ্ত যৌবন ইমাম গাযালীর (রাহঃ) রূহানী ফয়যের দ্বারা আরও কর্মোদ্দীপ্ত করে তুলেন।

সমাজের বর্তমান সর্বগ্রাসী অবক্ষয় দৃষ্টে দুর্ভাবনাগ্রস্ত সুধীমণ্ডলীর প্রতি আবেদন, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনীষী ইমাম গাযালীর (রাহঃ) রচনাবলীর মধ্যে তাঁরা বর্তমান সমস্যার সমাধান তালাশ করে দেখতে পারেন। রোগের চিকিৎসা যেমন পরীক্ষিত ঔষধ দ্বারা করতে হয়, তেমনি রুগ্ন সমাজের চিকিৎসাও আত্মার গভীরে বিপ্লব সাধনের মাধ্যমেই কেবল সম্ভব। এক্ষেত্রে গাযালীর শিক্ষা বহু পরীক্ষিত একটি মহৌষধ তাতে সন্দেহ নাই।

আল্লাহপাক আমাদিগকে হক তালাশ করে তা অনুসরণ করার তওফীক দান করুন। আমীন ! !

বিনয়াবনত

মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা, ঢাকা

৩১-১২-৮৮

সূচীপত্র

* * *

অধ্যায় ঃ ৪৮

নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا ۝

"নিশ্চয় মুমিনদের উপর নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা ফরয।" (নিসা ঃ ১০৩)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "পাঁচ ওয়াক্ত নামায আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার উপর ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি সেগুলোর হক আদায় করবে এবং হাল্‌কা মনে করে বরবাদ করবে না, তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে তা না করবে, তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট কোন প্রতিশ্রুতি নাই। ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন আর ইচ্ছা করলে তাকে বেহেশ্‌তেও প্রবেশ করাতে পারেন।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ 'পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ হচ্ছে এরূপ যে, তোমাদের কারও বাড়ীর সম্মুখে যদি একটি স্বচ্ছ নহর থাকে এবং তাতে প্রচুর পানিও থাকে, সেখানে দৈনিক পাঁচবার যদি সে গোসল করে, তবে কি তার শরীরে সামান্যতম ময়লাও অবশিষ্ট থাকবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ না, সামান্যতম ময়লাও অবশিষ্ট থাকবে না। হুযূর বললেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও ঠিক তদ্রূপ ; অর্থাৎ পানির দ্বারা যেমন শরীরের ময়লা দূর হয়ে যায়, নামাযের দ্বারাও ঠিক তেমনি মানুষ পাপের ময়লা হতে স্বচ্ছ-পবিত্র হয়ে যায়।'

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ 'নামাজ এক ওয়াক্ত থেকে অপর ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত পাপসমূহের জন্য কাফ্‌ফারা স্বরূপ

হয় ; যদি কবীরা গুনাহ্ হতে বেঁচে থাকা হয়।' যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ط

"নিশ্চয় নেক আমল দূর করে দেয় পাপসমূহকে।" (হূদ ঃ ১১৪)

উপরোক্ত আয়াতে يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ শব্দের মর্ম হলো, নেক আমল অশুভ কাজের পঙ্কিলতা এমনভাবে দূর করে দেয়, যেন ইতিপূর্বে তা মোটেই ছিল না।

বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি জনৈকা স্ত্রীলোককে চুম্বন করেছিল, অতঃপর সে এসে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে সংবাদ দিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ط اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ط

('নামায কায়েম কর দিনের দুই অংশে এবং রাত্রের কিছু অংশে। নিশ্চয় নেক আমল দুর করে দেয় পাপসমূহকে') তখন সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই আয়াতের বিষয়বস্তু কি আমার জন্য বিশেষভাবে? আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না, এ বিষয় আমার উম্মতের সকলের জন্যই ব্যাপক।

হযরত আবূ উমামাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি হদ্দের (শরয়ী দণ্ডের উপযুক্ত) কাজ করেছি, সুতরাং আমার উপর শাস্তি প্রয়োগ করুন। একথা সে একবার কি দুইবার বলেছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটি কোথায়? সে দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি হাজির। হুযূর বললেন ঃ তুমি কি পূর্ণাঙ্গ

উযূ করে আমাদের সাথে নামায আদায় কর নাই? লোকটি বললো ঃ হাঁ, আদায় করেছি। হুযূর বললেন ঃ 'তোমার কৃত গুনাহ্ মাফ হয়ে গেছে ; মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তুমি যেরূপ নিষ্পাপ ছিলে, এখন তুমি সেরূপ নিষ্পাপ'।' অতঃপর এই আয়াতখানি নাযিল হয় ঃ 'নামায কায়েম কর দিনের দুই অংশে এবং রাতের কিছু অংশে। নেক আমল গুনাহ্সমূহ মাফ করিয়ে দেয়।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'আমাদের এবং মুনাফেকদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায় ফজর ও ইশার জামাতে উপস্থিতির দ্বারা ; তারা এ দুই ওয়াক্তের জামাতে উপস্থিত হয় না। তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ 'নামায দ্বীনের খুঁটি বা শিকড়, যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করলো, সে দ্বীনকে ধ্বংস করলো।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সর্বোত্তম কাজ কোন্টি ? তিনি উত্তর করলেন ঃ ঠিক সময়ে নামায পড়া।

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ পবিত্রতা ও উযূ সহকারে সঠিক সময়ে পাবন্দির সাথে নামায আদায় করবে, কেয়ামতের দিন সেই নামায তার জন্য জ্যোতিঃ, প্রমাণ ও মুক্তিস্বরূপ হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করবে না, কেয়ামতের দিন তার হাশর ফেরাউন ও হামানের সাথে হবে।'

হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ 'নামায জান্নাতের চাবিকাঠি।' তিনি আরও বলেন ঃ 'তওহীদ বা আল্লাহ্র একত্বের পর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ইবাদত হলো নামায। নামাযের চেয়ে আরও অধিক শ্রেষ্ঠ কোন ইবাদত যদি হতো, তবে ফেরেশ্তাগণও তাতে শরীক হতেন। অথচ, ফেরেশ্তাগণের অনেকেই রুকূ অবস্থায়, অনেকেই

---

(১) ওহী অথবা অন্য কোনরূপে হুযূর জ্ঞাত হয়েছিলেন যে, তার অপরাধ কি ছিল। তাই, সে সম্পর্কে তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। তার সে অপরাধ অকৃতভাবে হদ্দের যোগ্য ছিল না। যদিও সে মনে করেছিল তা হদ্দের যোগ্য। তাই, নামাযের দ্বারা তা মাফ হয়ে গেল।

সেজদাবস্থায়, অনেকেই দাঁড়ানো অবস্থায় এবং অনেকেই বসা অবস্থায় ইবাদতরত রয়েছেন।'

হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগ করলো, সে কুফর করলো।' অর্থাৎ ঈমানের বাঁধ খুলে যাওয়ার কারণে বা স্তম্ভ ধ্বসে যাওয়ার কারণে কুফ্রের অতি নিকটবর্তী হয়ে গেল।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায ত্যাগ করে, তার থেকে আল্লাহ্র রাসূলের নিরাপত্তা উঠে যায়।'

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ). বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে নামাযের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তরে নামাযের ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে, প্রতি কদমে তার আমলনামায় একটি নেকী লেখা হয় এবং পরবর্তী কদমে একটি গুনাহ্ মোচন করা হয়। ইকামতের আওয়ায শোনার পর নামাযের দিকে অগ্রসর না হয়ে পশ্চাদপদ হওয়া তোমাদের মোটেই উচিত নয়। তোমাদের মধ্যে যার গৃহ অধিক দূরত্বে আল্লাহ্র কাছে তার পুরস্কারও অধিক। কারণ মসজিদ পর্যন্ত পৌছতে তার পদ্চারণার সংখ্যা বেশী।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَى اللهِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ سُجُودٍ خَفِيٍّ -

'গোপন একাকীত্বে আল্লাহ্কে সেজদা করার চাইতে অধিক নৈকট্য দানকারী আর কোন ইবাদত নাই।'

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ 'যে কোন মুসলমান আল্লাহ্কে যখন সেজদা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তখন তার একটি দর্জা বুলন্দ করেন এবং একটি গুনাহ্ মাফ করেন।'

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করুন, যাতে আমি হাশরের ময়দানে আপনার শাফাআত লাভ করতে পারি এবং জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে পারি। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ

'এ ব্যাপারে তুমি আমাকে বেশী বেশী সেজদার (নামাযের) মাধ্যমে সহযোগিতা করতে থাক।'

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার অধিকতর নিকটতম হয় তখন, যখন সে সেজদায় থাকে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩

"আপনি সেজদা করুন এবং আমার নৈকট্য লাভ করুন।"
(আলাক্ব ঃ ১৯)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ط

"তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের মুখমণ্ডলে সেজদার চিহ্ন থাকবে।"
(ফাতহ্ ঃ ২৯)

এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী উক্ত চিহ্ন দ্বারা নামাযে খুশূ-খুযূর নূরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, আন্তরিক খুশূ-খুযূর প্রতিক্রিয়া বাহ্যিক অবয়বেও প্রকাশ পায়। অপর এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, উক্ত আয়াতে সেজদার সময় মাটিতে কপাল লাগানোর বিষয় বুঝানো হয়েছে। আরও এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী উক্ত আয়াতে সেই নূর ও ঔজ্জ্বল্যকে বুঝানো হয়েছে যা ক্বেয়ামতের দিন নামাযী ব্যক্তির চেহারায় তার উযূর কারণে প্রকাশ পাবে।

হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'পবিত্র কুরআনে সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করার পর আদম-সন্তান যখন সেজদা আদায় করে, তখন ইবলীস শয়তান অদূরে বসে কাঁদতে থাকে আর বলতে থাকে ঃ হায় আফ্‌সূস! আদম-সন্তানকে সেজদার হুকুম করা হয়েছে এবং তৎক্ষণাৎ সে তা পালন করেছে। আর আমাকে সেজদার হুকুম করা হয়েছিল, কিন্তু আমি তা পালন করতে অস্বীকার করেছি। তাই পরিণামে এখন আমার জন্য দোযখ ছাড়া আর কিছু নাই। হযরত আলী ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ 'ইবলীস প্রতিদিন এক হাজার

বার সেজদা করতো, ফলে তার উপাধি হয়েছিল 'সাজ্জাদ' অর্থাৎ অধিক সেজদাকারী।'

বর্ণিত আছে, হযরত উমর ইব্‌নে আব্দুল আযীয (রহঃ) সরাসরি মাটির উপর সেজদা করতেন।

ইউসূফ ইব্‌নে আস্‌বাত (রহঃ) বলেন ঃ "ওহে যুবকেরা! সুস্থ-সবল থাকতে অতি শীঘ্র কিছু করে নাও। বর্তমানে কেবল এক ব্যক্তিই এমন রয়েছেন, যাকে আমি ঈর্ষা করি ; তিনি পূর্ণাঙ্গরূপে রুকূ-সিজদাহ্ করেন। এখন দূরত্বের কারণে তাঁর সাথে আমার মোলাকাত হয় না।"

হযরত সাঈদ ইব্‌নে জুবায়ের (রহঃ) বলেন ঃ এ জগতের কোন বস্তু বা বিষয়ের জন্য আমার আদৌ কোন আফসূস হয় না ; কিন্তু কখনও যদি আমার একটি সেজদা কম হয়ে যায়, তখন আফসূসের কোন সীমা থাকে না।

হযরত উক্‌বা ইব্‌নে মুসলিম (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ কামনা করার গুণটি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে খুবই প্রিয়। বান্দা আল্লাহ্‌র সর্বাধিক কাছাকাছি হয় তখন, যখন সে সেজদায় থাকে।'

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ 'সেজদার সময় বান্দা আল্লাহ্‌র নিকটতম সান্নিধ্যে পৌঁছে যায়। সুতরাং এ সময়টিতে অন্তর ভরে খুব দো'আ করে নেওয়া চাই।'

অধ্যায় ঃ ৪৯

বে-নামাযীর শাস্তি

আল্লাহ্ তা'আলা দোযখীদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ٥ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ٥ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ٥ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ٥

"কোন্ বস্তু তোমাদের দোযখে দাখেল করলো? তারা বলবে—আমরা না নামায পড়তাম, আর না দরিদ্রদের খানা খাওয়াতাম, আর (যারা সত্য ধর্মকে বিলুপ্ত করার চেষ্টায় রত ছিল সেই) প্রচেষ্টাকারীদের সাথে আমরাও চেষ্টা রত থাকতাম। (মুদ্দাস্‌সির ঃ ৪২–৪৫)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلٰوةِ

'বান্দা ও কুফ্‌রীর মধ্যে (যোগসেতু) হলো নামায ত্যাগ করা।' (অর্থাৎ নামায ত্যাগ করলে বান্দার কুফ্‌রীতে পতিত হতে বিলম্ব থাকে না)

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ আমাদের ও তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে যে অঙ্গীকার রয়েছে, তা হলো নামায। সুতরাং যে নামায ত্যাগ করবে, সে (প্রকাশ্যে) কাফের হয়ে যাবে।

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جِهَارًا

'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করলো, সে প্রকাশ্যে কুফ্‌রী করলো।'

হযরত উবাদাহ্ ইব্‌নে ছামেত (রাযিঃ) বলেন ঃ 'আমার প্রাণপ্রিয় দোস্ত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাকে সাতটি নছীহত করেছেন। তন্মধ্যে (চারটি এই)—এক, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে বা কোন কিছুকে শরীক করো না, এমনকি যদি তোমাকে কেটে টুক্‌রা টুক্‌রাও করে ফেলা হয় বা আগুনে নিক্ষেপ করা হয় বা শূলিতে চড়ানো হয়। দুই, স্বেচ্ছায় কখনও নামায ত্যাগ করো না। কারণ, এরূপ ব্যক্তি দ্বীন ও মিল্লাতের গণ্ডিবহির্ভূত হয়ে যায়। তিন, আল্লাহ্‌র না-ফরমানী ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ো না। কেননা, পাপকর্ম আল্লাহ্ তা'আলার রোষ ও অসন্তুষ্টির কারণ হয়। চার, মদ্যপান করো না। কারণ, মদ্যপান সর্ববিধ গুনাহের শিকড়।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ যাবতীয় আমলের মধ্যে একমাত্র নামায ব্যতীত অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফ্‌রী বলে মনে করতেন না।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ 'কুফ্‌র ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য হয় নামাযের দ্বারা ; সুতরাং যে নামায ত্যাগ করলো, সে শিরক করলো।'

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'যে নামায ত্যাগ করলো, ইসলামে তার কোন অংশ নাই। আর যার উযূ সঠিক নয়, তার নামাযও দুরুস্ত নয়।'

ত্ববরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যার আমানতদারী নাই, তার (পূর্ণ) ঈমান নাই। আর যার নামায নাই, তার দ্বীন বলতে কিছু নাই। বস্তুতঃ দ্বীনের জন্য নামাযের গুরুত্ব এমন, যেমন শরীরের জন্য মাথার গুরুত্ব।

হযরত আবুদ্দারদা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নছীহত করেছেন ঃ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করো না, এমনকি যদি তোমাকে কেটে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেওয়া হয় বা আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বা শূলিতে চড়ানো হয়। ফরয নামায কখনও ত্যাগ করো না ; যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করবে, তার বিষয়ে আমার কোন দায়িত্ব থাকবে না। মদ্যপান করো না, কারণ, তা

সকল পাপাচারের মূল।'

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁর চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি যখন হ্রাস পেয়েছিল, তখন কেউ তাকে বলেছিল, আপনি কয়েকদিনের জন্য নামায থেকে বিরত থাকলে আমরা আপনার চিকিৎসা করে সেরে নিতাম। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বললেন ঃ 'যে নামায ত্যাগ করবে, ক্বেয়ামতের দিন সে আল্লাহ্‌র সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার উপর খুবই রাগান্বিত থাকবেন।'

ত্ববরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন কিছু উপদেশ দান করুন, যে অনুযায়ী আমল করলে আমি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারি। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ 'তোমাকে যদি কঠিন শাস্তিও দেওয়া হয় বা আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তবুও আল্লাহ্‌র সঙ্গে শির্‌ক করো না। পিতা-মাতার অবাধ্যতা করো না, এমনকি তারা যদি তোমাকে তোমার ধন-সম্পদ ও সর্বস্ব থেকে বঞ্চিতও করে দেয়, তবুও তাদের অবাধ্যতা থেকে বিরত থাক। আর স্বেচ্ছায় কখনও নামায ত্যাগ করো না। কারণ, নামায ত্যাগকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহদৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে যায়।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তোমাকে হত্যা করা হলে বা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলেও আল্লাহ্‌র সঙ্গে শির্‌ক করো না, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করো না ; তারা যদি তোমাকে তোমার ধন-সম্পদ ও স্ত্রী-পরিজন থেকে পৃথক হয়ে যেতে বলে, তবুও তাদের বাধ্য থাক। ফরয নামায স্বেচ্ছায় কখনও ত্যাগ করো না। কারণ, এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা হতে বঞ্চিত। শরাব পান করো না। কারণ, শরাব সর্ববিধ পাপের মূল। গুনাহ্ থেকে পরহেয কর, কেননা গুনাহ্ আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও রোষের কারণ হয়। জেহাদের ময়দান হতে পলায়ন করো না, এমনকি ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি দেখা দিলেও নয়। সাধারণভাবে মৃত্যু (মহামারী) দেখা দিলেও তুমি দৃঢ়পদ থাক। সামর্থ অনুযায়ী পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ কর, তাদের প্রতি শাসনের বেত্র উত্তোলিত রাখতে অবহেলা করো না, সদা আল্লাহ্‌র ভয় প্রদর্শন কর।'

ইব্‌নে হাব্বানে বর্ণিত হয়েছে, 'মেঘলা দিনে সঠিক সময়ে আগে-ভাগে নামায পড়। যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করলো, সে কুফ্‌রী করলো।'

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায ত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার নাম দোযখের দরজায় লিখে দিবেন, যা দিয়ে সে প্রবেশ করবে।

বায়হাকী শরীফে আছে, যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করলো, তার এরূপ ক্ষতি হলো, যেমন তার ধন-সম্পদ ও আত্মীয়-পরিজন ধ্বংস হয়ে গেল।

হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

وَاللّٰهِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَتُقِيمُنَّ الصَّلٰوةَ وَلَتُؤْتُنَّ الزَّكَاةَ اَوْ لَابْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلًا فَيَضْرِبُ اَعْنَاقَكُمْ عَلَى الدِّيْنِ -

'ওহে কুরাইশবংশীয় লোকেরা! শুনে রাখ,—আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা অবশ্যই নামায পড়, যাকাত আদায় কর। তা-নাহলে তোমাদের উপর এমন লোককে জয়ী করে দেওয়া হবে, যে দ্বীনের জন্য তোমাদেরকে হত্যা করবে।'

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামে চারটি বিষয়কে অতি অবশ্য ও অপরিহার্য কর্তব্যরূপে ফরয করে দিয়েছেন ঃ নামায, যাকাত, রমযানের রোযা ও হজ্জে বাইতুল্লাহ ; যদি কেউ যে কোন একটিও পরিত্যাগ করে বাকী তিনটির উপর আমল করে, তবুও কোন কাজে আসবে না, যাবৎ সে সব কয়টি বিষয়ের উপর আমল না করবে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ হতে সকল তত্ত্বজ্ঞানী এ ব্যাপারে একমত যে, 'বিনা উযরে যদি কেউ নামায আদায় না করে সময় পার করে দেয়, তাহলে এরূপ ব্যক্তি কাফের।'

হযরত আইয়ূব (রহঃ) বলেন ঃ 'নামায ত্যাগ করা কুফ্‌র,—এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নাই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝ اِلَّا مَنْ تَابَ

"তাদের পর এমন না-লায়েক লোক জন্মালো, যারা নামায বিনষ্ট করে দিল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। সুতরাং তারা শীঘ্রই বিপদ দেখবে। অবশ্য যারা তওবা করছে।" (মারইয়াম ঃ ৫৯)

হযরত ইব্নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন ঃ 'উক্ত আয়াতে উল্লিখিত اضاعوا শব্দের অর্থ 'একেবারে নামায ত্যাগ করা নয় ; বরং এর অর্থ,—নামাযের নির্ধারিত সময় পার করে দেওয়া—এরূপ ব্যক্তিদের জন্য উপরোক্ত আয়াতে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যতম তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইব্নে মুসাইয়্যাব (রহঃ) বলেন ঃ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ অর্থ হচ্ছে, তারা নামাযের ব্যাপারে এতোই গাফেল যে, যোহরের সময় পার হয়ে আছরের সময় উপস্থিত হয়ে যায়, অনুরূপ আছর পার হয়ে মাগরিব, মাগরিব পার হয়ে ইশা, ইশা পার হয়ে ফজর—তবুও তারা নামাযের ব্যাপারে সচেতন হয় না। এহেন অবস্থা থেকে যদি তারা তওবা না করে, তবে তাদের জন্য উপরোক্ত আয়াতে غَيّ (জাহান্নামের একটি উপত্যকা)-এ পতিত হওয়ার ঘোষণা রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ۝

"হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন আল্লাহ্র স্মরণ থেকে তোমাদেরকে গাফেল করতে না পারে। আর যারা এরূপ করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (মুনাফিকূন ঃ ৯)

উক্ত আয়াতে ذِكْر দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যে সকল লোক পার্থিব ধন-সম্পদের মোহে পতিত হয়ে ক্রয়-বিক্রয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্যে বা পরিবার-পরিজনের মায়া-মমতার দরুন নামাযে

অবহেলা প্রদর্শন করবে, তারা নির্ঘাত ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝

"অতএব বড় সর্বনাশ ঐ সকল নামাযীর জন্য যারা নিজেদের নামাযকে ভুলে থাকে।" (মাউন ঃ ৪,৫)

হযরত সা'দ ইব্‌নে ওয়াক্কাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমি উক্ত আয়াতের মর্ম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছেন ঃ এরা হচ্ছে ওইসব লোক, যারা নির্ধারিত সময় পার করে নামায পড়ে।' হযরত মুসআব ইব্‌নে সা'দ (রহঃ) বলেনঃ 'উক্ত আয়াত সম্বন্ধে আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নামাযে ভুল-ভ্রান্তি বা এদিক-সেদিক চিন্তা করা থেকে তো আমরা কেউ মুক্ত নই? তিনি বললেন ঃ আয়াতের অর্থ এই নয়, বরং এ আয়াতে ওইসব লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা নামাযের নির্ধারিত সময় পার করে দেয়।' وَيْل দ্বারা কঠিন শাস্তি বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন ঃ وَيْل জাহান্নামের একটি উপত্যকা দুনিয়ার সমস্ত পাহাড়-পর্বতকে যদি একত্রিত করে তাতে নিক্ষেপ করা হয়, তবে সেই উপত্যকার তাপে বিগলিত হয়ে যাবে। নামাযের ব্যাপারে অবহেলাকারী এবং অসময়ে নামায পাঠকারীদের জন্য তা' হবে আবাসস্থল। অবশ্য যারা সত্যিকার তওবা-অনুতাপ করবে এবং উক্ত অবহেলা পরিহার করবে তারা নিস্কৃতি পাবে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَ اَنْجَحَ وَ اِنْ نَقَصَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ـ

"কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার যে আমলের হিসাব হবে, তা হচ্ছে নামায। যদি নামায সঠিক হয়, তবে সে কৃতকার্য ও উত্তীর্ণ হবে। আর

যদি নামায ত্রুটিপূর্ণ হয়, তবে সে অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

ত্ববরানী ও ইব্‌নে হাব্বানে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَّبُرْهَانًا وَّنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ۔

"যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে, কেয়ামতের দিন সেই নামায তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তিস্বরূপ হবে। আর যে ব্যক্তি এর হেফাজত করবে না, তার জন্য তা জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তিস্বরূপ হবে না। সুতরাং কিয়ামতের দিন সে কারূন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইব্‌নে খালাফের সাথে হবে।"

নামায ত্যাগকারী লোকদের হাশর উপরোক্ত ব্যক্তিদের সাথে এজন্যে হবে যে, যে ব্যক্তিকে ধন-সম্পদের মায়া-মোহ্ নামায থেকে বিরত রেখেছে, তার সামঞ্জস্য হয় কারূনের সাথে, তাই এরূপ লোকের হাশর হবে তারই সাথে। যে ব্যক্তিকে রাজত্বের মোহ্ নামায থেকে উদাসীন করে রেখেছে, তার সামঞ্জস্য হয় ফেরাউনের সাথে, তাই এরূপ লোকের হাশর হবে তারই সাথে। আর যে ব্যক্তিকে চাকরী-নকরী বা মন্ত্রীত্বের মোহ্ নামায থেকে গাফেল করে রেখেছে, তার সামঞ্জস্য হয় হামানের সাথে, তাই এরূপ লোকের হাশর হবে হামানেরই সাথে। অনুরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকার্যরত লোকদের সামঞ্জস্য উবাই-ইব্‌নে খলফের সাথে, তাই তাদের হাশর হবে তারই সাথে।'

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি বিনা উযরে দুই ওয়াক্ত নামায (এক ওয়াক্তকে বিলম্বিত করে অপর ওয়াক্তের সাথে) একত্রিত করে পড়লো, সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হলো।'

নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'নামাযসমূহের মধ্যে একটি নামায এমন রয়েছে, যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করলো, সে এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হলো, যেন তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল। সেটি আছরের নামায।'

অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, 'উক্ত আছরের নামায তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা এর হক রক্ষা করে নাই। এখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই নামাযের হেফাজত করবে, তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। এই নামাযের পর তারকা উদিত হওয়া (অর্থাৎ সন্ধ্যা) পর্যন্ত আর কোন নামায নাই।'

আহমদ, বুখারী ও নাসায়ী শরীফে বর্ণিত, যে ব্যক্তি আছরের নামায ত্যাগ করলো, তার আমল ধ্বংস হয়ে গেল।

ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত সামুরা ইব্‌নে জুন্‌দুব (রাযিঃ) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের কেউ কি কোন স্বপ্ন দেখেছ? কেউ কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে তাঁর নিকট বলতেন, যা আল্লাহ্‌ চাইতেন। একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'রাতে আমার নিকট দু'জন আগন্তুক (ফেরেশ্‌তা) আসলো। তারা আমাকে জাগিয়ে উদ্বুদ্ধ করে বললো, চলুন! আমি তাদের সাথে চললাম। এভাবে আমরা একজন লোকের নিকট পৌঁছলাম, সে কাত হয়ে শুয়েছিল। অপর একজন তার নিকট পাথর হাতে দাঁড়ান। সে তার মাথা লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করছে, এতে তার মাথা ফেটে যাচ্ছে, আর পাথর অনেক নীচে গিয়ে পড়ছে। সে আবার পাথরের পিছনে পিছনে গিয়ে পাথরটি নিয়ে আসতে না আসতেই তার মাথা পূর্বের ন্যায় ভাল হয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে সে পুনরায় পূর্বের ন্যায় আচরণ করছে। আমি ফেরেশ্‌তাদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, সুব্‌হানাল্লাহ্‌! বলুন, এরা কারা? তারা বললেন, সামনে চলুন। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে অপর একজনকে পেলাম, যে চিৎ হয়ে শুয়েছিল। আরেকজন তার নিকট লোহার সাঁড়াশী হাতে দাঁড়ান ছিল। সে এই সাঁড়াশী দ্বারা একের পর এক তার মুখমণ্ডলের একাংশ চিরে গলার পিছন পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। অনুরূপ তার নাসাভ্যন্তর ও চোখ চিরে পিছন পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। বর্ণনাকারী

বলেন, আবূ রাজা বেশীর ভাগ সময় এরূপ বলতেন, সে একদিকে কেটে অপর দিকে কাটতো। অপর দিকে কাটা শেষ হতে না হতেই প্রথম দিকটা পূর্বের ন্যায় ভাল হয়ে যেত, এভাবে বারবার এরূপই করতো যেরূপ প্রথম করেছিল। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ্! বলুন, এরা দুজন কে? তারা বললেন, সামনে চলুন। সামনে আমরা একটি চুলার নিকট গিয়ে পৌছলাম। তিনি বললেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, আমি সেখানে শোরগোলের শব্দ শুনতে পেলাম, যাদের নীচ থেকে আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছিল। আগুনের আওতায় আসলেই তারা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে উঠতো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তাঁরা বললেন, সামনে চলুন। সামনে অগ্রসর হয়ে আমরা একটি নহরের নিকট পৌছলাম। আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন, সেটি ছিল রক্তের লাল নহর। নহরে একজনকে সাতরাতে দেখলাম। নহরের পাড়ে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, যার নিকট ছিল অসংখ্য পাথরের স্তূপ। সাতারকারী লোকটি সাতরানো শেষ করে দাঁড়ানো লোকটির নিকট এসে মুখ খুলে দিতো। আর সে তার মুখে একটি পাথর নিক্ষেপ করতো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তাঁরা বললেন, সামনে চলুন। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে একজন বীভৎস চেহারার লোক দেখতে পেলাম, যেরূপ তোমরা কোন বীভৎস চেহারার লোক দেখে থাক। তার নিকট ছিল আগুন। সে আগুন জ্বালাচ্ছিল আর তার চতুর্দিকে দৌড়াচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোক কে? তারা বললেন, সামনে চলুন। সামনে আমরা এক ঘন সন্নিবিষ্ট বাগানে উপনীত হলাম। বাগানটি বসন্তের রকমারি ফুলে সুশোভিত ছিল। বাগানের মাঝে ছিল একজন লোক। যার আকৃতি এতখানি দীর্ঘকায় ছিল যে, আমরা তার মাথা দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাঁর চারপাশে এত বিপুলসংখ্যক বালক ছিল, যেরূপ আর কখনও আমি দেখি নাই। জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোক কে? আর এরাই বা কারা? তারা বললেন, সামনে চলুন, সামনে চলুন। অবশেষে আমরা এক বিরাট বাগানে গিয়ে উপনীত হলাম। এরূপ বড় ও সুন্দর বাগান আমি আর কখনও দেখি নাই। তাঁরা আমাকে বললেন, এর উপর আরোহণ করুন। আমরা তাতে আরোহণ করলে একটি শহর আমাদের নজরে পড়লো। সেটি ছিল সোনা ও রূপার ইট দিয়ে তৈরী। আমরা ওই শহরের দরজায় পৌছলাম। দরজা খুলতে বললে

আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হলো। ভিতরে প্রবেশ করে আমরা কিছু লোকের সাক্ষাৎ পেলাম। যাদের শরীরের অর্ধেক খুবই সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল। যেরূপ তোমরা খুব সুন্দর কাউকে দেখে থাক। আর অর্ধেক ছিল খুবই কদাকার। যেরূপ তোমরা খুব কদাকার কাউকে দেখে থাক। তারা উভয়ে ঐ লোকদের উদ্দেশ্যে বললো যাও, তোমরা এ ঝর্ণায় নেমে পড়। দেখা গেল প্রস্থের দিকে লম্বা প্রবহমান একটি ঝর্ণা রয়েছে। তার পানি ছিল সম্পূর্ণ সাদা। তারা গিয়ে ঝর্ণায় নেমে পড়লো। তারপর তারা আমাদের নিকট আসলো। দেখা গেল তাদের কদাকৃতি দূর হয়ে গেছে। এখন তারা খুব সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট হয়ে গেছে। ফেরেশ্‌তাদ্বয় আমাকে জানালেন, "এটাই 'আদ্‌ন' নামক বেহেশ্‌ত, এটাই আপনার বাসস্থান। আমি উপরের দিকে তাকালাম, দেখলাম— ধবধবে সাদা মেঘের ন্যায় এক অট্টালিকা। তাঁরা আমাকে জানালেন, 'এটাই আপনার প্রাসাদ।' আমি বললাম, 'আল্লাহ্‌ আপনাদের উভয়ের কল্যাণ করুন, আমাকে ছেড়ে দিন আমি এতে প্রবেশ করবো। তাঁরা বললেন, এখন নয়, তবে এতে আপনি অবশ্যই প্রবেশ করবেন। আমি তাদের বললাম, সারা রাত্র ধরে আমি অনেক অনেক আশ্চর্য জিনিস প্রত্যক্ষ করলাম, এগুলোর তাৎপর্য কি? তারা উভয়ে বললেন, এখন আমরা তা আপনাকে জানাবো। প্রথম যে ব্যক্তির নিকট আপনি গিয়েছেন, যার মাথা পাথর মেরে মেরে চৌচির করা হচ্ছিল, সে কুরআন মুখস্থ করে (তার উপর আমল) ছেড়ে দিতো, আর ঘুমিয়ে ফরজ নামায ত্যাগ করতো। আর যে ব্যক্তির নিকট আপনি গেলেন, যার গলদেশের পিছন পর্যন্ত চেরা হচ্ছিল, আর নাসাভ্যন্তর ও তার চোখ পিঠ পর্যন্ত চেরা হচ্ছিল, সে সকাল বেলা আপন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতো আর চতুর্দিকে মিথ্যার বেসাতি করে বেড়াতো। আর ঐ উলঙ্গ নারী-পুরুষ যাদেরকে প্রজ্জ্বলিত চুলায় দেখেছেন, তারা ছিল যেনাকার পুরুষ ও যেনাকার নারী। আর যে লোক ঝর্ণায় সাঁতরাচ্ছিল, যার নিকট দিয়ে আপনি গিয়েছিলেন, যে পাথরের লোকমা খাচ্ছিল, সে ছিল সুদখোর। আর ঐ কদাকার ব্যক্তি যাকে আপনি আগুনের নিকট দেখেছিলেন আর যে আগুন জ্বালিয়ে তার চার দিকে দৌড়াচ্ছিল, সে দোযখের দারোগা মালেক ফেরেশ্‌তা। বাগানে যে দীর্ঘাকৃতির লোককে দেখেছেন, তিনি ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌ সালাম। আর তাঁর চারপাশে যে বালকদেরকে দেখেছেন,

তারা ছিল ঐসব শিশু যারা স্বভাবধর্মের (ইসলাম) উপর মৃত্যুবরণ করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, মুসলমানদের কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! মুশরিকদের সন্তানরা কোথায়? তিনি বলেছেন, তারাও সেখানে ছিল। আর যাদের অধিক অংশ অত্যন্ত সুন্দর ছিল আরেক অংশ ছিল অত্যন্ত কদাকার, তারা ছিল ঐসব লোক, যারা ভাল-মন্দ উভয় কাজ মিশ্রিতভাবে করেছিল। আল্লাহ্ তাদের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

বায্‌যার সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে, অতঃপর হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু লোকের পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, যাদের মাথায় প্রস্তরাঘাত করা হচ্ছে। পাথরের আঘাতে মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং নিক্ষিপ্ত পাথরগুলো ছিটকিয়ে দূরে গিয়ে পড়ছে। আঘাতকারী পাথর তুলে আনার সময়টিতে ঐ চূর্ণ-বিচূর্ণ মাথা পুনরায় ঠিক হয়ে যাচ্ছে এবং পুনরায় ঐ পাথর দিয়ে তাদের মাথায় আঘাত করা হচ্ছে—এভাবে বার বার করা হচ্ছে। হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এরা কারা? তাদের অপরাধই বা কি? জিব্‌রাঈল বললেন ঃ এরা দুনিয়াতে নামায পরিত্যাগ করেছে ; এ দায়িত্বের বোঝায় তাদের মাথা ভার হয়ে রয়েছে।'

খতীব ও ইব্‌নে নাজ্জার রেওয়ায়াত করেছেন, 'নামায ইসলামের পতাকা বা উজ্জ্বল প্রতীক। এই নামাযের জন্য যে ব্যক্তি নিজের অন্তরকে ফারেগ করে নিবে এবং নির্ধারিত সময় ও সুন্নত মুতাবেক আদায় করবে, (তার সম্পর্কে বলা যায়) সে মুমিন।'

ইব্‌নে মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِفْتَرَضْتُ عَلٰى اُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِىْ عَهْدًا اَنَّ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِىْ

'আমি তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি এবং আমি এই অঙ্গীকার নিয়েছি, যে ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, আমি তাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাবো। পক্ষান্তরে,

যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করবে না, তার নিরাপত্তা সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্ব নাই।'

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি নামাযের ফরযিয়ত ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে পরিপক্ক একীন সহকারে তা আদায় করবে, সে বেহেশ্‌ত লাভ করবে।'

অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ فَاِنْ كَانَ اَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ اَتَمَّهَا قَالَ لِمَلَائِكَتِهِ اُنْظُرُوا هَلْ تَجِدُوْنَ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمِّلُوْنَ بِهَا فَرِيْضَتَهُ ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذٰلِكَ ثُمَّ تُوْخَذُ الْاَعْمَالُ عَلٰى حَسَبِ ذٰلِكَ.

'ক্বেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার যে আমলের হিসাব নেওয়া হবে, তা হবে নামায। যদি তা সঠিক পাওয়া যায়, তাহলে সে সফলকাম হবে এবং নিজ লক্ষ্যে পৌঁছবে। আর যদি নামাযে গলদ থাকে, তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি তার ফরযগুলোর মধ্যে কোন কম্‌তি থাকে, তবে মহান প্রতিপালক আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন, দেখ, আমার বান্দার কিছু নফলও আছে কিনা? এর সাহায্যে তার ফরযগুলোর কম্‌তি পূরণ করে দাও। তারপর সমস্ত আমলের হিসাব এভাবেই পূরণ করা হবে।'

ত্বব্‌রানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَوَّلُ مَا يُسْئَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْظَرُ فِىْ صَلَاتِهِ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔

'ক্বেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দাকে যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, তা হবে নামায। নামাযের হিসাব-নিকাশে যদি তাকে সঠিক পাওয়া যায়, তবে

সে কামিয়াব। আর যদি নামাযের বিষয়ে কোন গলদ থাকে, তবে সে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।'

ত্বায়ালিসী ও ত্বব্রানী বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'একদা আল্লাহ্র পক্ষ হতে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম আমার নিকট এসে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমি তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে সঠিক সময়ে নামায আদায় করবে এবং রুকূ সেজদা পূর্ণভাবে আদায় করবে, তার জন্য আমার নিকট প্রতিশ্রুতি রয়েছে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে ব্যক্তি তা করবে না, তার জন্য আমার নিকট কোন প্রতিশ্রুতি নাই। ইচ্ছা করলে আমি তাকে শাস্তিও দিতে পারি আর ইচ্ছা করলে মা'ফও করতে পারি।'

বায়হাকী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'নামাযের একটি মীযান (পাল্লা) আছে, যে ব্যক্তি (সঠিকভাবে নামায পড়ে) তা' পূর্ণ করবে, সে পরিপূর্ণ সওয়াব পাবে।'

দীলামী রেওয়ায়াত করেন, 'নামায শয়তানের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ করে দেয়, দান–খয়রাত তার পৃষ্ঠ চূর্ণ–বিচূর্ণ করে দেয়, একমাত্র আল্লাহ্র নিমিত্ত ও ইল্মের খাতিরে কাউকে মহব্বত করা শয়তানের মূলোৎপাটন করে দেয়, এতদ্বারা শয়তান তোমাদের থেকে এত দূরত্বে সরে যায়, যত দূরত্ব রয়েছে পূর্ব প্রান্ত ও পশ্চিম প্রান্তের মাঝে।'

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَادُّوا زَكَاةَ اَمْوَالِكُمْ وَاَطِيعُوا ذَوِى اَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ-

'আল্লাহ্কে ভয় কর, নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়, তোমাদের (রমযান) মাসটির রোযা রাখ, তোমাদের মালের যাকাত দাও, তোমাদের কর্মকর্তার অনুগত থাক, তাহলে তোমরা তোমাদের রব্বের বেহেশ্তে প্রবেশ লাভ করবে।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল হচ্ছে সঠিক সময়ের নামায, তারপর পিতা–মাতার সাথে সদ্ব্যবহার, তারপর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ।'

বায়হাক্বী শরীফে বর্ণিত, হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দ্বীন ইসলামের কোন্ আমলটি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়? তিনি বললেন ঃ 'সঠিক ওয়াক্তে নামায পড়া ; যে ব্যক্তি নামায তরক করলো, তার দ্বীন বলতে কিছু রইল না, বস্তুতঃ নামায দ্বীনের স্তম্ভ।' বর্ণিত আছে, নামাযের উক্তরূপ গুরুত্বের কারণেই হযরত উমর (রাযিঃ)কে তাঁর অন্তিমকালীন মারাত্মক যখমীর (আহত) সময় যখন নামাযের কথা বলা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, অবশ্যই নামাযকে কোন অবস্থায়ই নষ্ট হতে দেওয়া যায় না ; কেননা, যার নামায নাই, তার মধ্যে দ্বীন–ইসলামের কোন অংশ নাই। তাই, হযরত উমর (রাযিঃ) এমন অবস্থায় নামায পড়ছিলেন, যখন তাঁর দেহ থেকে রক্ত ঝরছিল।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়ে, তার নামায নূরানী হয়ে আরশ পর্যন্ত আরোহণ করে এবং নামাযীর জন্য সে এই বলে দো'আ করতে থাকে যে, তুমি যেরূপ যত্নের সাথে আমাকে সম্পন্ন করেছ, আল্লাহ্ তোমাকে তদ্রূপ যত্ন ও সস্নেহে রক্ষণাবেক্ষণ করুন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ঠিকমত নামায আদায় করে না, তার নামায কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে উর্ধ্বগগনে উত্থিত হয় এবং উক্ত নামাযকে পুরাতন ছেঁড়া কাপড়ের ন্যায় পুটুলী বেঁধে সেই নামাযীর মুখের উপর নিক্ষেপ করা হয়।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'তিন শ্রেনীর লোকের নামায আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেন না। তন্মধ্যে এক শ্রেনীর লোক তারা, যারা সময় পার হয়ে যাওয়ার পর নামায পড়ে।'

কোন কোন আলেম বলেছেন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَاةِ اَكْرَمَهُ اللّٰهُ بِخَمْسِ خِصَالٍ يَرْفَعُ عَنْهُ ضَيْقَ الْعَيْشِ وَعَذَابَ الْقَبْرِ وَيُعْطِيهِ اللّٰهُ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهٖ وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

'যে ব্যক্তি যাবতীয় শর্তসহ যথারীতি নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পাঁচটি পুরস্কারে ভূষিত করবেন। যথা ঃ– **এক**, রিযিকের অভাব দূর করে দিবেন। **দুই**, কবরের আযাব থেকে মুক্ত রাখবেন। **তিন**, আমলনামা ডান হাতে দিবেন। **চার**, বিদ্যুৎগতিতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। **পাঁচ**, বিনা হিসাবে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।'

আর যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে গাফলতি ও অবহেলা করবে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা পনেরটি শাস্তি দিবেন ; পাঁচটি দুনিয়াতে, তিনটি মৃত্যুর সময়, তিনটি কবরে এবং তিনটি কবর থেকে বের হওয়ার পর হাশরের ময়দানে।

দুনিয়াতে পাঁচটি শাস্তি, যথা ঃ– **এক**, তার সময় ও জীবিকায় বরকত থাকবে না। **দুই**, তার চেহারায় নেক লোকের চিহ্ন থাকবে না। **তিন**, যে কোন নেক আমল সে করবে আল্লাহ্র নিকট তার কোন সওয়াব পাবে না। **চার**, তার কোন দো'আ কবূল হবে না। **পাঁচ**, নেক লোকদের কোন দো'আও তার পক্ষে কবূল হবে না।

মৃত্যুকালীন তিনটি শাস্তি, যথা ঃ– এক, অপমৃত্যু ঘটবে। **দুই**, অভুক্ত অবস্থায় মারা যাবে। **তিন**, পিপাসার্ত অবস্থায় মৃত্যু হবে ; তখন এত বেশী পিপাসা হবে যে, কয়েক সাগরের পানি পান করালেও তার পিপাসা মিটবে না।

কবরের তিনটি শাস্তি, যথা ঃ– এক, বেনামাযীর কবর এত সংকীর্ণ হবে যে, তার শরীরের দু'দিকের পাঁজর একে অপরের ভিতর ঢুকে যাবে। **দুই**, কবর অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হবে এবং দিবা-রাত্রি সে তাতে প্রজ্জ্বলিত হতে থাকবে। **তিন**, বেনামাযীর কবরে 'সুজা আকরা' নামক এক ভয়ংকর সাপ তার উপর নিয়োগ করা হবে। তার চোখ দুটি হবে আগুনের এবং

নখরগুলো হবে লোহার। প্রতিটি নখ এক দিনের পথ অর্থাৎ বার ক্রোশ দূরত্ব পরিমাণ লম্বা হবে। সাপটি মৃত ব্যক্তির সাথে কথা-বার্তা বলবে ; নিজকে 'সুজা আক্বরা' বলে পরিচয় দিবে। তার আওয়ায হবে বজ্রের ন্যায় কঠিন। সে বলবে, তোমাকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার জন্যই আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। আমি তোমাকে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকব ; ফজরের নামায ত্যাগ করার দরুন যোহর পর্যন্ত, যোহরের নামায ত্যাগ করার দরুন আছর পর্যন্ত, আছরের নামায ত্যাগ করার দরুন মাগরিব পর্যন্ত, মাগরিবের নামায ত্যাগ করার দরুন ইশা পর্যন্ত এবং ইশার নামায ত্যাগ করার দরুন ফজর পর্যন্ত। এভাবে আমি তোমাকে উপর্যুপরি আঘাত হানতেই থাকবো। এই বিষাক্ত অজগরের আঘাত এতই মারাত্মক হবে যে, প্রতি আঘাতে বেনামাযী সত্তর গজ মাটির নীচে ধ্বসে যাবে। এভাবে ক্বেয়ামত পর্যন্ত বেনামাযীর শাস্তি হতে থাকবে।

ক্বেয়ামতের দিন হাশরে তিনটি শাস্তি, যথা ঃ এক, অত্যন্ত কঠিনভাবে বেনামাযীর হিসাব নেওয়া হবে। দুই, বেনামাযীর উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধে নিপতিত হবে। তিন, বহু অপমান করে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অপর এক সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে, ক্বেয়ামতের ময়দানে বেনামাযীর মুখমণ্ডলে নিম্নোক্ত তিনটি বাক্য লিখা থাকবে, যথা ঃ—এক, 'ওহে আল্লাহ্‌র হক ধ্বংসকারী। দুই, 'ওহে আল্লাহ্‌র ক্রোধে নিপতিত!' তিন, তুমি যে আল্লাহ্‌র হক নষ্ট করেছ, আজকে সেরূপ আল্লাহ্‌র দয়া ও রহমত থেকে বঞ্চিত থাক।

উপরোক্ত হাদীসের সূচনাতে যে পনের সংখ্যার কথা বলা হয়েছিল, তা পূর্ণ না হয়ে চৌদ্দটি পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে ; হয়ত বর্ণনাকারী (রাভী) একটি সংখ্যা বিস্মৃত হয়ে গেছেন।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, 'ক্বেয়ামতের ময়দানে একজন লোককে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার হুকুম করবেন। লোকটি বলবে, হে রব্ব! কেন আমার জন্য এই হুকুম। আল্লাহ্ বলবেন ঃ নামাযের বেলায় তুমি নির্ধারিত সময় পার করে দিয়েছ এবং দুনিয়াতে তুমি মিথ্যা কসমে অভ্যস্থ ছিলে।'

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমরা আল্লাহ্ পাকের দরবারে এই মর্মে দো'আ কর ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تَدَعْ فِيْنَا شَقِيًّا وَلَا مَحْرُوْمًا -

'আয় আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে কাউকে হতভাগা ও বঞ্চিত করো না।'

আল্লাহ্র রাসূল নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান, হতভাগা ও বঞ্চিত কে? সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলে হুযূর বললেন ঃ

تَارِكُ الصَّلٰوةِ مَحْرُوْمٌ وَشَقِيٌّ -

'নামায ত্যাগকারী ব্যক্তিই হতভাগা ও বঞ্চিত।'

আরও বর্ণিত আছে, ক্বেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বেনামাযী লোকদের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করবে। দোযখে 'লামলাম' নামক একটি উপত্যকা আছে। সেখানে অসংখ্য সাপ রয়েছে। প্রত্যেকটি সাপ উটের ঘাড়ের ন্যায় মোটা এবং এক মাসের দূরত্ব পরিমাণ লম্বা হবে। এগুলো বেনামাযী লোকদেরকে দংশন করতে থাকবে, যার বিষ সত্তর বছর পর্যন্ত উথ্লে উঠতে থাকবে। ফলে, তাদের দেহ বিবর্ণ হয়ে যাবে।

বনী ইসরাঈলের একজন মহিলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, হে মূসা! আমি একটি বড় গুনাহের কাজ করেছি এবং আল্লাহ্র কাছে তওবাও করেছি, আপনি যদি আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করে দেন, তাহলে অবশ্যই আমার তওবা কবূল হবে। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এমন কি গুনাহের কাজ করেছ, যদ্দরুন এত ভীত হয়ে পড়েছো? সে উত্তর করলো, আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি এবং প্রসূত সন্তানকে হত্যাও করে ফেলেছি। হযরত মূসা (আঃ) মহিলাটির কথা শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, দূর হও এখান থেকে না জানি আসমান থেকে অগ্নি বর্ষিত হয় এবং তোমার সাথে আমরাও ভস্ম হয়ে যাই। এ কথা শুনে মহিলাটি মনক্ষুন্ন হয়ে সেখান থেকে চলে গেল। অতঃপর হযরত জিব্রাঈল (আঃ) অবতরণ করে বললেন ঃ

'হে মূসা, আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, আপনি তওবাকারীনি মহিলাটিকে কেন ফিরিয়ে দিলেন? আমি কি তার চেয়েও বড় অপরাধী কে, তা বলবো? হযরত মূসা (আঃ) জানতে চাইলে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন ঃ 'তার চেয়েও বড় অপরাধী ঐ ব্যক্তি যে জেনে শুনে স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগ করে।'

জনৈক বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত, তাঁর ভগ্নির মৃত্যুর পর যথারীতি তার দাফনকার্য সম্পন্ন করলেন। কিন্তু দাফনের পর ভাইয়ের মনে পড়লো, ভুলবশতঃ টাকার একটি থলিও মাটিতে দাফন করা হয়ে গেছে। থলিটি আনার জন্য লোকজন বিদায় হওয়ার পর পুনরায় কবর খুললেন। কিন্তু তখন তিনি প্রত্যক্ষ করলেন যে, কবরের ভিতর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। তৎক্ষণাৎ তিনি মাটি দিয়ে কবর আচ্ছাদিত করে দিলেন। ফিরে এসে মাকে ভগ্নির কবরের অবস্থা বর্ণনা করে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে মা কেঁদে ফেললেন এবং বললেন,—তোমার বোন নামাযের ব্যাপারে অবহেলা করতো এবং সময় পার করে নামায পড়তো—এ হলো তার অবস্থা যে বিলম্ব করে হলেও নামায পড়তো। এ থেকেই উপলব্ধি করে নেওয়া চাই, যে মোটেই নামায পড়ে না, তার কি দশা হবে! আর আল্লাহ্ আমাদেরকে নামাযের যাবতীয় শর্ত ও হক আদায় করে যত্ন সহকারে তা আদায় করার তওফীক দান করুন, আপনি অনন্ত মেহেরবান ও দয়াশীল।

অধ্যায় ঃ ৫০

দোযখ ও দোযখের ভয়াবহ শাস্তির বয়ান

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ

"যার (জাহান্নামের) সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেকটি দরজার (মধ্য দিয়ে যাওয়ার) জন্য তাদের পৃথক পৃথক ভাগ রয়েছে।" (হিজ্‌র ঃ ৪৪)

আয়াতে উল্লেখিত 'জুয্' শব্দ দ্বারা বিভিন্ন গ্রুপ ও দল বুঝানো হয়েছে। এক উক্তি অনুযায়ী 'আব্ওয়াব' দ্বারা স্তর অর্থাৎ উপরের ও নীচের স্তরসমূহ বুঝানো হয়েছে।

ইব্‌নে জুরাইজ (রহঃ) বলেন, দোযখের সাতটি (দার্ক) অধঃগামী স্তর রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে— জাহান্নাম, লাযা, হুতামাহ্, সায়ীর, সাকার, জাহীম ও হাবিয়াহ্। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম স্তরটি তওহীদে বিশ্বাসী গুনাহ্গারদের জন্য, দ্বিতীয়টি ইহুদীদের জন্য, তৃতীয়টি নাসারাদের জন্য, চতুর্থটি সাবেয়ীন সম্প্রদায়ের জন্য, পঞ্চমটি মজূসী অর্থাৎ অগ্নিপূজকদের জন্য, ষষ্ঠটি মুশ্‌রিকদের জন্য এবং সপ্তমটি মুনাফিকদের জন্য। এগুলোর মধ্যে 'জাহান্নাম' হলো সর্বোচ্চ স্তর। অতঃপর অন্যান্য স্তরের অবস্থান। বিষয়টির ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসের অনুসারী সাত শ্রেণীর লোকদের শাস্তি প্রদান করবেন। এক এক শ্রেণীর লোককে দোযখের এক এক স্তরে নিক্ষেপ করবেন। এর কারণ হচ্ছে, কুফ্‌র ও আল্লাহ্‌র না-ফরমানীরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং তা দোযখের স্তরের মতই বিভিন্ন। এক অভিমত অনুযায়ী এসব স্তর সাত অঙ্গ অর্থাৎ চক্ষু, কান, জিহ্বা, পেট, লজ্জাস্থান, হাত, পা অনুযায়ী রাখা হয়েছে। এসব অঙ্গের মাধ্যমেই যেহেতু অন্যায়-অপরাধ করা হয়, তাই দোযখের প্রবেশদ্বারও সাতটি নির্মিত হয়েছে।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, দোযখের উপরে-নীচে সাতটি স্তর রয়েছে, প্রথম স্তরটি পূর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয়টি পূর্ণ করা হবে, অতঃপর তৃতীয়টি– এভাবে সবগুলো স্তরই পাপী-অপরাধীদের দ্বারা পূর্ণ করা হবে।

তারীখে বুখারী ও সুনানে তিরমিযী কিতাবে হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "দোযখের সাতটি দরজা রয়েছে, তন্মধ্যে একটি দরজা ঐ সব লোকের জন্য যারা আমার উম্মতের উপর তলোয়ার উঠিয়েছে।"

'ত্ববরানী আওসাত' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস্ সালাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন সময় উপস্থিত হয়েছেন, যে সময় তিনি কখনও উপস্থিত হোন না। নবীজী তৎপর হয়ে অগ্রসর হলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিব্‌রাঈল! আপনার কি হয়েছে ; এমন বিবর্ণ দেখা যাচ্ছে কেন আপনাকে? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা দোযখাগ্নি উত্তপ্ত করার হুকুম দিয়েছেন ; তারপরেই এসে আপনার কাছে হাজির হলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে কিছু বিবরণ শোনান। হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস্ সালাম বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা দোযখকে উত্তপ্ত হওয়ার জন্য হুকুম করলেন। অতঃপর সে এক হাজার বছর পর্যন্ত উত্তপ্ত হতে থাকে। ফলে দোযখের আগুন শ্বেত বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর আবার হুকুম করেন। এবারও এক হাজার বছর জ্বলতে থাকে, ফলে দোযখের আগুন লাল বর্ণে রূপান্তরিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় দোযখকে আরও উত্তপ্ত হওয়ার জন্য হুকুম করেন। অতএব দোযখের আগুন আরও এক হাজার বছর জ্বলতে থাকে। পরিশেষে এ আগুন কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে। বর্তমানে সেই আগুনের অবস্থা এই যে, এর স্ফুলিঙ্গের কোন শেষ নাই এবং এর লেলিহানেরও কোন অবধি নাই। ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন—একটি সুইয়ের পরিমাণ অংশও যদি দোযখের ফুটা হয়ে যায়, তাহলে জগতের সমস্ত মানুষ এর আতংকে মরে যাবে। ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন, দোযখের প্রহরীদের মধ্য হতে যদি একজনও দুনিয়াবাসীর সামনে প্রকাশ পায়, তবে সমগ্র দুনিয়াবাসী তার ভয়ে মৃত্যুবরণ

করবে। ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন- দোযখের শিকলসমূহের মধ্য হতে এমন একটি শিকল যার উল্লেখ পবিত্র কুরআনে করা হয়েছে, যদি দুনিয়ার পাহাড়-পর্বতের উপর রাখা হয়, তবে পাহাড়সমূহ বিগলিত হয়ে যাবে এবং শিকলটি যমীনের সর্বশেষ অংশে গিয়ে থেমে যাবে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে জিব্‌রাঈল, ক্ষান্ত হও, আর বলো না ; মনে হচ্ছে যেন আমার অন্তর ফেটে যাবে আর আমি এখনই মৃত্যুবরণ করবো। এ কথা বলে নবীজী হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-এর প্রতি তাকিয়ে দেখলেন—তিনি কাঁদছেন। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তো আপনার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। জিব্‌রাঈল (আঃ) আরজ করলেন, আমি কেন কাঁদবো না, আমার তো আরও বেশী পরিমাণে কাঁদা উচিত। কেননা, আল্লাহ্‌র কাছে যদি আমার বর্তমান অবস্থার স্থলে অন্য কোন অবস্থা হয়ে থাকে, তবে আমার কি উপায় হবে! আমি জানিনা, ইবলীসের উপর যেভাবে বিপদ এসেছে, সেরূপ আমার উপরও এসে পতিত না হয়, অথচ সেও ফেরেশ্‌তা ছিল। জানিনা, হারূত ও মারূতের উপর যেভাবে আপদ এসেছে, আমার উপরও সেরূপ এসে না পড়ে।

বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদতে লাগলেন, হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-ও কাঁদলেন। এভাবে উভয়ই কাঁদতে থাকলেন। এমন সময় গায়েব থেকে আওয়াজ আসলো, হে জিব্‌রাঈল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের উভয়কে তার না-ফরমানী ও অবাধ্যতা থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ করে দিয়েছেন। অতঃপর হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) উর্ধ্বজগতে চলে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহ থেকে বাইরে তশরীফ আনলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন কয়েকজন আনসারী সাহাবী ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত রয়েছেন। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে নবীজী বললেন, তোমরা হাসি-ঠাট্টা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মগ্ন রয়েছ, অথচ তোমাদের মাথার উপর রয়েছে জাহান্নাম, আমি যা জেনেছি তোমরা যদি তা জানতে, তবে খুবই কম হাসতে এবং অতি অধিক মাত্রায় ক্রন্দন করতে, খাওয়া-দাওয়া তোমাদের কাছে ভাল লাগতো না এবং নির্জন ও উজাড় জঙ্গলে আল্লাহ্‌র তালাশে তোমরা বের হয়ে যেতে। এমন সময় অদৃশ্য থেকে

আওয়াজ আসলো, হে মুহাম্মদ! আমার বান্দাদেরকে নিরাশ করো না, তোমাকে সুসংবাদ প্রদানকারীরূপে পাঠিয়েছি ; হতাশ করার জন্যে নয়। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা সকলে দুরুস্ত ও সঠিক পথের পথিক হয়ে যাও ; হক ও সত্য থেকে দূরে সরে যেও না।"

ইমাম আহমদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছেন, হযরত মীকাঈল (আঃ)-কে কখনও হাসতে দেখি নাই—এর কারণ কি? তিনি বললেন, যখন থেকে দোযখ বানানো হয়েছে তখন থেকে হযরত মীকাঈল (আঃ)-এর হাসি বন্ধ হয়ে গেছে।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন দোযখকে উপস্থিত করা হবে ; এর সত্তর হাজার লাগাম হবে এবং এক একটি লাগামে সত্তর হাজার করে ফেরেশ্‌তা দোযখকে টেনে হেঁচড়িয়ে নিয়ে আসবে।

অধ্যায় ঃ ৫১

দোযখ-আযাবের বিভিন্ন প্রকার

আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে— ইমাম তিরমিযী রেওয়ায়াতটিকে সহীহ্ বলেছেন—আল্লাহ্ তা'আলা যখন জান্নাত ও জাহান্নামকে সৃষ্টি করলেন, তখন হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে জান্নাতে পাঠালেন এবং বললেন, তুমি জান্নাতকে দেখ এবং জান্নাতের মধ্যে আমি যা কিছু রেখেছি, সেগুলোর প্রতিও দৃষ্টিপাত করো। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) জান্নাতে গেলেন এবং জান্নাত ও তৎসঙ্গে জান্নাতীদের জন্য সৃষ্ট নেয়ামতরাজি দেখে ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহ্, আপনার অনন্ত ইয্‌যত ও সম্মানের কসম, জান্নাত এবং জান্নাতের আরাম ও নেয়ামতের বিষয় যে-ই শুনতে পাবে, সে তাতে প্রবেশ করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতকে কষ্ট-ক্লিষ্ট ও সাধনার দ্বারা ঢেকে দিলেন (অর্থাৎ-জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে কষ্ট-ক্লিষ্ট ও সাধনা করতে হবে)। এরপর পুনরায় হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে জান্নাতে পাঠালেন। তিনি দেখে এসে বললেন, হে আল্লাহ্, আপনার ইয্‌যত ও প্রতাপের কসম, জান্নাতকে কষ্ট-সাধনা ও অপছন্দনীয় বিষয়ের দ্বারা এমনভাবে ঢেকে দেওয়া হয়েছে যে, আমার আশংকা হয়— জান্নাতে কেউ প্রবেশ লাভ করতে পারবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে জাহান্নামের দিকে পাঠিয়ে বললেন, দেখ, জাহান্নামবাসীদের জন্য আমি কি কি (শাস্তি) প্রস্তুত করে রেখেছি। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) গিয়ে দেখলেন, প্রচণ্ড শাস্তি, কেবল শাস্তি আর শাস্তিরই ব্যবস্থা। ফিরে এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্, আপনার ইয্‌যত ও প্রতাপের কসম, যে-ই জাহান্নামের শাস্তির কথা শুনবে সে এতে প্রবেশ করতে চাবে না। অতঃপর জাহান্নামের উপর প্রবৃত্তির তাড়না ও কামনা-বাসনার পর্দা ঢেলে দেওয়া হলো। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে বললেন, পুনরায় গিয়ে দেখ। তিনি দেখে এসে বললেন,

আপনার ইয্যত ও প্রতাপের কসম, আমার আশংকা হয় যে, সকলকেই জাহান্নামে যেতে হবে।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ)-সূত্রে রেওয়ায়াত করেন যে,

إِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۚ

"তা' (জাহান্নাম) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করতে থাকবে।" (মুরসালাত ঃ ৩২)

কুরআনের উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আমি একথা বলি না যে, দোযখের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এক একটি বৃক্ষের মত বড় হবে, বরং আমি বলি এক একটি স্ফুলিঙ্গ বিরাট দুর্গের মত এবং বিরাট শহরের মত বড় হবে। আহমদ্ ইব্‌নে মাজাহ্ ও হাকেম (রহঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, দোযখের মধ্যে 'ওয়াইল' নামক একটি উপত্যকা রয়েছে, তাতে কোন কাফের নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তলদেশে পৌঁছা পর্যন্ত সত্তর বছর লাগবে।

তিরমিযী শরীফে আছে, বস্তুতঃ 'ওয়াইল' হচ্ছে, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি উপত্যকা। এতে নিক্ষিপ্ত কাফের সত্তর বছরে এর তলদেশে গিয়ে পৌঁছবে।

তিরমিযী শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, তোমরা জুব্বুল-হুয্‌ন (অর্থাৎ দুঃখ-কষ্টের গর্ত) থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর, সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সে গর্তটি কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জওয়াব দিলেন, দোযখের মধ্যে এমন একটি ভয়ানক ওয়াদী (উপত্যকা) যা থেকে স্বয়ং দোযখ প্রতিদিন চারশত বার আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে। আরজ করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, এতে কারা দাখেল হবে? তিনি বললেন, এ উপত্যকাটি লোকদেখানো মনোবৃত্তি নিয়ে কুরআন পাঠকারী লোকদের জন্য তাদের অসৎ আমলের দরুন তৈরী করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য ক্বারী সে, যে জালেম শাসকদের সাক্ষাতের অভিলাষী হয়।

ত্ববরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, দোযখের মধ্যে একটি উপত্যকা রয়েছে, যা থেকে স্বয়ং দোযখ প্রত্যহ চারশত বার পানাহ্ চেয়ে থাকে, উম্মতে-মুহাম্মদীর রিয়াকার (লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদতকারী) লোকদের জন্য

তা প্রস্তুত করা হয়েছে।

ইব্‌নে আবিদ্দুন্‌য়া বর্ণনা করেছেন, দোযখের মধ্যে সত্তর হাজার উপত্যকা রয়েছে, এর প্রত্যেকটি থেকে সত্তর হাজার শাখা নির্গত হয়েছে, আবার প্রত্যেকটি শাখার জন্য সত্তর হাজার ঘর রয়েছে এবং প্রতিটি ঘরে একটি করে সাপ রয়েছে—এ সাপগুলো দোযখীদের মুখে অবিরত আঘাত হানছে।

তারীখে বুখারীতে মুন্‌কার সনদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, দোযখে সত্তর হাজার উপত্যকা আছে, প্রত্যেকটি উপত্যকার সত্তর হাজার শাখা রয়েছে, প্রতিটি শাখার সত্তর হাজার ঘর রয়েছে, প্রতিটি ঘরে সত্তর হাজার কুয়া রয়েছে, প্রতিটি কুয়াতে সত্তর হাজার অজগর সাপ রয়েছে এবং প্রতিটি সাপের চোয়ালে (দাঁত-সংলগ্ন মুখ-গহ্বর) সত্তর হাজার বিচ্ছু রয়েছে— যখনই কোন কাফের বা মুনাফেক সেখানে পৌঁছে, এগুলো তাদের উপর আঘাত হানতে শুরু করে।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, একটি বড় পাথর দোযখের কিনার হতে নিক্ষেপ করা হলে সত্তর বছর যাবৎ তা দোযখের গহ্বরে ধাবিত হতে থাকবে, তবুও শেষ প্রান্তে পৌঁছবে না।

হযরত উমর (রাযিঃ) প্রায়ই বলতেন, তোমরা দোযখের কথা বেশী করে স্মরণ কর, কারণ দোযখাগ্নির তাপ খুবই প্রচণ্ড, এর গভীরতা বহু দূর পর্যন্ত এবং দণ্ড-প্রয়োগের চাবুক লোহার।

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের দরবারে বসা ছিলাম ; এমন সময় হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম—যেন উপর থেকে কি একটা নীচে পড়লো। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি জান এটা কি? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটা একটা পাথরের শব্দ, সত্তর বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে দোযখে নিক্ষেপ করেছেন এখন তা নীচে গিয়ে পৌঁছলো।

ত্বব্‌রানী শরীফে হযরত আবূ সাঈদ (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ভয়ানক আওয়াজ শুনতে

পেলেন। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) আগমন করলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি একটি পাথর, সত্তর বছর পূর্বে এটাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আর এখন তা দোযখের নীচে গিয়ে পৌঁছলো। আল্লাহ্ তা'আলার মর্জ্জি হয়েছে, আপনাকে তা শুনিয়ে দিলেন। এরপর থেকে ওফাত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখন মুখভরে হাসতে দেখা যায় নাই।

আহ্‌মদ ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে— মাথার খুলির প্রতি ইশারা করে বললেন, এমন একটি পাথর যদি আসমান থেকে যমীনের দিকে নিক্ষেপ করা হয়, তবে রাত্র হওয়ার আগেই তা যমীনে পৌঁছে যাবে, অথচ এ দুইয়ের মাঝে দূরত্ব রয়েছে পাঁচশত বছরের। কিন্তু এ পাথরটিই যদি দোযখের শিকলের শুরু–ভাগ থেকে নিক্ষেপ করা হয়, তবে শিকলের শেষ পর্যন্ত তা পৌঁছতে চল্লিশ বছর লাগবে—যদি রাত্র দিন একাধারে স্বাভাবিকভাবেও চলতে থাকে।

আহমদ, আবূ ইয়া'লা ও হাকেম রেওয়ায়াত করেন, দোযখের লোহার গদা (মুগুর) যদি যমীনের উপর রাখা হয় এবং সমগ্র জ্বিন ও মানবজাতি তা উঠাতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালায়, তবু তাদের পক্ষে তা উঠানো সম্ভব হবে না। হাকেমের বর্ণনায় রয়েছে যে, দোযখের হাতুড়ি দিয়ে যদি আঘাত করা হয়, তবে চূর্ণ–বিচূর্ণ হয়ে ছাই–ভস্মের ন্যায় হয়ে যাবে।

ইব্‌নে আবিদ্দুন্‌য়ার রেওয়ায়াতে আছে যে, দোযখের একটি পাথরও যদি দুনিয়ার পাহাড়সমূহের উপর রাখা হয়, তবে সমগ্র পাহাড় বিগলিত হয়ে যাবে, অথচ প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি পাথর ও একটি শয়তান রয়েছে।

হাকেমের রেওয়ায়াতে আছে যে, যমীনের সাতটি স্তর রয়েছে, এবং এক স্তর থেকে অপর স্তর পর্যন্ত ব্যবধান হচ্ছে পাঁচশত বছরের। সর্বোচ্চ স্তরটি রয়েছে একটি মৎস্যের পিঠের উপর। মৎস্যটির বাহু দু'টি আসমানের সাথে মিলিত হয়েছে। আর মৎস্যটি অবস্থিত একটি পাথরের উপর। পাথরটি রয়েছে এক ফেরেশ্‌তার হাতে। দ্বিতীয় স্তরটি হচ্ছে প্রবল ঘূর্ণি ও ঝঞ্ঝাবাত্যার বন্দীখানা। আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন, তখন ঘূর্ণিঝড়ের দারোগাকে হুকুম করলেন তাদের উপর প্রবল ঝড়ো হাওয়া

প্রবাহিত করে তাদেরকে ধ্বংস করতে। তখন দারোগা বলেছে, হে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য আমি কি গাভীর নাসিকা পরিমাণ ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত করবো ! আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, এতে সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়াবাসী ধ্বংস হয়ে যাবে, বরং তাদের উপর আংটি পরিমাণ হাওয়া প্রবাহিত কর।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ۝

"তা (ঝঞ্চা বায়ু) যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হতো, তাকে এমন করে ছাড়তো যেমন কোন বস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।" (যারিয়াত ঃ ৪২)

যমীনের তৃতীয় স্তরে রয়েছে দোযখের পাথর। চতুর্থ স্তরে রয়েছে গন্ধক (অগ্নি-প্রজ্জ্বলন পদার্থ) সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! দোযখেরও আবার গন্ধক রয়েছে? আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ, ওই পবিত্র সত্তার কসম, যার কুদরতের মুঠোয় আমার প্রাণ, দোযখের মধ্যে গন্ধকের বহু উপত্যকা (ওয়াদী) রয়েছে, যদি এগুলোর মধ্যে অতি বৃহৎ ও মজবুত পাহাড় রেখে দেওয়া হয়, তবে তা বিগলিত ও দ্রবীভূত হয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে।

যমীনের পঞ্চম স্তরে দোযখের সাপ রয়েছে। এক একটি উপত্যকার ন্যায় বৃহৎ তাদের মুখ-গহবর। যখন কোন কাফেরকে দংশন করবে, তখন তার শরীরে গোশ্ত বলতে কিছু অবশিষ্ট রাখবে না।

যমীনের ষষ্ঠ স্তরে রয়েছে দোযখের বিচ্ছু। এক একটি বিচ্ছু মোটা খচ্চরের মত বৃহদাকার হবে। এদের দংশন এতো মারাত্মক হবে যে, কষ্টের আতিশয্যে দংশিত কাফের দোযখাগ্নির কষ্ট ভুলে যাবে।

যমীনের সপ্তম স্তরে ইব্লীস শয়তান লোহার জিঞ্জীরে পেঁচানো অবস্থায় রয়েছে। তার এক হাত সম্মুখে অপর হাত পিছনে রয়েছে। যখন আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে ছেড়ে দিয়ে কোন বান্দাকে পরীক্ষা করতে চান, তখন তাকে (ইব্লীসকে) আযাদ করে দেন।

আহমদ, ত্বব্রানী, ইব্নে হাব্বান ও হাকেমে বর্ণিত আছে যে, দোযখের মধ্যে বখতী উটের গর্দানের মত মোটা ও লম্বা সাপ রয়েছে। এগুলো কাউকে

দংশন করলে সত্তর বছর পর্যন্ত এর বিষাক্ত ব্যথা–বেদনা যন্ত্রণা দিতে থাকবে। দোযখের অভ্যন্তরে খচ্চরের ন্যায় মোটা মোটা বিচ্ছু রয়েছে, কাউকে দংশন করলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিষ–যন্ত্রণায় অস্থির করে রাখবে।

তিরমিযী, ইবনে হাব্বান ও হাকেমে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, কুরআনের আয়াতাংশ كَالْمُهْلِ (তৈলের গাদের ন্যায়)–এর অর্থ হচ্ছে, দোযখীদেরকে এমন তীব্র ও উত্তপ্ত তৈলের গাদের ন্যায় ঘৃণ্য পানীয় পান করতে দেওয়া হবে যে, তা নিকটে আনা মাত্র এর উত্তাপে চেহারা দগ্ধ হয়ে চামড়া খসে পড়বে।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, উত্তপ্ত গরম পানি দোযখীদের মস্তকের উপর প্রবাহিত করা হবে এবং তা মস্তক ভেদ করে পেটের অভ্যন্তরে পৌঁছে যাবে এবং পেটের সবকিছু বের করে দিবে। এমনকি পা পর্যন্ত সবকিছু জ্বালিয়ে দিবে। কুরআনের শব্দ 'হামীম' এর অর্থ হচ্ছে, উত্তপ্ত ও দগ্ধকর পানি।

হযরত যাহহাক (রহঃ) বলেন, দোযখের এই উত্তপ্ত পানি যমীন–আসমান সৃষ্টির দিন থেকে ফুটানো হচ্ছে এবং দোযখীদেরকে পান করানোর পূর্ব পর্যন্ত তা অবিরাম ফুটানো হবে।

এছাড়া আরও একটি উক্তি রয়েছে, যা কুরআনের এ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ○

"তাদেরকে (দোযখীদেরকে) ফুটন্ত পানি পান–করানো হবে। ফলে তা' তাদের নাড়ি–ভুড়িগুলোকে খণ্ড–বিখণ্ড করে ফেলবে।" (মুহাম্মদ ঃ ১৫)

আহমদ, তিরমিযী ও হাকেম রেওয়ায়াত করেন ঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের আয়াত—

وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ○ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ

("পূঁজ ও রক্ত–সদৃশ পানি তাকে পান করানো হবে, যা ঢোক্ ঢোক্ করে পান করবে এবং সহজে গলধঃকরণ করতে পারবে না।"ইব্রাহীম ঃ

১৬)–এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, যখন এ পানি তার মুখের নিকটবর্তী করা হবে, তখন সে তা না–পছন্দ করবে এবং পান করতে চাইবে না। যখন আরও নিকটবর্তী করা হবে, তখন তার মুখমণ্ডল ঝলসে যাবে এবং মস্তকস্থিত চামড়া দগ্ধ হয়ে পড়ে যাবে। যখন পানি পান করবে, তখন তার নাড়ি–ভুড়ি কেটে যাবে এবং পিছন–পথ দিয়ে বের হয়ে পড়ে যাবে।

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেন ঃ

يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ

"মুখমণ্ডলকে ভুনে ফেলবে ; তা কতই না নিকৃষ্ট পানীয়।"

(কাহ্ফ ঃ ২৯)

আহমদ ও হাকেম রেওয়ায়াত করেন যে, 'গাস্সাক' অর্থাৎ দোযখের দূর্গন্ধময় পূঁজ এক বাল্তি পরিমাণ যদি দুনিয়াতে ঢেলে দেওয়া হয়, তবে সমগ্র জগত দূর্গন্ধময় হয়ে যাবে। 'গাস্সাকে'র বিষয় কুরআনুল করীমে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ٥

"তা ফুটন্ত পানি ও পূঁজ। অতএব, তারা তা আস্বাদন করুক।"

(ছোয়াদ ঃ ৫৭)

আরও উল্লেখিত হয়েছে ঃ

اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ٥

"উত্তপ্ত পানি ও পূঁজ ব্যতীত।" (নাবা ঃ ২৫)

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ)–এর অভিমত অনুযায়ী 'গাসসাক' হচ্ছে, দোযখের দূর্গন্ধময় পানি, যা কাফের ও অন্যান্যদের চামড়া বিগলিত হয়ে সৃষ্টি হবে। কোন কোন ব্যাখ্যাতা বলেন, 'গাস্সাক' হচ্ছে দোযখীদের পূঁজ।

হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলেন, 'গাস্সাক' দোযখস্থিত একটি ঝর্ণা। এ ঝর্ণার দিকে উত্তপ্ত পানির আরও অন্যান্য ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। প্রতিটি ঝর্ণা

সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ। দোযখী ব্যক্তিকে এর মধ্যে একবার মাত্র চুবিয়ে বের করা হবে। এতে তার অবস্থা এই হবে যে, শরীরের চামড়া ও গোশ্ত তার সর্বশরীর থেকে খসে পড়বে। শুধু হাড়গুলো অবশিষ্ট থাকবে। আর এসব গোশ্ত ও চামড়া একত্র হয়ে তার পশ্চাদ্দেশে এবং গোড়ালির সাথে ঝুলতে থাকবে। এগুলো সহ টেনে সে চলতে থাকবে, যেমন মানুষ নিজের কাপড় টেনে চলতে থাকে।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

"তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যেমন ভয় করা তাঁর হক রয়েছে। আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মরো না।" (আলি-ইম্রান ঃ ১০২)

অতঃপর তিনি বললেন, যদি 'যাক্কুম' (দোযখের কাটাযুক্ত খাদ্য)–এর বিন্দু পরিমাণও দুনিয়ার কোন স্থানে নিক্ষেপ করা হয়, তাতে সমগ্র জগৎবাসীর জীবন নির্বাহ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে এ 'যাক্কুম' যাকে খাওয়ানো হবে, তার কি দশা হবে? অন্য রেওয়ায়াতে আছে, সে ব্যক্তির কি দশা হবে, যার খাদ্য হবে শুধু 'যাক্কুম'।

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত আছে ঃ

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ

"(গলায় আটকানোর মত) কাটাযুক্ত খাদ্য।" (মুয্যাম্মিল ঃ ১৩)

তিনি বলেন, এ কাঁটা তার গলদেশে এমনভাবে আটকে যাবে যে, তা বের করতে পারবে না এবং বমনও করতে পারবে না।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, কাফেরের দুই কাঁধের মাঝখানে দ্রুতগামী সওয়ারীর তিন দিনের পথ পরিমাণ দূরত্ব হবে।

মুসনাদে আহমদ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, কাফেরের চোয়াল–দাঁত উহুদ পাহাড়ের ন্যায় বড় হবে, তার উরু 'বায়যা' পাহাড়ের ন্যায় হবে, দোযখে তার পশ্চাদ্দেশ 'কুদাইদ' থেকে মক্কা পর্যন্ত দূরত্বের সমান হবে। যে দূরত্ব

অতিক্রম করতে তিন দিবস সময় লাগে। তার শরীরের চামড়ার স্থূলতা হবে জেবার অর্থাৎ ইয়ামান সম্রাটের যুগে প্রচলিত মাপ অনুপাতে বিয়াল্লিশ হাত।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, দোযখের মধ্যে দোযখী ব্যক্তির পশ্চাদ্দেশ 'রাবাযাহ্' থেকে মদীনা পর্যন্ত তিন দিনের দূরত্বের সমান হবে।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হযরত ফুযাইল ইব্‌নে ইয়াযীদ (রাযিঃ) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন ঃ কাফেরের জিহ্বা এতো বৃহৎ ও দীর্ঘ হবে যে, এক ফরসখ বা দুই ফরসখ (প্রায় আট কিঃ মিঃ) পর্যন্ত হেঁচড়াতে থাকবে। লোকেরা সেটাকে পদদলিত করবে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দোযখের মধ্যে দোযখীদের দেহ এতো বৃহদাকার করে দেওয়া হবে যে, কানের নিম্নভাগ থেকে কাঁধ পর্যন্ত সাতশত বছরের দূরত্ব হবে। শরীরের চামড়া সত্তর হাত মোটা হবে চোয়াল উহুদ পাহাড়ের ন্যায় হবে।

আহমদ ও হাকেম রেওয়ায়াত করেছেন, হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন ঃ তোমরা কি জান, দোযখের প্রশস্ততা কতটুকু? আমি বললাম—না। তখন তিনি বললেন ঃ দোযখীর কানের নিম্নভাগ থেকে কাঁধ পর্যন্ত সত্তর বছরের দূরত্ব ; এর মাঝখানে পূঁজ ও রক্তের উপত্যকাসমূহ রয়েছে। আমি বললাম, ঝর্ণাসমূহ? তিনি বললেন, না, উপত্যকাসমূহ।

অধ্যায় ঃ ৫২

গোনাহ্ বা পাপকার্যে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকার ফযীলত

আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা ও পাপকার্যে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য সবচেয়ে বেশী সহায়ক বিষয় হলো খওফে খোদা, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার ভয় অন্তরে জাগরুক রাখা, তাঁর শাস্তির কথা স্মরণ করা, তাঁর অসন্তুষ্টি ও পাকড়াওয়ের কথা মনে করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

"যারা আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করে, তাদের ভয় হওয়া উচিত যে, তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, কিংবা তাদের উপর কোন যন্ত্রণাময় আযাব নাযিল হয়। (সূরা নূর, আয়াত ঃ ৬৩)

বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুমূর্ষু নওজওয়ানের নিকট তশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন তার মৃত্যু একেবারেই সন্নিকটবর্তী ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ মুহূর্তে তোমার ভিতরের অনুভূতি কি? সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মনে আশার সঞ্চার হয় এবং গুনাহের কারণে বড় ভয়ও অনুভব করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ এরূপ অবস্থায় কোন বান্দার অন্তরে এ দু'টি (আশা ও ভয়) বিষয় একত্রিত হলে, আল্লাহ্ পাক তাকে অবশ্যই আশানুরূপ দান করেন এবং যে বিষয় থেকে সে ভয় করেছে, তা থেকে মুক্তি দেন।"

হযরত ওয়াহ্ব ইব্নে ওয়ারদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত,—হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, "জান্নাতের মহব্বত ও দোযখের ভয় মানুষকে ধৈর্য ধারণ, পার্থিব

ভোগ-বিলাস বর্জন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ও পাপাচার পরিহারে অভ্যস্থ করে তোলে।" হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন, তোমাদের পূর্বে যেসব মনীষী (সাহাবায়ে কেরাম) গুজ্‌রে গিয়েছেন, তারা গোটা পৃথিবীর অসংখ্য কংকরের সমপরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করলেও পাপের ভয় ও আশংকায় শঙ্কিত থাকতেন ; পারলৌকিক মুক্তি ও পরিত্রাণের আশা পোষণ করতেন না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি যা শুনতে পাই তোমরা কি তা শুনতে পাও? আমি শুন্‌ছি—আকাশমণ্ডলী কড় কড় আওয়াজ করছে।

ওই পবিত্র সত্তার কসম, যার কুদরতের মুঠোয় আমার জীবন, আসমানে চার অঙ্গুলি পরিমাণ জায়গাও এমন নাই, যেখানে কোন ফেরেশ্‌তা আল্লাহ্‌র সামনে সেজদা অথবা দাঁড়ানো অথবা রুকূর হালতে মগ্ন না রয়েছে। আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে অবশ্যই তোমরা বেশী কাঁদতে এবং কম হাসি-রসিকতা করতে এবং তোমরা জনপদ ছেড়ে পাহাড়-পর্বতের দিকে ছুটে যেতে। সেখানে তোমরা আল্লাহ্‌র ভয়াবহ ও কঠিনতম শাস্তি থেকে পানাহ চাইতে।

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে—"তোমরা কেউ বলতে পার না, আল্লাহ্‌র কাছে তোমরা পরিত্রাণ পাবে কি পাবে না।" বকর ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ মুযানী (রহঃ) বলেন, "মানুষ হাস্য-উল্লাসে পাপাচারে লিপ্ত হচ্ছে, কিন্তু তাদের কাঁদতে কাঁদতে দোযখে যেতে হবে।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মানুষ যদি জানতো, আল্লাহ্‌র কাছে কি কি আযাব রয়েছে, তাহলে তারা দোযখের শাস্তি থেকে শঙ্কামুক্ত হতে পারতো না।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আয়াত নাযিল হলো ঃ

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝

"এবং আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করুন।" (শুআরা ঃ ২১৪) তখন তিনি বলেছেন ঃ হে কুরাইশ গোত্রের লোকজন!

তোমাদের চিন্তা তোমরা নিজেরাই কর ; আল্লাহ্‌র কাছে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমি তোমাদের কিছুই করতে পারবো না। হে বনী আব্‌দে মনাফ! আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে বাঁচানোর জন্য আমি তোমাদের কোনই কাজে আসবো না। হে আব্বাস! আমি আল্লাহ্‌র কাছে আপনার জন্যে কিছুই করতে পারবো না। হে ছফিয়্যাহ্ (নবীজীর ফুফু)! আল্লাহ্‌র কাছে আপনার জন্যে আমি কিছুই করতে পারবো না। হে ফাতেমা! আমার সম্পদ থেকে তুমি যে পরিমাণ ইচ্ছা কর নিয়ে যাও ; কিন্তু আখেরাতে আল্লাহ্‌র কাছে আমি তোমার কোন সাহায্য করতে পারবো না। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কুরআনের এ আয়াতে ঃ

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اٰتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۵

(অর্থাৎ, আর যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে—যা কিছু দান করে থাকে এবং তাদের অন্তরসমূহ ভীত থাকে এ কথার জন্য যে, তাদেরকে স্বীয় রব্বের নিকট ফিরে যেতে হবে। মুমিনূন ঃ ৬০) যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা যদি চুরি করে, ব্যভিচার করে, শরাব পান করে, কিন্তু আল্লাহ্‌কে ভয় করে থাকে, তবে এরাও কি এ আয়াতের প্রশংসার অন্তর্ভুক্ত? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জওয়াব দিলেন, হে আবূ বকরের কন্যা, হে সিদ্দীকের কন্যা! এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ওই সকল লোক, যারা নামায পড়ে, রোযা রাখে, দান–খয়রাত করে এবং সর্বদা শঙ্কিত থাকে যে, জানিনা আমার আমল আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হবে কি–না। (আহ্‌মদ)

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)–কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল, হে সাঈদের পিতা! বলুন তো, আমরা অনেক সময় লোকদের সাহচর্যে বসি, তারা আমাদেরকে আখেরাতের ব্যাপারে কেবল আশাপ্রদ কথাই বলেন এবং তাতে আমরা এতো আনন্দিত হই, যেন আকাশে উড়তে থাকি। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, যাদের সংশ্রবে আশাপ্রদ কথা শুনছ, পরে আখেরাতে ক্ষতি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়—এতোদপেক্ষা উত্তম হলো, এমন লোকদের সংশ্রব অবলম্বন কর, যারা দুনিয়াতে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র ও আখেরাতের ভীতি প্রদর্শন করে এবং পরিশেষে (আখেরাতে) সুখ ও শান্তিপ্রাপ্ত হও।

হযরত উমর (রাযিঃ) জীবনের শেষভাগে যখন আঘাতপ্রাপ্ত হলেন এবং মৃত্যু অতি সন্নিকটবর্তী হলো, তখন তিনি স্বীয় পুত্রকে বললেন, ওহে! আমার গণ্ড মাটির সাথে মিশিয়ে রাখ, জানিনা আখেরাতে আমার কি পরিণতি হবে। আল্লাহ্ পাক যদি আমার উপর রহম না করেন, তবে আমার কোন উপায় নাই। হযরত উমর (রাযিঃ)–এর এই ভীতিগ্রস্ততা দেখে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) তাঁকে বললেন, হে আমীরুল মুমেনীন, আপনি ভীত–সন্ত্রস্ত হচ্ছেন, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার দ্বারা প্রচুর এলাকা মুসলমানদের হাতে এনে দিয়েছেন, বহু শহর আপনার দ্বারা আবাদ করিয়েছেন। এ ছাড়াও ইসলাম ও মুসলমানদের আরও অনেক উপকার ও কল্যাণ আপনার দ্বারা সাধিত হয়েছে। হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, "আমি শুধু নাজাতটুকু পেয়ে যেতে চাই—অপরাধে ধরা না পড়ি।'

হযরত যয়নুল আবেদীন ইব্‌নে আলী ইব্‌নে হুসাইন (রাযিঃ) যখন উযূ করতেন এবং উযূ সম্পন্ন করে দাঁড়াতেন, তখন তিনি রীতিমত কাঁপতে থাকতেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, ওহে! তোমরা কি জানোনা, আমি কত বড় মহান সত্তার দরবারে দণ্ডায়মান হবো এবং তাঁর কাছে অতি একান্তে আরয–নিয়ায করবো?

হযরত আহ্‌মদ ইব্‌নে হাম্বল (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র ভয় আমাকে পানাহার থেকেও ফিরিয়ে রেখেছে, এমনকি খাদ্যের প্রতি আমার মনে কোনরূপ আগ্রহই সৃষ্টি হয় না।

বুখারী মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনেও আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন, যেদিন আরশের এই ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক হচ্ছে, যারা একাকীত্বে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সতর্কবাণী ও শাস্তির কথা স্মরণ করে, নিজের অবাধ্যতা ও গুনাহের কারণে ভীত–সন্ত্রস্ত হয়, ফলে তওবা ও অনুশোচনার অশ্রু প্রবাহিত হয়ে গণ্ডদেশ সিক্ত করে।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ)–সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

দোযখের আগুন সেই চক্ষুকে কোনদিন স্পর্শ করবে না, যে চক্ষু আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁদেছে। এমনিভাবে যে চক্ষু আল্লাহ্‌ পথে প্রহরায় জাগ্রত রয়েছে, তাকেও আগুন স্পর্শ করবে না।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্‌ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا عَيْنًا غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ وَعَيْنًا سَهِرَتْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعَيْنًا يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى

"সকল চোখই ক্বেয়ামতের দিন রোদন করবে—কেবলমাত্র ঐ চোখগুলো ছাড়া, যেগুলো আল্লাহ্‌র নিষেধ করা বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত রয়েছে, কিংবা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ ও মুজাহাদায় মগ্ন থাকার দরুন রাতে জাগ্রত রয়েছে অথবা আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করে মক্ষিকার মস্তক হলেও পরিমাণ অশ্রুপাত করেছে।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্‌ (রাযিঃ) থেকে আরও বর্ণিত, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সে ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করবে না, যে আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদন করেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না স্তন থেকে নির্গত দুধ পুনরায় স্তনে প্রবেশ করবে (অর্থাৎ অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদনকারী ব্যক্তিরও দোযখে প্রবেশ করা অসম্ভব)। আল্লাহ্‌র পথের ধূলা ও দোযখাগ্নির ধোয়া কখনও একত্রিত হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌নে আমর ইব্‌নে আস্‌ (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র ভয়ে এক ফোঁটা অশ্রুপাত করা আমার নিকট এক হাজার দীনার সদকা করা অপেক্ষা প্রিয়।

হযরত আউন ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্ (রহঃ) বলেন, আমার কাছে এ হাদীস পৌঁছেছে যে, আল্লাহ্‌র ভয়ে প্রবাহিত অশ্রু শরীরের যে অংশে পতিত হবে, সে অংশটুকু দোযখের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদন করতেন তাঁর সীনা মুবারকের অভ্যন্তর থেকে এমন আওয়াজ শ্রুত হতো, যেমন উত্তপ্ত ডেগ্‌চির ভিতর থেকে আওয়াজ বের হয়।

হযরত কিন্দী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদনকারীর অশ্রু কয়েক সাগর পরিমাণ অগ্নি নিভিয়ে দিতে পারে।

হযরত ইব্‌নে সিমাক (রহঃ) নিজেই নিজকে শাসন করে বলতেন, ওহে! তুমি খোদাভক্ত ও ধর্মনিষ্ঠ লোকের ন্যায় কথা বল কিন্তু কাজ কর মুনাফেকের মত—সেসঙ্গে আবার জান্নাতে প্রবেশের আশাও পোষণ কর ; না না; জান্নাতে প্রবেশকারী লোকজন এরূপ নয়, তাদের আমল–আখলাকই ভিন্ন, যা তোমার মধ্যে নাই।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ)–এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম, হে রাসূলের বংশধর! আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বললেন, হে সুফিয়ান! মিথ্যাবাদী কোনদিন মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে না, হিংসুক কোনদিন শান্তি পেতে পারে না, সর্বক্ষণ বিষন্ন ব্যক্তি কোনদিন কল্যাণ পেতে পারে না, রুক্ষ স্বভাবের লোক কোনদিন নেতৃত্ব লাভ করতে পারে না। আমি আরজ করলাম, হে নবীর বংশধর! আমাকে আরও নসীহত করুন। তিনি বললেন, হে সুফিয়ান! আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে চল, তাহলে তুমি আবেদ (ইবাদতকারী) হতে পারবে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ভাগ্যে যা রেখেছেন, তাতে তুমি সন্তুষ্ট থাক, তাহলে তুমি মুসলিম হতে পারবে, লোকজনের সাথে তুমি এমন ব্যবহার কর যেমন তুমি তাদের কাছে পেতে চাও, তাহলে তুমি মুমিন হতে পারবে, দুশ্চরিত্র লোকের সাহচর্য গ্রহণ করো না, তারা তোমাকে মন্দ চরিত্রই শিক্ষা দিবে। কেননা, হাদীস শরীফে আছে, "বন্ধুর অনুকরণ মানুষের সহজাত বৃত্তি, কাজেই তোমাদের কেউ কারও সাথে বন্ধুত্ব করতে চাইলে সে যেন পূর্বেই দেখে নেয় যে বন্ধুরূপে কাকে গ্রহণ করছে।" নিজের ব্যাপারে এমন লোকের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ কর, যে আল্লাহ্‌কে

ভয় করে। আমি আরজ করলাম, হে আওলাদে রাসূল! আমাকে আরও নসীহত করুন। তিনি বললেন, হে সুফিয়ান! যে ব্যক্তি গোত্র ও জনবল ব্যতীত ইয্যত-সম্মান ও বিজয় হাসিল করতে চায়, কিংবা রাজত্ব ও সাম্রাজ্য ব্যতীত মর্যাদা ও প্রভাব অর্জন করতে চায়, তার উচিত, সে যেন আল্লাহ্র অবাধ্যতার লাঞ্ছনা হতে বের হয়ে তাঁর আনুগত্যের প্রতি আগুয়ান হয়। আমি আরজ করলাম, হে আওলাদে রাসূল! আমাকে আরও উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বললেন, আমার পিতা আমাকে তিনটি আদব শিখিয়েছেন ঃ এক, যে ব্যক্তি অসৎ লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে, সে তার অনিষ্ট হতে বাঁচতে পারবে না। দুই, যে ব্যক্তি অসৎ পরিবেশে যাবে, সে অপবাদ থেকে বাঁচতে পারবে না। তিন, 'যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করবে না, সে লজ্জিত ও অপমানিত হবে।

হযরত ইব্নে মুবারক (রহঃ) বলেন, আমি ওয়াহ্ব ইব্নে ওয়ারদ (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র না-ফরমানী করে সে কি ইবাদত-বন্দেগীর স্বাদ আস্বাদন করতে পারে? তিনি বলেছেন, কস্মিনকালেও না; এমনকি যে আল্লাহ্র না-ফরমানীর ইচ্ছাও অন্তরে পোষণ করে, সে-ও ইবাদতে স্বাদ পেতে পারে না।

ইমাম আবুল ফরজ ইব্নে জাওযী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র ভয়ই একমাত্র আগুন, যা কুপ্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে জ্বালিয়ে দিতে পারে। এ খোদা-ভীতির মাহাত্ম্য ও ফযীলত ঠিক সেই পরিমাণ যে পরিমাণ সে কামনা-বাসনাকে জ্বালাতে পারে, যে পরিমাণ সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা থেকে বাঁচাতে পারে এবং যে পরিমাণ সে আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে।

আল্লাহ্র খওফ ও ভয়ের প্রচুর ফযীলত ও মাহাত্ম্য এজন্যেই যে, এরই ওসীলায় মানব-চরিত্রে তাক্ওয়া-পরহেয্গারী, সততা ও সাধুতা, মুজাহাদা ও কৃচ্ছ্র সাধনা এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য পয়দা হয়। কুরআনের আয়াত ও বহু হাদীসে এ কথার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ○

"হেদায়াত ও রহমত সে সমস্ত লোকের জন্য, যারা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে।" (আ'রাফ ঃ ১৫৪)

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেন ঃ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۟

"আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। এ (সন্তুষ্টি) তাদের জন্য যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে।"

(বাইয়্যিনাহ্ ঃ ৮)

আরও ইরশাদ করেন ঃ

وَ خَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

"এবং তোমরা আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।" (আলি ইমরান ঃ ১৫৭)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۟

"এবং যারা আপন প্রতিপালককের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয় ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে বেহেশ্তে দু'টি উদ্যান।"

(আর-রহমান ঃ ৪৬)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۝

"উপদেশ সে ব্যক্তিই গ্রহণ করে, যে ভয় করে।". (আ'লা ঃ ১০)

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্কে ভয় করে তার বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই।" (ফাতির ঃ ২৮)

এছাড়া আরও অনেক আয়াত উপরোক্ত বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ রয়েছে।

ইল্‌মের ফযীলত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসসমূহও আল্লাহ্‌-ভীতির ফযীলত ও মাহাত্ম্যকেই বুঝায়। কেননা, আল্লাহ্‌-ভীতি প্রকৃতপক্ষে ইল্‌মেরই ফলস্বরূপ।

ইব্‌নে আবিদ্দুন্‌য়া (রহঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "বান্দার অন্তর যখন আল্লাহের ভয়ে কেঁপে উঠে, তখন তার গুনাহ্‌ এমনভাবে ঝরে পড়ে যেমন শুক্‌না বৃক্ষের পাতা ঝরে পড়ে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, "আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার বান্দার মধ্যে দু'টি ভয় একত্র করি না, এমনিভাবে তাকে দু'টি নিরাপত্তা বা শান্তি একসাথে প্রদান করি না—দুনিয়াতে সে যদি আমা হতে নির্ভীক থাকে, তাহলে ক্বেয়ামতের দিন আমি তাকে ভীত রাখবো। আর যদি দুনিয়াতে সে আমাকে ভয় করে, তাহলে ক্বেয়ামতের দিন আমি তাকে নির্ভয় প্রদান করবো।"

হযরত আবূ সুলাইমান দার্‌রানী (রহঃ) বলেন, যে অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় নাই, সে অন্তর উজাড় বা বিধ্বস্ত অন্তর।

আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ

إِنَّهُ لَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ۝

"বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র পাকড়াও হতে কেউ নিশ্চিত হয় না কেবল ঐ সকল লোক ব্যতীত যাদের দুর্গতিই উপস্থিত হয়েছে।" (আ'রাফ ঃ ৯৯)

অধ্যায় ঃ ৫৩

তওবার ফযীলত গুরুত্ব ও তাৎপর্য

তওবার ফযীলত, গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَتُوبُوْا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

"হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র সমীপে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।" (নূর ঃ ৩১)

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ
الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ
يَلْقَ أَثَامًا ○ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ
فِيْهِ مُهَانًا ○ إِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
فَأُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا ○ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ
مَتَابًا ○

"আর যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন মাবূদের উপাসনা করে না এবং আল্লাহ্ যাকে (হত্যা করা) হারাম করে দিয়েছেন তাকে হত্যা করে না শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত এবং তারা ব্যভিচার করে না, আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে, তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। ক্বিয়ামত দিবসে তার শাস্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সে এতে অনন্তকাল লাঞ্ছিত অবস্থায়

থাকবে। কিন্তু যারা তওবা করে নেয় এবং ঈমান আনয়ন করে এবং নেক কাজ করতে থাকে, এরূপ লোকদেরকে আল্লাহ্ তাদের পাপসমূহের পরিবর্তে পুন্যসমূহ দান করবেন ; আর আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, করুণাময়। আর যে ব্যক্তি তওবা করে ও নেক কাজ করে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিশেষভাবে প্রত্যাবর্তন করছে। (ফুরকান ঃ ৬৮–৭১)

তওবা প্রসঙ্গে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও প্রচুর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম শরীফে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা দিবসে পাপকার্যে লিপ্ত লোকদের গুনাহমাফী ও তওবা কবূলের জন্য রাত্রিতে তাঁর দয়ার হস্ত প্রসারিত করেন এবং রাত্রিকালে পাপাচারে লিপ্ত লোকদের গুনাহ্মাফী ও তওবা কবূলের জন্য দিবসে হাত প্রসারিত করেন। পশ্চিম দিকে হতে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তওবা কবূলের জন্য ডাকতে থাকবেন।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, পশ্চিম দিকে একটি দরজা খোলা হয়েছে, তা সত্তর বৎসরের মতান্তরে চল্লিশ বৎসরের রাস্তার দূরত্ব পরিমাণ বিস্তৃত। আসমান–যমীন সৃষ্টি হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত সেই দরজা তওবা কবূলের জন্য খোলা রয়েছে এবং পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত খোলা থাকবে, কখনও বন্ধ হবে না।

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, তওবাকারীদের জন্য পশ্চিম দিকে সত্তর বছরের পথ পরিমাণ দূরত্বের প্রস্থ সম্বলিত একটি দরজা আছে, সেদিক থেকে সূর্যোদয় না–হওয়া পর্যন্ত তা বন্ধ হবে না। এদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا

"যেদিন আপনার প্রতিপালকের বড় নিদর্শন এসে পৌছবে, (সেদিন) কোন এইরূপ ব্যক্তির ঈমান তার কাজে আসবে না।" (আনআম ঃ ১৫৮)

ত্ববরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, বেহেশ্তের আটটি দরজার মধ্যে শুধুমাত্র তওবার একটি দরজা ছাড়া আর সবকয়টি বন্ধ রাখা হয়েছে। পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত তওবার দরজাটি খোলাই থাকবে।'

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, তোমরা যদি এত অধিক পরিমাণে

গুনাহ্ কর, যার স্তূপ আকাশের কিনারায় গিয়ে ঠেকে ; কিন্তু পরক্ষণে যদি স্বচ্ছ–পবিত্র মন নিয়ে আন্তরিকভাবে তওবা কর, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের তওবা কবূল করে নিবেন।

হাদীস শরীফে আছে, মানুষের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় হলো, আল্লাহ্‌র প্রতি প্রত্যাবর্তন ও অনুরাগ সহকারে আয়ূ দীর্ঘ হওয়া।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

كُلُّ ابْنِ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ۔

'বনী আদম মাত্রই গুনাহ্‌গার ; কিন্তু উত্তম গুনাহ্‌গার সে–ই, যে তওবাকারী হয়।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একদা এক বান্দা গুনাহ্ করার পর অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে আরজ করলো, ইয়া আল্লাহ্! আমি গুনাহ্ করে ফেলেছি, আমাকে মাফ করে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ আমার বান্দার আমার প্রতি ঈমান রয়েছে—সে বিশ্বাস করে যে, আমি গুনাহ্ মাফ করে থাকি বা শাস্তি প্রদান করি। অতঃপর তাকে মাফ করে দিলেন। সেই বান্দা কিছুকাল গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার পর পুনরায় পাপে লিপ্ত হয়। ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে সে আবার আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইল। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ আমার বান্দা বিশ্বাস করে যে, আমি গুনাহ্ মাফ করি বা শাস্তি প্রদান করি। অতঃপর তাকে পুনরায় মাফ করে দিলেন। এভাবে কিছুকাল গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার পর সে পুনরায় গুনাহে লিপ্ত হয়ে গেল এবং বললো ঃ ওগো মাওলা! আমি আবার গুনাহ্ করে ফেলেছি, আমাকে মাফ করে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ আমার বান্দা বিশ্বাস করে যে, তার একজন রব্ব আছে, যিনি গুনাহ্ মাফ করেন বা শাস্তি প্রদান করেন। অতঃপর তাকে পুনরায় মাফ করে দিলেন,—এখন যা ইচ্ছা সে করুক।

ইমাম মুনযির (রহঃ) বলেন ঃ 'এখন যা ইচ্ছা সে করুক কথাটির মর্ম হলো, বান্দার দ্বারা গুনাহ্ হয়ে যাওয়ার পর স্বচ্ছ মন ও পুনঃ গুনাহে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আন্তরিকভাবে তওবা ও এস্তেগফার করলে এই তওবা ও এস্তেগফার তার অতীতের গুনাহের জন্য কাফ্‌ফারাহ্

(প্রায়শ্চিত্য, ক্ষমা) হবে। অর্থাৎ সত্যিকার তওবা ও এস্তেগফারের জন্য আন্তরিক অনুশোচনা ও পুনরায় লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প থাকা চাই। অন্যথায় তা হবে মিথ্যুক ও কপট লোকদের তওবা, যা আল্লাহ্‌র কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, গুনাহ্ করার পর মুমিনের অন্তরে একটি কালো দাগ উদ্ভূত হয়। তওবার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার পর যদি কৃতপাপ পরিহার করে, তবে সেই দাগ মিটিয়ে দেওয়া হয়। আর যদি উত্তরোত্তর গুনাহে লিপ্ত হতে থাকে, তবে সেই দাগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে তার অন্তর মোহরযুক্ত করে দেয়। এ'কেই বলা হয় (মরিচা)। পবিত্র কুরআনে তা এভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○

"কখনও এরূপ নয়, বরং তাদের অন্তরসমূহে তাদের (গর্হিত) কার্য-কলাপের মরিচা ধরেছে।" (মুতাফ্‌ফিফীন ঃ ১৪)

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দার প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার কাছাকাছি হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তার কৃত তওবা কবূল করেন।

হযরত মু'আয (রাযিঃ) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হাত ধরে এক মাইল পর্যন্ত চললেন, অতঃপর বললেনঃ ওহে মুআয! তোমাকে আমি নছীহত করি ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় কর, সত্য বল, ওয়াদা পূরণ কর, আমানত রক্ষা কর, খিয়ানত পরিত্যাগ কর, এতীমের প্রতি রহম কর, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার কর, গোস্বা হজম কর, নম্র কথা বল, সালামের ব্যাপক প্রচলন কর, ন্যায়পরায়ণ শাসকের অনুগত থাক, কুরআনের মর্ম গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা কর, আখেরাতের প্রতি অনুরাগী হও, কেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের ভয় কর, পার্থিব আশা-আকাংখা কম কর, সর্বদা নেক আমলে মশগুল থাক। হে মুআয! আমি তোমাকে আরও নছীহত করি ঃ কোন মুসলমানকে কটু বাক্য বলো না, মিথ্যাকে সত্য, সত্যকে মিথ্যা বলো না, ন্যায়পরায়ণ শাসকের অবাধ্যতা করো না, আল্লাহ্‌র যমীনে ফেৎনা-ফাসাদ ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করো না।

হে মুআয! তুমি যেখানেই থাক না কেন, সেখানে বৃক্ষ-তরুলতাই হোক আর জড়পদার্থই হোক তুমি সর্বত্র সর্বদা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, গুনাহ্ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তওবা কর—গোপন গুনাহের জন্য গোপন তওবা আর প্রকাশ্য গোনাহের জন্য প্রকাশ্য তওবা।'

অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'অনুতাপকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রহমতের আশা করতে পারে, কিন্তু হঠকারী ব্যক্তি যেন তাঁর গজবের প্রতীক্ষায় থাকে। ওহে আল্লাহ্‌র বান্দারা! একদিন না একদিন আমলনামা অবশ্যই তোমাদের হাতে আসবে এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে প্রত্যেকেই তার ভাল-মন্দ প্রত্যক্ষ করে নিবে। কিন্তু পরিণাম তারই ভাল হবে, যার শেষাবস্থা ভাল হবে। দিবা-রাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত আপন গতিতে দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে, অতএব শীঘ্র আখেরাতের প্রস্তুতি নাও, আমলের দিকে বেগবান হও, টালবাহানা ও গাফলতিকে মোটেও প্রশ্রয় দিও না। কারণ, মৃত্যু এমন এক বস্তু, যা অকস্মাৎ এসে হাজির হয়ে যাবে, তখন তোমার করার কিছু থাকবে না। খবরদার! আল্লাহ্ পাকের অনন্ত ধৈর্য ও বাহ্যিক অবকাশ প্রদানে ধোকায় পড়ো না, আত্মবিস্মৃত হয়ো না। কারণ, দোযখের আগুন তোমা থেকে খুব বেশী দূরে নয়। অতঃপর হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

"যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ নেক কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে ; আর যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ বদ্ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।" (যিলযাল ঃ ৭,৮)

ত্বব্‌রানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ۔

"গুনাহ্ থেকে তওবাকারী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার মোটেই কোন গুনাহ্ নাই।"

বায়হাক্বী শরীফে আছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার পর পুনরায় গুনাহে লিপ্ত হলো, সে যেন আল্লাহ্র সাথে ঠাট্টা করলো।'

ইব্নে হাব্বান ও হাকেম রেওয়ায়াত করেন, 'তওবার মূল, বিষয়ই হচ্ছে অন্তরের অনুতাপ ও অনুশোচনা।' অর্থাৎ হজ্জের জন্য আরাফার ময়দানে অবস্থান করা যেমন রুক্‌ন বা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বিষয়, তওবার জন্যে অনুতাপ-অনুশোচনা ঠিক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্তরে এরূপ প্রতিক্রিয়ার অর্থ হলো স্বীয় পাপ ও কৃতকর্মের উপর আল্লাহ্র আযাব ও শাস্তির ভয় অন্তরে জাগরুক হওয়া। ধন-সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি বা মান-সম্মানের ঘাটতি হতে বাঁচার স্বার্থে অনুশোচনা করলে, তওবার মূল বিষয়ের অবিদ্যমানতার দরুন তা হবে সম্পূর্ণ অন্তসারশূন্য ও নিস্ফল প্রয়াস ; তওবা হিসাবে তা আল্লাহ্র কাছে মোটেও গণ্য হবে না।

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَا عَلِمَ اللّٰهُ مِنْ عَبْدٍ نَدَامَةً عَلٰى ذَنْبٍ اِلَّا غَفَرَ لَهٗ قَبْلَ اَنْ يَسْتَغْفِرَهٗ مِنْهُ.

"যে বান্দা কৃতপাপের দরুন লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়,—যা প্রকৃত পক্ষে একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানতে পারেন—সেই বান্দা ক্ষমা প্রার্থনা করার পূর্বেই আল্লাহ্ পাক তাকে ক্ষমা করে দেন।"

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যার কুদরতের মুঠোয় আমার প্রাণ, তোমরা গুনাহ্ করবে এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে—এরূপ যদি না হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা এমন জাতি সৃষ্টি করবেন যারা গুনাহে লিপ্ত হবে এবং আল্লাহ্র কাছে তওবা করবে, অতঃপর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন।

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লাহ্র চাইতে অধিক গুণ-

কীর্তন ও প্রশংসা পছন্দকারী আর কেউ নয়, অতএব, তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ্র চাইতে অধিক আত্মমর্যাদাবান কেউ নয়, তাই তিনি অশ্লীল কার্যকলাপ হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ্র চাইতে অধিক উযর–আপত্তি ও অক্ষমতা কবূলকারী আর কেউ নয়, তাই তিনি কুরআন নাযিল করেছেন এবং রাসূল পাঠিয়েছেন।'

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, জুহাইনা গোত্রের একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়। সে অশ্লীল অপকর্মে (ব্যভিচারে) লিপ্ত হওয়ায় তার অবৈধ গর্ভের সঞ্চার হয়েছিল। সে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি হদ্দের (শরয়ী দণ্ডের) উপযুক্ত অপরাধ করেছি ; আমার উপর হদ্দ প্রয়োগ করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিভাবককে ডেকে উপস্থিত করে বললেন, তাকে যত্ন সহকারে তোমাদের তত্ত্বাবধানে রাখ, সন্তান খালাস হওয়ার পর আমার কাছে নিয়ে এসো। যথাসময়ে তাকে পুনরায় নিয়ে আসার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হলো। অতঃপর হুযূর (সাঃ) নিজে জানাযা পড়লেন। হযরত উমর (রাযিঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তার জানাযা পড়লেন, অথচ সে ব্যভিচার করেছে? হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ ওহে উমর! মহিলাটি এমন তওবা করেছে, যদি তা মদীনার প্রচুর সংখ্যক লোকদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয়, তাহলে সকলের জন্য তা যথেষ্ট হবে ; তুমি কি এরূপ তওবাকারী কখনও দেখেছ যে আল্লাহ্র জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছে?

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার নয় দু'বার নয়—এভাবে তিনি বলতে বলতে বললেন, সাতবারও নয় বরং আরও অধিকবার বলতে শুনেছি যে, বনী ইসরাঈল গোত্রের জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি অশ্লীল অপকর্মে অভ্যস্থ ছিল। একদা জনৈকা মহিলা তার নিকট হাজির হওয়ার পর তাকে ষাট দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদানান্তে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করলো। এভাবে লোকটি যখন স্বীয় মনোস্কামনা পূরণের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি ও উত্তেজনার আসনে বসলো, তখন স্ত্রীলোকটির সর্বশরীর থর থর করে

কাঁপতে আরম্ভ করলো এবং সে কাঁদতে লাগলো। লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কাঁদছ কেন, তবে কি আমাকে তোমার অপছন্দ হচ্ছে। স্ত্রীলোকটি বললো ঃ না, বরং আমি জীবনে কোনদিন এহেন অশ্লীল কার্যে লিপ্ত হয় নাই, আজকে শুধুমাত্র ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এ কাজের জন্য বাধ্য হচ্ছি, এজন্যেই আমি বিচলিত, উৎকণ্ঠিত। লোকটি বললো, তোমার এহেন ভূখা-ফাকা ও দারিদ্রাবস্থায়ও তুমি এ থেকে বিরাগী আর এ কাজে তুমি জীবনেও কদর্যক্ত হও নাই ; এ দীনারগুলো তোমারই জন্য, আর আল্লাহ্‌র কসম, ভবিষ্যতে আমিও এ কাজে কোনদিন লিপ্ত হবো না। আল্লাহ্‌র মর্জী সেই রাত্রেই তার মৃত্যু হয়। লোকজন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে তার বাড়ীর দরজায় লেখা ঃ 'আল্লাহ্, তা'আলা এ লোকটিকে মাফ করে দিয়েছেন।'

হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত অতীতের এক সময়ে দু'টি জনপদ ছিল, একটি পুণ্যবান লোকদের, আরেকটি পাপী লোকদের। পাপী লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি স্বীয় জন্মভূমি ত্যাগ করে সৎলোকদের এলাকায় যাত্রা করলো। উদ্দেশ্য ছিল সৎভাবে জীবন-যাপন করবে। কিন্তু খোদার মর্জী পথিমধ্যে এক জায়গায় লোকটি মারা গেল। এখন তাকে কেন্দ্র করে রহমতের ফেরেশ্‌তা ও শয়তানের মধ্যে ঝগড়া শুরু হলো। শয়তান বললো ঃ খোদার কসম, সে কোনদিন আমার কথা অমান্য করে নাই। ফেরেশ্‌তা বললেন ঃ লোকটি বাড়ী হতে তওবা করে বের হয়েছে। করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা উভয়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিলেন ঃ তোমরা লোকটির মৃতদেহকে কেন্দ্র করে জরীপ করে দেখ দুই জনপদের মধ্যে সে কোন্‌টির অধিক নিকটবর্তী। দেখা গেল সে সৎলোদের এলাকার দিকে এক বিঘত পরিমাণ স্থান অধিক অতিক্রম করেছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন। আবার একথাও রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপন রহমতে সৎলোকদের এলাকাটিকে নিকটতম করে দিয়েছিলেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, পূর্বেকার যুগে এক ব্যক্তি ঘোর পাপী ছিল। বিনা অপরাধে সে নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করেছে। পরিশেষে নিজের কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করার ইচ্ছা করলো। সে জানতো না যে, আল্লাহ্‌র দরবারে তার তওবা কবূল

হবে কিনা। অতএব, সে একজন বুযুর্গ লোকের অনুসন্ধান করছিল। ইতিমধ্যে লোকমুখে একজন প্রসিদ্ধ আবেদ লোকের সন্ধান পেয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো ঃ আমি একজন ঘোর পাপী, বিনা দোষে নিরানব্বই জন নিরপরাধ লোককে আমি হত্যা করেছি, বলুন আমার তওবা কবূল হবে কিনা? দরবেশ লোকটি উত্তর করলো ঃ তোমার তওবা কবূল হবে না। এ কথা শুনে পাপী লোকটি হতাশ হয়ে এ আবেদ লোকটিকেও হত্যা করে নরহত্যার সংখ্যা একশত পূর্ণ করে নিলো। অতঃপর সে আরেকজন বিখ্যাত আলেমের সন্ধান জানতে পেরে তার খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আমি একজন ঘোর পাপী, আমার তওবা কবূল হবে কিনা? আলেম লোকটি উত্তর করলো ঃ 'তোমার তওবা কবূল হবে, কিন্তু তোমার আবাসভূমিই সর্ববিধ পাপের কারণ, তুমি অন্যত্র অমুক স্থানে চলে যাও, সেখানে বহু আবেদ লোক বাস করেন, তুমিও তাদের সাথে ইবাদতে মগ্ন হয়ে যাও।' সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থানের উদ্দেশে রওনা হলো। কিন্তু গন্তব্যস্থানে পৌঁছার পূর্বেই মধ্যপথে সে প্রাণ ত্যাগ করলো। এখন তাকে বেহেশ্‌তে নিয়ে যাওয়া হবে কি দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, এ নিয়ে রহমতের ফেরেশ্‌তা ও আযাবের ফেরেশ্‌তার মধ্যে মতভেদ হতে ল্যাগলো। প্রত্যেকে বলতে লাগলো ঃ এই লোক আমার আওতার মধ্যে। এ সময় আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হতে নির্দেশ আসলো, তোমরা পাপীর বাসগৃহ ও দরবেশদের আশ্রমের দূরত্ব জরীপ করে দেখ, মৃতদেহ থেকে কোন দিকের দূরত্ব অধিক। দেখা গেল, দরবেশদের আশ্রমের দিকে সে এক বিঘত পরিমাণ স্থান অধিক অতিক্রম করেছিল। নির্দেশ হলো তাকে বেহেশ্‌তে নিয়ে যাও। তৎক্ষণাৎ রহমতের ফেরেশ্‌তা তাকে বেহেশ্‌তে নিয়ে গেল। অপর এক রেওয়ায়াতে প্রকাশ, আল্লাহ্‌ তা'আলা একদিকের যমীনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, দূরবর্তী হয়ে যাও এবং অপর দিকের যমীনকে নির্দেশ দিয়েছেন নিকটবর্তী হয়ে যাও। তারপর জরীপ করতে হুকুম করেছেন। ফলে, লোকটি দরবেশদের আশ্রমের দিকে নিকটবর্তী হয় এবং তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।'

অধ্যায় ঃ ৫৪

জুলুম-অত্যাচার

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ۝

"আর যারা জুলুম করেছে, তারা অচিরেই জানতে পারবে, কেমন স্থানে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে।" (শু'আরা ঃ ২২৭)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

"বস্তুতঃ জুলুম কিয়ামত দিবসে বহু (শাস্তি ও) অন্ধকারের কারণ হবে।" তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِّنْ اَرْضٍ طَوَّقَهُ اللّٰهُ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি অন্যের এক বিঘৎ পরিমাণ যমীনও জুলুম করে দখল করে নিবে, আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক যমীনের বোঝা বেড়িরূপে পরিয়ে দিবেন।"

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক (হাদীসে কুদসীতে) বলেন, অত্যাচারী ব্যক্তির উপর আমার ক্রোধ খুবই কঠিন (ও মারাত্মক) হবে, সে এমন ব্যক্তির উপর জুলুম করলো, যে আমাকে ছাড়া অপর কাউকে সাহায্যকারীরূপে পায় নাই।"

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ "তুমি যখন ক্ষমতার আসীনে সমাসীন থাক, তখন কারও উপর জুলুম করো না, কেননা জুলুমের পরিণাম নিশ্চিত অনুতাপ ও লজ্জা। কারও উপর জুলুম করে তুমি নিদ্রাভিভূত থাকলেও মজলূম কিন্তু বিনিদ্র রাতে তোমার বিরুদ্ধে আল্লাহ্র দরবারে

ফরিয়াদে মগ্ন আছে, আর অনন্ত জাগ্রত মহান আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন তা শুনছেন।

অপর একজন উপদেশ দিয়েছেন ঃ "পৃথিবীর বুকে কোন জালেমকে যখন তুমি দেখ যে, সে প্রচুর জুলুমে লিপ্ত রয়েছে, তখন তুমি তার বিচার যমানার (কুদ্রতের) হাতে ছেড়ে দাও ; অচিরেই সে এমন শাস্তি পেয়ে যাবে, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।"

আদর্শ পূর্বসূরীদের একজন বলেছেন, "তোমরা কমজোর-দুর্বলদের উপর জুলুম করো না, এতে তোমরা সবল হয়েও নিকৃষ্টতম গণ্য হবে।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, সরখাব (লাল রঙের হাঁস বিশেষ) পাখীও জালেমের জুলুমের ভয়ে তার ক্ষুদ্র গৃহে আত্মগোপন করে মৃত্যুবরণ করে।"

হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, যখন হাবাশা গমনকারী মুহাজির সাহাবীগণ সেখান থেকে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন আল্লাহ্র রসূল তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন— হাবাশার কোন ঘটনা কি তোমরা আমাকে বলবে না? হযরত কুতাইবাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমাদের মধ্যে হযরত আলী (রাযিঃ)-ও ছিলেন ; জবাবে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সেখানে একটি ঘটনা এই ঘটেছিল—আমরা উপস্থিত ছিলাম ; এমন সময় একজন বৃদ্ধা মহিলা মাথায় একটি মাটির কলসী নিয়ে পথ অতিক্রম করছিল, তখন একটি যুবক বৃদ্ধা মহিলাটিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। ফলে, মহিলাটি উপুড় হয়ে পড়ে গেল এবং তার কলসীটি ভেঙ্গে গেল। মহিলাটি মাটি থেকে উঠে যুবকের দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার দাম্ভিক আচরণের প্রায়শ্চিত্ত অচিরেই তুমি ভোগ করবে— যখন আল্লাহ্ তা'আলা বিচারের আসনে সমাসীন হবেন, পূববর্তী ও পরবর্তী সকল আদম-সন্তানকে একত্রিত করবেন, সকলের হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীয় কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে, তখন সেই কাল ক্বিয়ামতের দিবসে তোমার-আমার এ ফয়সালা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে নিবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "এ জাতি কিভাবে পাক-পবিত্র হবে, যাদের সবল লোকেরা দুর্বলদের উপর জুলুম করে, অথচ এর কোন বিচার-প্রতিকার করা হয় না।"

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

خَمْسَةٌ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اِنْ شَاءَ اَمْضٰى غَضَبَهُ عَلَيْهِمْ فِى الدُّنْيَا وَاِلَّا تَوٰى بِهِمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَى النَّارِ اَمِيْرُ قَوْمٍ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ رَعِيَّتِهٖ وَ لَا يُنْصِفُهُمْ مِنْ نَفْسِهٖ وَ لَا يَدْفَعُ الظُّلْمَ عَنْهُمْ وَ زَعِيْمُ قَوْمٍ يُطِيْعُوْنَهُ وَ لَا يُسَوِّىْ بَيْنَ الْقَوِىِّ وَالضَّعِيْفِ وَيَتَكَلَّمُ بِالْهَوٰى ورجل لا يامر اهله و ولده بِطَاعَةِ اللّٰهِ ولا يعلمهم امر دِيْنِهِمْ ورجل اِستاجر اجِيرا فاستعمله ولم يوفِه اَجره ورجلٌ ظَلَمَ امْرَأَةً فِىْ صَدَاقِهَا

"আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচ শ্রেণীর লোকের উপর রাগান্বিত ; ইচ্ছা করলে তিনি দুনিয়াতেই তাদের উপর আযাব-গজব নাযিল করবেন, অথবা পরকালে তাদেরকে দোযখের ভয়াবহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন ঃ

এক,— অত্যাচারী শাসক, যারা প্রজাদের কাছ থেকে অধিকার আদায় করে কিন্তু তাদের সাথে ইনসাফ ও ন্যায়-আচরণ করে না, তাদের উপর অপরের জুলুম-নির্যাতনেরও কোন প্রতিকার করে না।

দুই,— নেতৃস্থানীয় লোক, সাধারণ লোকজন তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ করে, কিন্তু সবল ও দূর্বলের মধ্যে তারা ভারসাম্য ও সত্যিকার ন্যায় আচরণ বজায় রাখে না বরং প্রবৃত্তির অনুসরণ ও ইন্দ্রিয়জ স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত থাকে।

তিন,— গৃহকর্তা বা অভিভাবক, যারা পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততিকে ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে না এবং দ্বীনি বিষয়াবলী শিক্ষা দেয় না।

চার,— যে ব্যক্তি শ্রমিক-মজদূরকে পুরাপুরিভাবে খাটিয়ে কাজ নেয়,

কিন্তু তাদের পূর্ণ পারিশ্রমিক দেয় না।

পাঁচ,— যে ব্যক্তি স্ত্রীর মহর পরিশোধের ব্যাপারে জুলুম করে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে সালাম (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন সমস্ত মখ্‌লূকাত সৃষ্টি করলেন, তখন তারা মাথা উঠিয়ে আল্লাহ্ তা'আলাকে জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহ্! আপনি কার সাথে আছেন? আল্লাহ্ বললেন, আমি মজলূমের সাথে আছি ; যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রাপ্য হক আদায় না করা হয়।

হযরত ওয়াহ্‌ব ইব্‌নে মুনাব্বিহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক অত্যাচারী ব্যক্তি একটি অতি মজ্‌বূত প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। একজন দরিদ্র বৃদ্ধা মহিলা এর পাশেই ক্ষুদ্র একটি ঘর বানিয়ে সেটিতে বসবাস করতে লাগলো। সেই অত্যাচারী ব্যক্তি একদিন অশ্বে আরোহণ করে তার প্রাসাদ পরিদর্শনের সময় বৃদ্ধার প্রাসাদটি তার নজরে পড়লে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলো— এটি এক দরিদ্র বৃদ্ধার ঘর। এ কথা জেনে সে ঘরটি ধ্বসিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলো। অতঃপর তা ধ্বসিয়ে দেওয়া হলো। বৃদ্ধা এসে এহেন অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলো, সেই অত্যাচারী বাদশাহ্ এ কাজটি করেছে। তৎক্ষণাৎ আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বৃদ্ধা বললো, আয় আল্লাহ্! আমি এখানে ছিলাম না, কিন্তু আপনি কোথায় ছিলেন? আল্লাহ্ হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-কে হুকুম দিলেন, অত্যাচারীর এ প্রাসাদটি তার উপরেই ধ্বসিয়ে দাও। সুতরাং তাই করা হলো এবং অত্যাচারী লোকটি এভাবে ধ্বংস হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে, জনৈক বরমকী উজীর তার পুত্র সহকারে বন্দী হয়ে জেলখানায় আবদ্ধ হয়ে গেল। পুত্র জিজ্ঞাসা করলো, আব্বাজান! এতো প্রভাব ও সম্মান-প্রতিপত্তির পরও আমরা এরূপ লাঞ্ছিত হলাম—এর কারণ কি? পিতা বললো, বৎস! কোন মজলূমের বদ-দোআ রাতের অন্ধকারে ছিট্‌কে এসে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, আর আমরা গাফেল ছিলাম; কিন্তু অনন্ত আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন গাফেল ছিলেন না।

হযরত ইয়াযীদ ইব্‌নে হাকীম (রহঃ) বলেন, আমি আমার অন্তরে সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় অনুভব করি ঐ ব্যক্তির, যার উপর আমি জুলুম করে ফেলি, আল্লাহ্ ছাড়া যার কোন সাহায্যকারী নাই। সে এ কথা বলতে থাকবে যে,

আল্লাহ্‌র সাহায্যই আমার জন্য যথেষ্ট ; তোমার আমার মাঝে আল্লাহ্‌ রয়েছেন।

হযরত আবূ উমামাহ্‌ (রাযিঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন জালেম আসবে– সে যখন দোযখের উপর দিয়ে পুল অতিক্রম করতে থাকবে, তখন মজলূমের সাক্ষাৎ হবে। দুনিয়াতে মজলূমের উপর সে যে জুলুম করেছিল, সবই তার স্মরণ হবে। মজলূম ব্যক্তিরাও নিজ নিজ প্রাপ্য হক ওসূল করতে চাবে। তখন এই জালেম ও মজলূমের মাঝে তুমুল বিতর্ক চলতে থাকবে। পরিশেষে মজলূম ব্যক্তিরা জালেমদের সমস্ত নেকী নিয়ে নিবে। এতে যদি জালেমের নেকী শেষ হয়ে যায় এবং মজলূমের প্রাপ্য বাকী থাকে, তবে সেই পরিমাণ পাপের বোঝা মজলূমের নিকট থেকে জালেমের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। ফলে, জালেম দোযখের নিম্নতর গহ্বরে গিয়ে পৌছবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌নে উনাইস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামতের দিন লোকদেরকে খালি পা, উলঙ্গ দেহ এবং খত্‌নাবিহীন অবস্থায় উঠানো হবে। তখন একজন আহ্বানকারী আওয়াজ দিবে—যা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলেই সমানভাবে শুনতে পাবে যে, আমি চরম প্রতিশোধ গ্রহণকারী বাদ্‌শাহ্‌, কোন বেহেশ্‌তী বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত একজন দোযখী ব্যক্তিও তার কাছে কোন জুলুমের বদলা দাবী করবে ; এমনকি একটি থাপড়ও পাওনা থাকলে তা পরিশোধ করতে হবে। অনুরূপভাবে, কোন দোযখী দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে না, যে পর্যন্ত তার কাছে কারও জুলুমের বদলা পাওনা থাকবে ; এমনকি একটি থাপড় হলেও তা পরিশোধ করতে হবে। বস্তুতঃ তোমার রব্ব কারও উপর জুলুম করেন না। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌, তখন কি অবস্থা হবে— আমরা উলঙ্গ পা, উলঙ্গ দেহ এবং খত্‌নাবিহীন অবস্থায় থাকবো? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেদিন নেকী–বদীর পূরা–পূরি বদলা দেওয়া হবে ; তোমাদের রব্ব কারও উপর জুলুম করবেন না।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে কাউকে একটি বেত্রাঘাতও করেছে, ক্বিয়ামতের দিন এর প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

বর্ণিত আছে, সম্রাট কিস্‌রা তাঁর পুত্রকে আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন উস্তায নিযুক্ত করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে পুত্র যখন বেশ কিছু জ্ঞান-বিদ্যার অধিকারী হলো, তখন একদিন তাকে ডেকে তার কোনরূপ অন্যায়-অপরাধ ব্যতিরেকেই উস্তায্ খুব প্রহার করলেন। এতে সম্রাটের পুত্র রাগান্বিত হলো, কিন্তু এ রাগ অন্তরে গোপন করে রাখলো। পিতার মৃত্যুর পর যখন সে বাদশাহ্ হলো, তখন উস্তায্‌কে উপস্থিত করে জিজ্ঞাসা করলো—আপনি আমাকে অমুক দিন কোনরূপ অন্যায়-অপরাধ ব্যতিরেকেই এতো কঠোরভাবে প্রহার করেছিলেন কেন? উস্তায্ জবাব দিলেন হে বাদশাহ্, আপনি জ্ঞান-বিদ্যার অনুশীলনে তখন খুবই পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন ; এবং আমি তখনই জানতাম যে, পিতার পর একদিন আপনিই বাদশাহ্ হবেন। এজন্যে আমি তখনই আপনার উপলব্ধির মধ্যে এনে দিতে চেয়েছি যে, জুলুম-অত্যাচার ও প্রহৃত হওয়ার কষ্ট কি, যাতে পরবর্তীতে অন্য কারও উপর জুলুম থেকে আপনি বিরত থাকুন। সম্রাট এ উত্তর শুনে আনন্দিত হলেন এবং উস্তায্‌কে পুরস্কৃত করে বিদায় করলেন।

অধ্যায় ঃ ৫৫

এতীমের উপর জুলুম-অত্যাচারের নিষিদ্ধতা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ○

"নিশ্চয় যারা এতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে, তারা নিজেদের উদরে অগ্নি ছাড়া আর কিছুই পুরছে না, এবং অতি সত্বরই তারা জ্বলন্ত আগুণে প্রবেশ করবে।" (নিসা ঃ ১০)

হযরত ক্বাতাদাহ্ (রাযিঃ) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতটি গাত্ফান গোত্রের জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে; ব্যক্তিটি স্বীয় এতীম-নাবালেগ ভ্রাতুষ্পুত্রের অভিভাবক ছিল। অবশেষে তার সম্পত্তি থেকে সে নিজেও খেয়েছিল।

আয়াতে ব্যবহৃত 'জুলমান'-এর অর্থ হলো, জুলুমবশতঃ কিংবা জুলুমরত অবস্থায়। কাজেই বিনা জুলুমে অর্থাৎ অভিভাবক যদি তার প্রাপ্য হক গ্রহণ করতে চায়, তবে এতে আপত্তির কিছু নাই। বিস্তারিত শর্ত-শরায়েত ফেক্বাহ্র কিতাবসমূহে উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

"আর যে ব্যক্তি অভাবমুক্ত, সে নিজকে সম্পূর্ণ বিরত রাখবে, আর যে অভাবী, সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে।" (নিসা ঃ ৬)

অর্থাৎ প্রয়োজন পরিমাণ ব্যবহার করলে বৈধ হবে। অথবা করজ নিতে পারে, কিংবা পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। এ ছাড়া একেবারে

নিরুপায় অবস্থায় উপনীত হলে গ্রহণ করবে এবং স্বচ্ছলতার পর তা ফেরৎ দিবে। গ্রহণের পর স্বচ্ছল অবস্থা না হলে তার জন্য তা হালাল।

আল্লাহ্ তা'আলা এতীমের হক ও অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে অত্যন্ত জোর তাকীদ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ○

"আর এরূপ লোকদের ভয় করা উচিত যে, যদি তারা নিজেদের পশ্চাতে ছোট ছোট সন্তান ত্যাগ করে (মারা) যায়, তবে এদের জন্য তাদের (কেমন) ভাবনা হবে! সুতরাং তাদের উচিত—আল্লাহ্কে ভয় করা।"(নিসা ঃ ৯)

আশে-পাশের আয়াতদৃষ্টে উপরোক্ত আয়াতে এতীমের হক সংরক্ষণের উপরই তাকীদ করা হয়েছে বুঝা যায়। যদিও কেউ কেউ আয়াতখানিকে এক তৃতীয়াংশের অধিক ওসীয়তের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

যার অভিভাবকত্বে কোন এতীম রয়েছে, তার উচিত এতীমের সাথে সৎ ও সুন্দর ব্যবহার করা। এমনকি তাকে সম্বোধন করতেও যেন সুন্দরভাবে ডাকা হয়। নিজের সন্তানদেরকে যেভাবে আদর-সোহাগের সাথে ডাকা হয়, সেভাবে এতীমকেও যেন ডাকা হয়। নিজের সম্পদের হেফাযতের ব্যাপারে যেমন মনোযোগ ও সচেতনতা অবলম্বন করা হয়, এতীমের সম্পদের ব্যাপারেও ঠিক তেমনি করা চাই। এ ব্যাপারে যে যতটুকু নিষ্ঠা ও খাঁটিত্বের সাথে আমল করবে, কিয়ামতের দিন সে ঠিক সেই অনুপাতে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বদ্লা পাবে। খেয়াল রাখতে হবে— কেয়ামতের দিন তথা প্রতিদান দিবসের একমাত্র মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। সুতরাং সেদিন প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের ফল পাবে।

কারও মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর যদি কেউ তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবক নিযুক্ত হয় এবং সে এ দায়িত্বের উপর সময় অতিক্রম করে, অতঃপর অকস্মাৎ তার মৃত্যু এসে যায়, এমতাবস্থায় সে যদি অন্যের সম্পদ ও সন্তানের বেলায় সততা ও আমানতদারীর পরিচয় দিয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যক্তির সম্পদ ও সন্তানের হেফাযতের জন্য ঠিক তদ্রূপ

ব্যবস্থা করে দিবেন, যেরূপ সে অন্যের বেলায় করেছিল। পক্ষান্তরে, যদি সে অন্যের ক্ষতি করে থাকে, তবে নিজ সম্পদ ও সন্তানের বেলায় সেই প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হবে। অতএব, বুদ্ধিমান লোকের উচিত, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা। দ্বীন ও আখেরাতের ক্ষেত্রে তো ক্ষতি রয়েছেই, এসব ব্যাপারে অবহেলা করলে দুনিয়াতেই সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তাই, আপন তত্ত্বাবধানে লালিত এতীমদের সাথে এরূপ সদ্ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ করা চাই, যেরূপ নিজের সন্তানদের বেলায় তাদের এতীম হওয়ার পর কামনা করা হবে।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাঊদ আলাইহিস্ সালামের নিকট ওহী পাঠালেন ঃ "হে দাঊদ! এতীমের জন্য দয়ালু পিতা এবং বিধবার জন্য স্নেহশীল স্বামীর ন্যায় হয়ে যাও। আর স্মরণ রাখ, তুমি বীজ যেরূপ বপন করবে, ফল তদ্রূপই পাবে। অর্থাৎ তোমার আচরণ যেমন হবে, তোমার সাথে সেরূপ আচরণই করা হবে। এর কারণ হচ্ছে, মৃত্যু অতি অবশ্যম্ভাবী ; কাজেই তোমাকে একদিন মরতে হবে, তোমার সন্তান-সন্ততি এতীম হবে এবং তোমার স্ত্রী-ও বিধবা হবে।"

এতীমের মাল-সামান হেফাজত, তাদের প্রতি সুন্দর-সদ্ব্যবহার এবং তাদের উপর সর্ববিধ জুলুম-অত্যাচার থেকে বেঁচে থাকা সম্পর্কিত বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। বস্তুতঃ এ হাদীসসমূহ ঐসব আয়াতেরই অনুরূপ যেগুলোর মাধ্যমে লোকদেরকে এ বিষয়ে কঠোর সতর্ক করা হয়েছে এবং এতীমের প্রতি জুলুমের বিপদসঙ্কুল ও ধ্বংসাত্মক পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলিম শরীফ প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ "হে আবূ যর! আমি তোমাকে দুর্বল দেখছি ; তোমার জন্য আমি তাই পছন্দ করি, যা আমি নিজের জন্য করি। সুতরাং তুমি দু'টি লোকের নেতৃত্বের ভারও নিজ কাঁধে নিও না এবং এতীমের মালের তত্ত্বাবধায়ক হয়ো না।"

বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে আত্মরক্ষা করে চলো। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, সেগুলো কি? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইরশাদ করলেন, আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা, যাদু করা, না-হক কতল করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল খাওয়া........।

বায্‌যার রেওয়ায়াত করেছেন, বড় গোনাহ্ সাতটি ; আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা, কাউকে না-হক কতল করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল খাওয়া...... ।

হাকেম কর্তৃক সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, চার শ্রেণীর লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার হক রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না এবং (পরকালে) তাদেরকে কোন নেআমতের স্বাদ আস্বাদন করাবেন না। এক. মদ্যপানে অভ্যস্ত দুই. সূদখোর তিন. অন্যায়ভাবে এতীমের মাল ভক্ষণকারী চার. পিতামাতার অবাধ্য সন্তান।

সহীহ্ ইব্‌নে হাব্বানে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসীদের প্রতি যে চিঠি হযরত আমর ইব্‌নে হায্‌মের হাতে পাঠিয়েছিলেন, তাতে এ কথাও লেখা ছিল যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বড় গোনাহ্ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে শির্ক করা, কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে না-হক হত্যা করা, তুমুল যুদ্ধ চলাকালে ময়দান ছেড়ে পলায়ন করা, পিতা-মাতার না-ফরমানী করা, সতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা, যাদু শিক্ষা করা, সূদ খাওয়া ও এতীমের মাল খাওয়া।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ এরূপ বিচার-বুদ্ধিহারা হয়ো না যে, লোকেরা যদি এহ্‌সান-উপকার করে, তাহলে তুমি এহ্‌সান-উপকার করবে, আর তারা যদি জুলুম করে, তাহলে তুমিও জুলুম করবে। বরং এরূপ চরিত্রের অধিকারী হও যে, লোকেরা এহ্‌সান করলে তুমিও এহ্‌সান করবে আর তারা জুলুম বা দুর্ব্যবহার করলেও তুমি তা করবে না।

আবূ ইয়ালা রেওয়ায়াত করেছেন যে, কেয়ামতের দিন একদল লোক হবে, তাদেরকে কবর থেকে এরূপ অবস্থায় বের করো হবে যে, তাদের মুখ-গহ্বর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা বের হতে থাকবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, তারা কারা? তিনি বললেন, তোমরা কি লক্ষ্য কর

নাই, আল্লাহ্ তা'আলা পাক কালামে কি বলেছেন? ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۝

"যারা অন্যায়ভাবে এতীমের মাল ভোগ করে, তারা অবশ্যই নিজেদের উদরে অগ্নি পুরে নিচ্ছে।" (নিসা ঃ ১০)

মেরাজ শরীফের হাদীসে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি হঠাৎ এমন কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদের উপর কিছু লোক মোতায়েন করে দেওয়া হয়েছে, এদের কয়েকজন তাদের মুখ–গহ্বর হা করিয়ে ধরে রাখে আর অবশিষ্টরা আগুনের পাথর এনে তাদের মুখের ভিতর ভরে দিচ্ছে, আর তা তাদের পিছন–পথ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। আমি (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিব্রাঈল! এসব লোক কারা? তিনি বললেন, যারা এতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের উদর আগুনের দ্বারা পূর্তি করে নিচ্ছে।

তফসীরে কুর্তুবী গ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)–এর রেওয়ায়াত বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে রাত্রিতে আমাকে (বায়তুল–মুকাদ্দাস ও আকাশমণ্ডলীর মে'রাজ) সফর করানো হয়েছে, সে রাত্রিতে আমি দেখেছি যে, একদল লোকের ঠোঁট উটের ঠোঁটের মত ; তাদের উপর ফেরেশতা মোতায়েন করে দেওয়া হয়েছে। এঁরা তাদের ঠোঁটদ্বয় ফাঁক করে মুখের ভিতর আগুনের পাথর ঢেলে দিচ্ছে এবং তা তাঁদের পশ্চাৎপথ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিব্রাঈল! এসব লোক কারা? তিনি বললেন, এরা দুনিয়াতে এতীমের মাল জুলুম করে ভক্ষণ করতো।

অধ্যায় ঃ ৫৬

অহংকারের অপকারিতা

এ সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু অহংকার ও আত্মম্ভরিতার এ দুর্বৃত্তটি যেহেতু মানুষের দুশ্চরিত্রাবলীর মধ্যে অন্যতম এবং এর পরিণতি খুবই জঘন্য ও মারাত্মক, তাই এ বিষয়ের উপর পুনঃ আলোচনা আবশ্যক।

অভিশপ্ত ইবলীস থেকে সর্বপ্রথম যে গুনাহ্টি নিঃসৃত হয়েছিল তা এই অহংকার ও আত্মম্ভরিতার গুনাহ্। যার ফলশ্রুতিতে সে আল্লাহ্র অভিশপ্ত হয়ে যমীন ও আসমানের প্রশস্ততাসম বেহেশ্ত থেকে বহিস্কৃত হয়ে দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

হাদীসে কুদ্সীতে আছে, বড়ত্ব আমার চাদর, মহত্ত্ব আমার ইযার (পোষাক বিশেষ)। অতএব, এতদুভয়ের যে কোন একটি নিয়ে যে ব্যক্তি আমার সাথে টানাটানিতে লিপ্ত হবে, আমি লা-পরওয়া তাকে টুক্রা-টুক্রা করে দিবো।

বর্ণিত আছে, অহংকারী-দাম্ভিকদেরকে মানবাকৃতি বজায় রেখে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পিপিলিকার আকারে হাশরের ময়দানে উত্থিত করা হবে। সর্বদিক থেকে তাদের উপর লাঞ্ছনার বান নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে, তাদেরকে দোযখীদের যখম ও ফোঁড়ার পূঁজ ও দূর্গন্ধময় রক্ত পান করানো হবে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَ مَلِكٌ جَائِرٌ وَ عَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

ক্বেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তিন শ্রেণীর লোকদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি কোনরূপ (রহমতের) দৃষ্টিও করবেন না। অধিকন্তু তাদের জন্য থাকবে দোযখের মর্মন্তুদ শাস্তি। এক, বৃদ্ধ ব্যভিচারী, দুই, জালেম বাদশাহ্, তিন, দরিদ্র অহংকারী।

বর্ণিত আছে, একদা হযরত উমর (রাযিঃ) নিম্নের এই আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ

অতঃপর বললেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন— এক ব্যক্তি সৎকাজের নির্দেশ প্রদানের জন্য উদ্যত হলো, আর তাকে কতল করে দেওয়া হলো, আরেকজন উঠে বললো, কিহে, তোমরা সৎকাজের প্রতি আদেশদাতাকে কতল করে ফেললে? এবার একেও কতল করে দেওয়া হলো। বস্তুতঃ অহংকারই হচ্ছে এ ধরণের জঘন্যতম অপরাধের উৎস।

হযরত ইব্নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন যে, মানুষের পাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তাকে বলা হলো, আল্লাহ্কে ভয় কর, আর সে উত্তরে বললো, যাও, তুমি তোমার কাজ কর।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলে–ছিলেন, ডান হাতে খাও। উত্তরে সে বলেছে, এটা আমার দ্বারা হবে না। হুযূর বললেন, আচ্ছা, আর না হোক। বস্তুতঃ সে অহংকার ভরে ডান হাতে খেতে অস্বীকার করেছিল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে তার ডান হাত আর কখনও উঠাতে পারে নাই, অর্থাৎ তা অকেজো ও অবশ হয়ে যায়।

বর্ণিত আছে, হযরত সাবেত ইব্নে কায়স ইব্নে শাম্মাস (রাযিঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি স্বভাবগতভাবে রূপ–সৌন্দর্য পছন্দ করি এবং নিজে সাজ–সজ্জা গ্রহণ করে থাকি, এটা কি অহংকার? আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না এটা অহংকার নয়। বরং অহংকার হচ্ছে, হক ও সত্যকে অপছন্দ করা; অস্বীকার করা এবং লোকদেরকে

তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, অথচ তারা তোমারই মত আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা অথবা তারা তোমার তুলনায় শ্রেষ্ঠও হতে পারে।

হযরত ওয়াহ্ব ইব্নে মুনাব্বেহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত মূসা (আঃ) যখন ফেরাউনকে বললেন, ঈমান আন ; তোমার রাজত্ব তোমার হাতেই থাকবে, তখন সে হামানের সাথে পরামর্শের কথা বলেছে। হামান তাকে পরামর্শ দিয়েছে—এতদিন তুমি প্রভু হিসাবে রয়েছ ; লোকেরা তোমার উপাসনা করেছে, এখন তুমি ঈমান আনবে ; ফলে তুমি হবে বান্দা এবং আরেক প্রভুর উপাসনা করতে হবে তোমাকে ; এটা ঠিক নয়। এতে ফেরাউন ঈমান আনা থেকে বিমুখ হয়ে গেল এবং তার অন্তরে হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসারীদের প্রতি ঘৃণা জন্মালো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সমুদ্রে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিলেন।

কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ

"তারা বললো, এ কুরআন উভয় জনপদের (মক্কা ও তায়েফের) মধ্য হতে কোন প্রধান ব্যক্তির উপর কেন নাযিল করা হয় নাই?"

(যুখরুফ ঃ ৩১)

হযরত কাতাদাহ্ (রাযিঃ) বলেন, উক্ত আয়াতে তারা 'দুই জনপদের বড় মানুষদের' দ্বারা ওলীদ ইব্নে মুগীরা ও আবূ মাসঊদ সাকাফীকে বুঝিয়েছে। তারা দাবী করেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তুলনায় তারা দুজন অধিকতর প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী। তারা বলতো, এই এতীম বালককে কি করে আমাদের মধ্যে নবী হিসাবে প্রেরণ করা হলো? আল্লাহ্ পাক তাদের বক্তব্যের জওয়াব দিয়েছেন ঃ

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ط

"এরা কি আপনার রব্বের রহমতকে (স্বীয় মতানুযায়ী) বন্টন করতে চাচ্ছে?" (যুখরুফ ঃ ৩২) উপরন্তু তারা আরও আশ্চর্যান্বিত হবে— তারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর সেখানে যখন মসজিদে নববীর সুফ্ফায়

(আঙ্গিনায়) অবস্থানকারী দরিদ্রদেরকে দেখবে না, তখন তারা বলবে ঃ

مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ

"ব্যাপার কি? আমরা তাদেরকে দেখ্‌ছি না যাদেরকে নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে গণ্য করতাম।" (ছোয়াদ ঃ ৬২)

এক উক্তি অনুযায়ী তারা হযরত আম্মার, হযরত বেলাল, হযরত সুহাইব ও হযরত মিক্বদাদ (রাযিঃ)-কে উদ্দেশ্য করেছে।

হযরত ওয়াহ্‌ব (রাযিঃ) বলেছেন বস্তুতঃ ইল্‌মের তুলনায় হয় মেঘের সাথে, যা আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে। সুমিষ্ট ও স্বচ্ছ পানির বর্ষণ পেয়ে বৃক্ষরাজি প্রতিটি রগে রগে খুবই তৃপ্ত হয়ে পান করে। অতঃপর নিজ নিজ স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী সেই স্বচ্ছ ও মিষ্ট পানির ক্রিয়া গ্রহণ করে— তিক্ত বৃক্ষ তিক্ত ক্রিয়া গ্রহণ করে এবং তার তিক্ততা আরও বৃদ্ধি পায়, অনুরূপভাবে মিষ্ট বৃক্ষের মিষ্টতা বৃদ্ধি পায়। মূলতঃ ইল্‌মের ব্যাপারটিও ঠিক অনুরূপ। ইল্‌ম অন্বেষাকারী স্বীয় পরিশ্রম ও সাধনা অনুপাতে তা অর্জন করে। কিন্তু অহংকারী ব্যক্তির অহংকার এতে আরও বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, বিনয়ী ব্যক্তি ইল্‌ম অধ্যয়ন করে আরও বিনয়ী হয় এবং তার সৎগুণাবলী উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর কারণ হচ্ছে, যার উদ্দেশ্যই অহংকার ও নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা অথচ সে মূর্খ-জাহেল, এমতাবস্থায় ইল্‌মের নাগাল পেলে সে মূলতঃ অহংকার ও বড়াই করার আরও উপকরণ হাতে পেয়ে গেল। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্‌র প্রতি যার অন্তরে ভয় আছে, সে মূর্খ হলেও ইল্‌ম হাসিল করার পর বুঝে নিবে যে, আমার উপর আল্লাহ্ তা'আলার দলীল কায়েম হয়ে গেছে ; সুতরাং আর অন্যথা করা যাবে না। অতএব, সে পূর্বাপেক্ষা আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করবে এবং অধিক মাত্রায় নম্রতা ও বিনয় এখ্‌তিয়ার করবে।

হযরত আব্বাস (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত এক রেওয়ায়াতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ভবিষ্যতে এমন এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু হুল্‌কূমের (গলা) নীচে তা পৌছবে না। তারা বলবে, আমরা কুরআন পড়েছি, অধ্যয়ন করেছি; আমাদের চেয়ে বড় বিজ্ঞ ও আলেম কারা? অতঃপর সাথীদের প্রতি লক্ষ্য

করে বললেন, এসব লোক এ উম্মতের মধ্য থেকেই হবে। বস্তুতঃ এরাই হবে দোযখের ইন্ধন।

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, অত্যাচারী ও অহংকারী আলেম হয়ো না। এতে তোমার মূর্খতা দূর হবে না ; এরূপ ইল্‌ম তোমার কোন উপকারে আসবে না।

বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এক ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়েছিল। কিছুদিন পর লোকটি হুযূরের দরবারে উপস্থিত হলে সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা সেদিন যে লোকটির প্রশংসা করেছিলাম, তিনি উপস্থিত হয়েছেন। আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তার চেহারায় শয়তানের প্রভাব লক্ষ্য করছি। লোকটি সালাম করে হুযূরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। হুযূর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সত্যি করে বল, তোমার মনে কি এ কথা এসেছে যে, এসব লোকের মধ্যে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নাই? লোকটি বললো, হাঁ।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়্যাতের নূর-দৃষ্টিতে তার অন্তরের গোপন বিষয়টি দিব্যি উপলব্ধি করে নিয়েছেন, যা তার চেহারায় তিনি প্রত্যক্ষ করছিলেন।

হারস ইব্‌নে জায' যুবাইদী (রাযিঃ) বলেছেন, জ্ঞানী-গুণী ও আলেমদের মধ্যে যারা হাসিমুখে পেশ আসেন, আমি তাঁদেরকে বড় পছন্দ করি। আর যারা এমন যে, তুমি তাদের সাথে হাসিমুখে খোলা মনে পেশ আস্‌ছো; কিন্তু তারা ভ্রূকুঞ্চিত করে সংকীর্ণ মন নিয়ে সাক্ষাৎ করে। বস্তুতঃ তারা নিজেদের জ্ঞান-গরিমার উপর গর্ব-অহংকারে নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে এসব লোকের আধিক্য থেকে হেফাজত করুন।

বর্ণিত আছে, হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে এক ব্যক্তির উপর কটু বাক্য প্রয়োগ করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, ওহে কৃষ্ণাঙ্গিনীর পুত্র। এ কথা শুনে তিনি বললেন, হে আবূ যর! অনেক বেশী বলা হয়ে গেছে ; কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের (শুধু বর্ণ-তারতম্যের কারণে) কোনই প্রাধান্য নাই। হযরত আবূ যর গেফারী বলেন, আমি মাটিতে শুয়ে পড়লাম এবং লোকটিকে

বললাম তুমি উঠ এবং আমার গণ্ডদেশ পদদলন কর।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন যে, সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা প্রিয় আর কেউ ছিল না। এতসত্বেও তাঁকে দেখে সাহাবায়ে কেরাম দাঁড়াতেন না। কেননা, তাঁরা জানতেন যে, তিনি তা অপছন্দ করেন। অনেক সময় দেখা গেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে পথ চলাকালে বলতেন, তোমরা আগে আগে চল। এ কথা বলে তিনি নিজে সকলের পিছনে হাঁটতেন। এ দ্বারা সুন্দর চলন-নীতি শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য হতে পারে কিংবা নিজের নফ্সকে শয়তানী ওস্ওসা থেকে হেফাজত করাও হতে পারে।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেছেন, যদি কেউ কোন দোযখী ব্যক্তিকে দেখ্তে চায়, তাহলে সে যেন ঐ ব্যক্তিকে দেখে যে নিজে বসে রয়েছে, অথচ তার সম্মুখে অন্যান্য লোকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে (অর্থাৎ যা দাম্ভিক ও অহংকারী লোকদের অভ্যাস)

অধ্যায় ঃ ৫৭

বিনয় ও অল্পেতুষ্টির বয়ান

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ

অর্থাৎ, "ক্ষমা করলে আল্লাহ্ পাক ক্ষমাকারী বান্দার সম্মান ও ক্ষমতা বাড়িয়ে দেন, আল্লাহ্র জন্যে বিনয় ও নম্র-ভদ্রের আচরণ করলে আল্লাহ্ পাক তাকে উন্নত করেন এবং উচ্চ পদ-মর্যাদা দান করেন।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন যে, সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে অসহায় ও উপায়হীন না হয়েও বিনয় অবলম্বন করে, সঞ্চিত সম্পদ গুনাহের কাজে ব্যয় না করে বৈধ কাজে ব্যয় করে, দরিদ্র ও দুর্বলদের প্রতি দয়া করে এবং জ্ঞানী-প্রজ্ঞাবান আলেম ও ফকীহ্দের সাহচর্য অবলম্বন করে।

বর্ণিত আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে এক গৃহে আহার করছিলেন। এমন সময় একজন পঙ্গু ভিক্ষুক (যে সাধারণতঃ ঘৃণাযোগ্য) এসে দরজায় আওয়াজ দিল। তিনি তাকে গৃহাভ্যন্তরে আসার অনুমতি দিলেন। অতঃপর তাকে আপন উরুতে বসিয়ে খেতে দিলেন। এতে জনৈক কুরাইশী ব্যক্তির মনে ঘৃণার উদ্রেক হলো। এতদ্দৃষ্টে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার রব্ব আমাকে দু'টির যেকোন একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন—তাঁর বান্দা ও রাসূল হবো, অথবা বাদশাহ্ নবী হবো। এতদুভয়ের মধ্যে আমি কোন্টি গ্রহণ করবো, তা স্থির করতে না পেরে আমার একান্ত বন্ধু হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর প্রতি মাথা উচিয়ে তাকালাম। তিনি বললেন, প্রভুর সান্নিধ্যে

আপনি বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করুন। অতঃপর আমি তাই গ্রহণ করে নিয়েছি।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, আমি সে ব্যক্তির নামায কবূল করে থাকি, যে আমার বড়ত্বের সম্মুখে বিনয় অবলম্বন করে, মখ্লূকের মোকাবেলায় নিজকে বড় মনে না করে এবং সর্বদা অন্তরে আমার ভীতি জাগরুক রাখে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْكَرَمُ التَّقْوٰى وَالشَّرَفُ التَّوَاضُعُ وَالْيَقِيْنُ الْغِنٰى

"ইযযত ও সম্মান নিহিত রয়েছে তাক্ওয়া-পরহেযগারীর মধ্যে, মর্যাদা ও কৌলিন্য নিহিত রয়েছে বিনয় ও নম্রতার মধ্যে এবং অমুখাপেক্ষিতা নিহিত রয়েছে একীন তথা দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যে।"

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, দুনিয়াতে যারা বিনয় অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য সুসংবাদ যে, কেয়ামতের দিন তারা উন্নত মঞ্চের অধিকারী হবে, আর যারা মানুষের মধ্যে আত্মার সংশোধনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে তাদের জন্য সুসংবাদ যে, তারা কেয়ামতের দিন জান্নাতুল-ফেরদাউসের অধিকারী হবে।

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, আমার কাছে এ হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে ইসলাম গ্রহণের তওফীক দান করেন, অতঃপর ইসলামই হয় তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, আর সে এমন কোন কাজে জীবন কাটায় যার মধ্যে অবৈধ কিছু নাই ; এরই মাধ্যমে সে জীবিকা পায়, তার মধ্যে যদি বিনয় ও নম্র স্বভাব থাকে, তবে সে আল্লাহ্ তা'আলার নির্বাচিত বিশেষ বান্দা।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اَرْبَعٌ لَا يُعْطِيْهِنَّ اللّٰهُ اِلَّا مَنْ اَحَبَّ الصَّمْتَ وَهُوَ اَوَّلُ

الْعِبَادَةِ وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللّٰهِ وَالتَّوَاضُعُ وَالزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا۔

"চারটি সৎস্বভাব আল্লাহ্ পাক তাকেই দান করেন, যাকে তিনি ভালবাসেন এক. চুপ থাকার অভ্যাস (অর্থাৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা না বলা), দুই. আল্লাহ্র উপর ভরসা করা, তিন. বিনয় অবলম্বন করা, চার. দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হওয়া।"

বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহারে রত ছিলেন। এমন সময় বসন্ত রোগে আক্রান্ত কৃষ্ণ বর্ণের একজন লোক—যার শরীরের চর্ম বিরূপ হয়ে গিয়েছিল, যার কাছেই সে যেতো, তাকে দূর দূর করে সরিয়ে দিতো—রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলো। তিনি তাকে নিজের কাছে বসিয়ে নিলেন।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমার বড় পছন্দ হয় ঐ সব লোকদেরকে যারা হাতে কিছু বহন করে উপার্জন করে, তা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এবং এভাবে আপন স্বভাব থেকে অহংকার দূর করার প্রয়াস চালায়।

একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কি হলো যে, তোমাদের মধ্যে ইবাদতের কোন স্বাদ বা মিষ্টতা লক্ষ্য করি না? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইবাদতের স্বাদ ও মিষ্টতা কি? তিনি বললেন ঃ বিনম্র স্বভাব।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُتَوَاضِعِيْنَ مِنْ أُمَّتِيْ فَتَوَاضَعُوْا لَهُمْ وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْمُتَكَبِّرِيْنَ فَتَكَبَّرُوْا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ ذٰلِكَ مَذَلَّةٌ لَهُمْ وَصَغَارٌ

"আমার উম্মতের মধ্যে যখন তোমরা বিনয়ী লোকদের সাক্ষাৎ পাও, তখন তোমরাও তাদের সাথে বিনয়সুলভ আচরণ কর, আর যখন অহংকারী–

দাম্ভিক লোকদেরকে দেখ, তখন তাদেরকে (বাহ্যতঃ) অহংকার প্রদর্শন কর ; এটা তাদের অপমান ও শাস্তি।"

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী উপদেশদাতা কি চমৎকার উপদেশ দিয়েছেন ঃ বিনয়ী হও, তা'হলে মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন হবে। তারকার প্রতিবিম্ব যদিও দ্রষ্টার দৃষ্টিতে পানির নীচে দেখায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার অবস্থান খুবই উচে।

ধোয়ার ন্যায় হয়ো না, শূন্যমার্গের উঁচুতে তাকে উড়ন্ত দেখায়, কিন্তু তার অবস্থান হয় নীচ ও হীন।

অল্পেতুষ্টির কল্যাণ ও ফযীলত ঃ

ইতিপূর্বে স্বতন্ত্র এক অধ্যায়ে অল্পেতুষ্টির কল্যাণ ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

عِزُّ الْمُؤْمِنِ اِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ

"মুমিনের ইয্যত–সম্ভ্রম এরই মধ্যে নিহিত যে, সে কারও মুখাপেক্ষী হবে না। অল্পে তুষ্ট থাকবে।"

এই অল্পেতুষ্টির মধ্যেই রয়েছে নিজ স্বাধীনতা ও সম্মান। এজন্যেই জনৈক জ্ঞানীর উক্তি রয়েছে যে, তুমি যে কোন (উন্নত) ব্যক্তির মুখাপেক্ষিতা হতে নিজেকে বাঁচাবে, তুমি (অচিরেই) তার সমকক্ষ হয়ে যাবে, আর তুমি যারই সাথে দয়া ও অনুগ্রহের আচরণ করবে, তুমি তার আমীর হয়ে যাবে। যে অল্পের দ্বারা তোমার প্রয়োজন মিটে যায়, তা সেই প্রাচুর্য অপেক্ষা বহুগুণ শ্রেষ্ঠ যে তোমাকে খোদার অবাধ্যতার দিকে ঠেলে দেয়।

এক বুযুর্গ বলেছেন যে, আমার অভিজ্ঞতায় প্রাচুর্যকে আমি অল্পেতুষ্টির তুলনায় শ্রেষ্ঠ পাই নাই। এমনিভাবে দারিদ্র্যকে লালসার তুলনায় কঠিন পাই নাই। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো উচ্চারণ করলেন, যার অর্থ হচ্ছে ঃ

* অল্পেতুষ্টির অভ্যাসই আমাকে ইয্যতের লেবাস পরিয়েছে। এমন কোন প্রাচুর্য আছে কি যা অল্পেতুষ্টির চেয়ে বেশী ইয্যত দিতে পারে?

* ধৈর্য্য ও সবরই হচ্ছে তোমার মূল পূঁজি, এরপর তাকওয়াই হচ্ছে অমূল্য সম্পদ।

* মুহূর্তকাল সবর করে দেখ, বন্ধুর মুখাপেক্ষিতা হতে নিস্কৃতি পাবে। আরও অধিককাল সবর করলে বেহেশ্তে স্থান পেয়ে যাবে।

অপর এক কবি বলেছেন ঃ

* সত্যিকার প্রয়োজন যতটুকু, তোমার আত্মাকে তা দিতে কুণ্ঠিত হয়ো না। অন্যথায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে দাবী করবে।

* তোমার এই দীর্ঘ জীবনটি অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু আসল সময়ের জন্য তুমি কোনই প্রস্তুতি গ্রহণ করলে না।

আরও একজন বলেছেন ঃ

* তোমার রিযিক যদি তোমা থেকে দূরে সরে যায়, তাহলে তুমি সবর কর এবং যতটুকু তোমার আছে, তা নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট থাক।

* কোন কিছু হাসিল করা বা পাওয়ার জন্যে এমনভাবে লেগে যেয়ো না যে, তুমি প্রাণ উৎসর্গ করে দিবে, বরং এ কথা বিশ্বাস রেখ যে, নসীবে (লেখা) থাকলে তা অবশ্যই তুমি পাবে।

অপর একজন বলেন ঃ

* নীচ ও অসভ্য লোকদের অসহযোগিতা যদি তোমাকে তৃষ্ণার্ত করে তোলে, তাহলে অল্পে তুষ্টির চরিত্রকে আপন করে নাও ; এতে তুমি তৃপ্তি লাভ করবে।

* তুমি এমন সাধক পুরুষ হওয়ার চেষ্টা কর যে, তোমার পা যদি থাকে মাটির নীচে, তাহলে তোমার হিম্মত ও সৎসাহসের শিরটি যেন থাকে সর্বোচ্চ নক্ষত্রসম উঁচু অবস্থানে।

আরও একজন উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

* ওহে রিযিকের অন্বেষণকারী! তুমি জীবনের এত শক্তি ব্যয় করে রিযিকের তালাশে ব্যস্ত? হায় আফসূস! তুমি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিলের মধ্যে পড়ে রয়েছ।

* প্রচণ্ড শক্তিধর সিংহ তার প্রবল প্রতিপত্তি সত্ত্বেও পশুর মৃতদেহের

উপরই রাজত্ব করে, আর নগণ্য দুর্বল মৌমাছির রাজত্ব চলে মূল্যবান মৌচাকের উপর।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আমল ছিল– কোন বিপদের সম্মুখীন হলে তিনি ঘরের সকলকে বলতেন, তোমরা উঠ এবং নামাযে রত হয়ে যাও। তিনি আরও বলতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এরূপ হুকুম করেছেন। অতঃপর এ আয়াত তেলাওয়াত করতেন ঃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

"আপনি আপনার সংশ্লিষ্টদেরকে নামাযের আদেশ করতে থাকুন এবং নিজেও এর পাবন্দ থাকুন।" (তোয়াহা ঃ ১৩২)

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানীর উপদেশ হচ্ছে ঃ

* দুনিয়া এবং দুনিয়ার চাকচিক্যের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। প্রাচুর্য ও লালসার ধোকায় পতিত হয়ো না।

* অনন্ত দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য যতটুকু নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তুমি সেটুকুর উপর রাজী হয়ে যাও। বস্তুতঃ অল্পেতুষ্টি এমন এক সম্পদ যা কোনদিন শেষ হয় না।

* দুনিয়ার আরাম-আয়েশের যাবতীয় সাজ-সামানই অহেতুক ; তাই এসব কিছু তুমি ত্যাগ কর। কেয়ামতের ময়দানে এগুলো তোমার কোনই উপকারে আসবে না।

আরও একজনের উপদেশ হচ্ছে ঃ

* যৎকিঞ্চিৎ যতটুকুই তোমার ভাগ্যে জুটে, ততটুকু নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট থাক। কেননা, তোমার-আমার রব্ব একটি ক্ষুদ্র পিপিলিকাকেও ভুলেন না।

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন ঃ

* সুন্দর-শোভন ও আকর্ষণীয় পোষাক পরিধানের মধ্যেই ইয্যত-সম্মান নিহিত নয়। কেননা, সৌন্দর্য ও শোভা বর্ধনের ধ্যান-খেয়ালে যারা মত্ত থাকে, পরিণতিতে তারা দুনিয়ার মোহগ্রস্ত হয়ে দ্বীন-ধর্মের ব্যাপারে বেপরওয়া হয়ে যায় ; এসব লোক আত্মাভিমান থেকে খুব কমই রক্ষা পায়।

আরবী কবি বলেছেন, যার অর্থ হচ্ছে ঃ

* দুনিয়ার অংশ থেকে প্রাপ্য হিসাবে আমি আমার জন্য দারিদ্র্যসুলভ সামান্য খাদ্য এবং একটি চুগাকেই (পোষাক বিশেষ) যথেষ্ট মনে করে নিয়েছি ; অন্তরে এর অতিরিক্ত কোন বাসনাই আমি পোষণ করি না।

* কারণ, আমি দুনিয়াকে উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করেছি। দেখেছি যে, এর কোন স্থায়িত্ব নাই। অতএব, দুনিয়াও যেমন অতি ক্ষণস্থায়ী, আমার জীবনও তাই।

অধ্যায় ঃ ৫৮

দুনিয়ার ধোকা ও প্রতারণার বয়ান

দুনিয়ার সমগ্র অবস্থা মাত্র দু'ভাগে বিভক্ত। হয় আরাম-আয়েশের অবস্থা হবে, না হয় কষ্ট-ক্লেশের অবস্থা হবে। তাই, এ দুনিয়া সমগ্র জগতবাসীর অনুকূল নয়। বরং, সে এক এক সময় এক এক রূপ ধারণ করে ; একচ্ছত্র ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার অধিকারী আল্লাহ্ তা'আলা যখন যেরূপ ইচ্ছা করেন, দুনিয়ার হালাত ও অবস্থায় তেমনি পরিবর্তন আসতে থাকে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَ لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ○ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ؕ

"তারা সর্বদাই মতবিরোধ করতে থাকবে, কিন্তু যার প্রতি আপনার রব্বের অনুগ্রহ হয়।" (হূদ ঃ ১১৯)

কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, রুজি-রোজগারের ব্যাপারে তারতম্য ও বিভিন্নতা হয়। যেমন, কখনও অভাব কখনও সুখ ও প্রাচুর্য। এজন্যেই কর্তব্য হচ্ছে, যদি দুনিয়া অনুকূল থাকে, তাহলে পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও শোকর আদায় করা এবং নেক কাজে মগ্নতার মাধ্যমে সর্বক্ষণ তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করা। কেননা, প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র তিনিই হচ্ছেন সমস্ত দুঃখীর অভাব-অনটন দূরকারী ও আশ্রয়দাতা। সেইসঙ্গে সদা সতর্ক থাকা যে, দুনিয়ার ধোকা ও প্রতারণার শিকার যেন হতে না হয়। পবিত্র কুরআনের এ আয়াতখানি খুবই যথেষ্ট ঃ

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ○

"অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং ঐ প্রতারক (শয়তানও) যেন তোমাদেরকে প্রতারিত করতে না পারে।"

(লুকমান ঃ ৩৩)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ

"কিন্তু (তোমাদের অবস্থা ছিল যে,) তোমরা নিজেদেরকে গোমরাহীতে আবদ্ধ রেখেছিলে, আর তোমরা অপেক্ষা করছিলে এবং তোমরা সন্দীহান ছিলে, বরং তোমাদের অযথা আকাংখাসমূহ তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল।" (হাদীদ ঃ ১৪)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْاَحْمَقُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ الْاَمَانِيَّ

"প্রকৃত বুদ্ধিমান সে, যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেয় ; আমল-আখলাক ও ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হয়ে যায়। আর আহ্মক হচ্ছে সে, যে নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে, অথচ আল্লাহ্র কাছে বহু কিছু পেতে আশাবাদী থাকে।"

জনৈক আরবী কবি বলেছেন ঃ

* দুনিয়ার সামান্যতম সম্পদ ও উল্লাসে যে এর প্রশংসা করে, অচিরেই সে দুনিয়ার প্রতি অভাবের অভিযোগ আনবে ও ভর্ৎসনা করবে।

* দুনিয়া যখন কারও থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন সে আক্ষেপ করতে থাকে, কিন্তু এই দুনিয়াই যখন কারও লাভ হয়, তখন তার দুর্দশা ও ভোগান্তির শেষ থাকে না।

অপর একজন বলেছেন ঃ

* আল্লাহ্র কসম, দুনিয়ার সমগ্র সম্পদও যদি কারও জন্যে চিরস্থায়ীভাবে হাসিল হয় এবং নিরঙ্কুশ স্বচ্ছল জীবন সে অতিবাহিত করে, তবুও কোন অভিজাত ভদ্রের পক্ষে (মোহে পড়ে) দুনিয়ার জন্য নিজকে সামান্যতম লাঞ্ছিত করা উচিত হবে না। অথচ এ দুনিয়া সম্পূর্ণ ক্ষণস্থায়ী ; আগামীকল্যই এর ধ্বংস অনিবার্য।

ইব্‌নে বাস্‌সাম বলেন ঃ

* ধিক দুনিয়ার উপর ও দুনিয়ামুখী জীবনের উপর ; এ দুনিয়া সৃষ্টিই হয়েছে কেবল দুঃখ-দুর্দশা ও ভোগান্তির জন্যেই।

* কি বাদশাহ্ কি সাধারণ লোক কারও থেকে দুনিয়ার অস্বস্তি এক মুহূর্তের জন্যেই খতম হয় না।

* দুনিয়া এবং দুনিয়ার অবস্থার উপর বিস্মিত হই যে, সে নিজে মানুষের শত্রু, অথচ মানুষ তার প্রেমিক-পাগল।

অপর এক কবি বলেন ঃ

* দুনিয়াকে জিজ্ঞাসা কর—রোম-ইরানের সম্রাট (কায়সার ও কিস্‌রা), তাদের বিরাট বিশাল অট্টালিকা এবং এগুলো উপভোগকারীদের সাথে সে কি আচরণ করেছে? সেকি তাদেরকে বিক্ষিপ্ত ও পৃথক পৃথক করে দেয় নাই? বস্তুতঃ সে বোকা বুদ্ধিমান নির্বিশেষে সকলকেই ধ্বংস করে ছেড়েছে।

কথিত আছে, জনৈক মরুচারী বেদুঈন লোক একটি গোত্রের নিকট অবতরণ করে। গোত্রের লোকজন তাকে খাওয়া-দাওয়া করিয়েছে। অতঃপর লোকটি একটি তাঁবুর ছায়াতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। লোকেরা যখন তাঁবু সরিয়ে নিলো, তখন রৌদ্রের তাপে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সজাগ হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করার সময় সে বলেছে ঃ

* এতে কোন সন্দেহ নাই যে, দুনিয়া একটি গৃহের ছায়ার মত ; একদিন এ ছায়া অবশ্যই খতম হয়ে যাবে।

* সতর্ক হয়ে যাও, দুনিয়া অতি অল্প সময়ের আরামস্থল ; যেখানে পথিক মুসাফির কিছুক্ষণ অবস্থান করে, অতঃপর তা ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

জনৈক জ্ঞানবৃদ্ধ নিজ সঙ্গীকে বলেছিলেন, দ্বীনের আহ্‌বাহক দ্বীনের প্রতি তোমাকে ডাক দিয়েছে, দুনিয়া তোমার ডাকে সাড়া দিতে অপারগতা ঘোষণা করে দিয়েছে ; বড়ই অপরাধী হবে তুমি ; এরপরেও যদি ঈমান ও একীনকে বরবাদ করে ফেল এবং নেক আমল না কর।

হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য

ইল্‌মই যথেষ্ট এবং প্রতারিত হয়ে খোদা-বিমুখ হওয়ার জন্য মুর্খতাই যথেষ্ট।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ الدُّنْيَا وَ سُرَّبِهَا ذَهَبَ خَوْفُ الْاٰخِرَةِ مِنْ قَلْبِهٖ

"যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে এবং দুনিয়ার দ্বারা আনন্দিত হয়, তার অন্তর থেকে আখেরাতের ভয় দূর হয়ে যায়।"

এক বুযুর্গ বলেছেন, দুনিয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে যে যতটুকু দুঃখ ও আক্ষেপ করবে, আখেরাতে সেই অনুপাতে তার হিসাব হবে। এমনিভাবে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার সম্পদের উপর আনন্দ-উল্লাস করবে, আখেরাতে সেই অনুপাতেই তার হিসাব হবে। আজকাল স্পষ্ট হারাম বিষয় সম্পর্কেও তোমরা নির্দ্বিধায় বলে থাক, এগুলো ব্যবহারে কোন দোষ নাই; অথচ আদর্শ পূর্বপুরুষেরা হালাল বিষয়াবলীর ব্যাপারেও কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতেন, আর হারাম বস্তু তো তাদের দৃষ্টিতে হলাহল-বিষতুল্য ছিল।

হযরত উমর ইব্‌নে আব্দুল আযীয (রহঃ) অনেক সময় মিসআর ইব্‌নে কেরামের নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করতেন ঃ

نَهَارُكَ يَا مَغْرُوْرُ نَوْمٌ وَ غَفْلَةٌ
وَ لَيْلُكَ نَوْمٌ وَ الرَّدٰى لَكَ لَازِمٌ

ওহে ধোকা ও প্রতারণার শিকার! তোমার জীবনের দিনগুলোও নিদ্রা ও অবহেলায় কাটিয়ে দিচ্ছ, আর রাতের নিদ্রা তো স্বভাবতঃ রয়েছেই।এ-ই যদি হয় অবস্থা, তবে জেনে রাখ, তোমার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

يَغُرُّكَ مَا يَفْنٰى وَ تَفْرَحُ بِالْمُنٰى
كَمَا غَرَّ بِاللَّذَّاتِ فِى النَّوْمِ حَالِمٌ

ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষয়িষ্ণু এই দুনিয়া তোমাকে ধোকায় ফেলে রেখেছে, কামনা-বাসনা ও কল্পনায় তুমি আনন্দে মেতে রয়েছে। তোমার এ আনন্দ-উল্লাস নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির স্বপ্নের আনন্দের চেয়ে অধিক কিছু নয়।

شُغْلُكَ فِيهَا سَوْفَ يَكْرَهُ غِبَّهُ
كَذٰلِكَ فِي الدُّنْيَا تَعِيشُ الْبَهَائِمُ

খোদাবিমুখী উল্লাসময় এই মত্ততা অচিরেই তোমাকে ত্যাগ করতে হবে, তখন তোমার জন্য তা খুবই অসহনীয় হবে। বস্তুতঃ দুনিয়াতে চতুষ্পদ জন্তুরাই এরূপ জীবনাতিবাহন করে থাকে।

অধ্যায় ঃ ৫৯

দুনিয়ার তুচ্ছতা ও অপকারিতা এবং দুনিয়া থেকে সতর্কীকরণ

হযরত আবূ উমামাহ বাহেলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সা'লাবাহ্ ইব্‌নে হাতেব হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দোআ করে দিন, যাতে আমি মালদার–ধনী হয়ে যাই। তিনি বললেন, তাহলে কি তোমার কাছে আমার তরীকা পছন্দ নয়? তুমি কি আল্লাহ্‌র নবীর আদর্শের উপর থাকতে আগ্রহী নও? শুন! সেই পবিত্র সত্তার কসম, যার আয়ত্ত্বাধীনে আমার জীবন—যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তাহলে এ পাহাড়সমূহ সোনা–রূপায় পরিণত হয়ে আমার সাথে সাথে ঘুরতো। কিন্তু এমন ধনী হওয়া পছন্দনীয় নয়। লোকটি বললো, যে পবিত্র সত্তা আপনাকে সত্য নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, যদি আপনি দোআ করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ধন–ঐশ্বর্য দান করেন, তবে আমি অবশ্যই প্রত্যেক হকদারকে তার হক ও প্রাপ্য পৌঁছিয়ে দিবো এবং আরও অন্যান্য নেক কাজ করবো। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোআ করলেন ঃ "আয় আল্লাহ্! সা'লাবাহ্‌কে সম্পদ দান কর।" ফলে, তার ছাগল–ভেড়ায় কীড়ার মত অসাধারণ প্রবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এমনকি মদীনায় বসবাসের জায়গাটি যখন তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন সে মদীনার বাইরে একটি প্রশস্ত উপত্যকা নিয়ে নেয়। এখানে আসার পর কেবল যোহর ও আসর এই দুই ওয়াক্তের নামায মদীনায় এসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জামাতে আদায় করতো এবং (পূর্বের বিপরীত) অন্যান্য নামায সেখানেই পড়ে নিতো, যেখানে তার মালামাল ছিল।

অতঃপর এসব ছাগল–ভেড়ার আরও প্রবৃদ্ধি ঘটে, যার ফলে সে জায়গাটিতেও তার সংকুলান হয় না। সুতরাং মদীনা শহর থেকে আরও

দূরে গিয়ে কোন একটি জায়গা নিয়ে নেয়। সেখান থেকে সে শুধু জুমুআর নামাযের জন্য মদীনায় আসতো এবং অন্যান্য পাঞ্জেগানা নামাযগুলো সেখানেই পড়ে নিতো। তারপর এসব মালামাল কীড়ার মত আরও প্রবৃদ্ধি পেয়ে গেল। এখন সে জায়গাও তাকে ছাড়তে হয় এবং মদীনা থেকে বহু দূরে সরে যায়। সেখানে জুমুআ থেকেও তাকে বঞ্চিত হতে হয়। জুমুআর দিন মদীনা থেকে জুমুআ পড়ে প্রত্যাবর্তনকারীদের নিকট কেবল জিজ্ঞাসাবাদ করে সেখানকার অবস্থা জেনে নিতো।

কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের কাছে সে লোকটির অবস্থা জানতে চাইলে তারা বললো যে, তার মালামাল এতো বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে, শহরের কাছাকাছি কোথাও তার সংকুলান হয় না। ফলে, বহু দূরে কোথাও গিয়ে বসবাস করছে। এখন আর তাকে দেখা যায় না। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বললেন,— يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ অর্থাৎ, সালাবাহ্র প্রতি আফসূস! সা'লাবাহ্র প্রতি আফসূস! সা'লাবাহ্র প্রতি আফসূস। ঘটনাক্রমে সে সময়েই মুসলমানদের থেকে সদকা আদায় করা সংক্রান্ত এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ط

"আপনি তাদের ধন–সম্পদ থেকে সদ্কা গ্রহণ করুন, যদ্দ্বারা আপনি তাদেরকে পাক–পবিত্র করে দেন এবং তাদের জন্য দোআ করুন ; নিশ্চয় আপনার দোআ তাদের জন্য শান্তির কারণ।" (তওবাহ ঃ ১০৩)

আল্লাহ্ তা'আলা সদ্কার যথাযথ আইন নাযিল করলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুহাইনা গোত্রের একজন এবং সুলাইম গোত্রের একজনকে মুসলমানদের নিকট থেকে সদ্কা আদায় করার জন্য পাঠালেন এবং দু'জনের নিকটেই সদ্কার লিখিত ফরমান দিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলে দিলেন ঃ তোমরা সা'লাবাহ্র নিকট যাও। এছাড়া বনী সুলাইমের আরও এক লোকের কাছে

যাওয়ার হুকুম করলেন, তাদের কাছ থেকে সদ্‌কা ওসূল করার নির্দেশ দিলেন।

তারা উভয়ে যখন সা'লাবাহ্‌র নিকট গিয়ে পৌঁছালেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখিত ফরমান দেখালেন, তখন সা'লাবাহ্ বলতে লাগলো, এ তো জিযিয়া কর হয়ে গেল, এ তো জিযিয়া কর হয়ে গেল, এ তো জিযিয়ার ন্যায়ই আরেকটা। তারপর বললো, এখন আপনারা যান, ফেরার পথে এখানে হয়ে যাবেন। অতঃপর তারা সুলাইম গোত্রের লোকটির নিকট গেলেন। লোকটি তাদের কথা এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান শুনলো। তারপর নিজের পালিত পশু উট-বকরীসমূহের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল, তা থেকে সদ্‌কার নেসাব অনুযায়ী পশু নিয়ে স্বয়ং সে দুই ওসূলকারীর কাছে হাজির হলেন। তারা পশুগুলো দেখে বললেন, আপনার উপর এরূপ উৎকৃষ্ট পশু সদ্‌কায় দান করা ওয়াজিব নয় এবং আমরাও আপনার কাছ থেকে এগুলো নিতে পারি না। সুলাইমী লোকটি বারবার বিনয় করে বললেন, আমি নিজের খুশীতে এগুলো দিতে চাই, আপনারা কবূল করে নিন।

অতঃপর এ দুই ওসূলকারী আরও অন্যান্য মুসলমানদের সদ্‌কা আদায় করে সা'লাবাহ্‌র কাছে আসলেন এবং তার কাছে পুনরায় সদ্‌কা আদায়ের কথা বললেন তখন সে বললো, দাও দেখি সদ্‌কার আইনগুলো আমাকে দেখাও। তা দেখে সে পূর্বের কথাই বলতে লাগলো, এ তো এক রকম জিযিয়া কর-ই। যা হোক, এখন আপনারা যান, আমি চিন্তা-বিবেচনা করবো।

তারা মদীনায় ফিরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। তিনি তাদেরকে দেখেই তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই আবার সে বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করলেন, যা পূর্বে বলেছিলেন। অর্থাৎ— يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ (সা'লাবাহ্‌র প্রতি আফ্‌সূস) তারপর সুলাইমীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে দোআ করলেন। অতঃপর তাঁরা দু'জন সা'লাবাহ্ ও সুলাইমী সম্পর্কিত আচার-আচরণ বিস্তারিত শুনালেন। তখন সা'লাবাহ্ সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتَانَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَا اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে কোন কোন লোক এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা করেছিল যে, আল্লাহ্ যদি তাদের ধন-সম্পদ দান করেন, তবে তারা দান-খয়রাত করবে এবং উম্মতের সৎকর্মশীলদের (মত সমস্ত হকদার, আত্মীয়-স্বজন ও গরীব-মিসকীনদের প্রাপ্য আদায় করে তাদের) অন্তর্ভুক্ত হবে। অতঃপর যখন আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদ দান করলেন তখন কার্পণ্য করতে লাগলো এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যে বিমুখ হয়ে গেল। তারপর এরই পরিণতিতে তাদের অন্তরে মুনাফেকী স্থান করে নিয়েছে, সেদিন পর্যন্ত যেদিন তারা তাঁর সাথে গিয়ে মিলবে। তা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা লংঘন করেছিল এবং এ জন্যে যে, তারা মিথ্যা কথা বলতো।

(সূরা তওবাহ্, আয়াত ঃ ৭৫,৭৬,৭৭)

এ আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন সা'লাবার কতিপয় আত্মীয় আপনজনও সে মজলিসে উপস্থিত ছিল। তাদের মধ্য হতে একজন সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হয়ে সা'লাবার কাছে গিয়ে পৌঁছলো এবং তাকে ভর্ৎসনা করে বললো, তোমার সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়ে গেছে। এ কথা শুনে সালাবাহ্ উদ্বিগ্ন হয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ হাজির হয়ে আবেদন করলো, হুযূর ! আমার সদ্‌কা কবূল করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তোমার সদ্‌কা কবূল করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। এ কথা শুনে সে নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগলো।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তো তোমার নিজেরই কৃতকর্ম। আমি তোমাকে হুকুম করেছিলাম ; তুমি তা মান্য কর নাই। এখন আর তোমার সদ্‌কা কবূল হতে পারে না। তখন সালাবাহ্ অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেল এবং এর কিছুদিন পরই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে যায়। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) খলীফা হলে সা'লাবাহ্ তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে সদ্‌কা কবূল করার আবেদন জানালো। সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ) উত্তর দিলেন, যে ক্ষেত্রে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবূল করেন নাই, আমি কেমন করে কবূল করবো!

হযরত আবূ বকর (রাযিঃ)–এর ওফাতের পর সা'লাবাহ্ হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ)–এর খেদমতে হাজির হয়ে আবেদন জানালো। তিনিও সেই একই উত্তর দিলেন, যা হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) দিয়েছিলেন। এরপর হযরত উসমান (রাযিঃ)–এর খেলাফত আমলেও সে নিবেদন করে। কিন্তু তিনিও অস্বীকার করেন। হযরত উসমান (রাযিঃ)–এর খেলাফতকালেই সা'লাবাহ্‌র মৃত্যু হয়।

ইমাম জরীর (রহঃ) লাইস থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা এক ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ)–এর সঙ্গ অবলম্বন করে তার সাথে সাথে পথ চলতে লাগলো। সে আরজ করলো, আমি আপনার সাহচর্যেই থাকবো। দু'জন পথ চলতে চলতে সমুদ্রের তীরে পৌঁছে খানা খেতে আরম্ভ করলেন। তাদের নিকট তিনটি রুটি ছিল। দুটি খেলেন আর একটি অবশিষ্ট রয়ে গেল। হযরত ঈসা (আঃ) পানি পান করার জন্য সমুদ্রের কিনারে গেলেন। কিন্তু এসে দেখেন যে, অবশিষ্ট রুটিটি নাই। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, রুটিটি কে নিলো? সে উত্তর করলো, আমি জানি না। হযরত ঈসা (আঃ) সাথীকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলেন একটি হরিণী তার দু'টি বাচ্চা নিয়ে বিচরণ করছে। তিনি একটি বাচ্চাকে ডাকলেন। তৎক্ষণাৎ সে এসে উপস্থিত হলো। সেটিকে জবাই করে ভাজা করে তা থেকে তারা উভয়ে খেলেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) বললেন ঃ

قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ "আল্লাহ্‌র হুকুমে যিন্দা হয়ে যাও।" তৎক্ষণাৎ বাচ্চাটি উঠে দৌড়ে চলে গেল। হযরত ঈসা (আঃ) লোকটিকে বললেন, আমি

তোমাকে ঐ পবিত্র সত্তার কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, যার কুদরতে তোমাকে এ মু'জেযা দেখিয়েছি, তুমি বল—রুটিটি কে নিয়েছে? সে বললো, আমি জানি না।

অতঃপর তারা আরও অগ্রসর হয়ে একটি নদীর তীরে পৌঁছলেন। হযরত ঈসা (আঃ) লোকটির একটি হাত আকড়িয়ে ধরে নিলেন এবং নির্দ্বিধায় পানির উপর দিয়ে নদী পার হয়ে গেলেন। এবারও তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে পবিত্র সত্তার কুদরতে আমি তোমাকে এ মুজেযা দেখালাম তার কসম দিয়ে বলছি, তুমি সত্য করে বল—সে রুটিটি কে নিয়েছে। লোকটি বললো, আমি জানি না।

অতঃপর তারা আরও অগ্রসর হলেন এবং একটি জঙ্গলে পৌঁছে বসে পড়লেন। হযরত ঈসা (আঃ) একটি মাটির ঢেলা হাতে নিয়ে বললেন, সোনা হয়ে যাও। তৎক্ষণাৎ সেটা সোনা হয়ে গেল। এটাকে হযরত ঈসা (আঃ) তিন ভাগে ভাগ করলেন এবং বললেন, এক ভাগ আমার, এক ভাগ তোমার এবং অবশিষ্ট ভাগটি যে রুটি নিয়েছে তার। এ কথা শুনে লোকটি বললো, (হুযূর!) রুটি আমি নিয়েছি। হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, এসব স্বর্ণই তোমাকে দিয়ে দিলাম। অতঃপর তিনি লোকটির নিকট থেকে পৃথক হয়ে গেলেন।

লোকটি জঙ্গল থেকে এখনও বের হয় নাই ; এমন সময় দুজন দস্যু এসে হাজির হলো এবং তার কাছে মূল্যবান সম্পদ পেয়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। তখন লোকটি বললো, আমাকে হত্যা করো না, এই স্বর্ণ আমরা তিনজনেই সমানভাবে ভাগ করে নিলাম ; আমাদের মধ্য হতে একজনকে বাজারে পাঠাও, খাদ্য খরিদ করে আনবে, আমরা এখন সকলেই খাবো। তারা একজনকে খাদ্যের জন্য বাজারে পাঠালো। বাজারে প্রেরিত লোকটি মনে মনে চিন্তা করলো—আমি এই স্বর্ণ ভাগাভাগি হতে দেই কেন? খাদ্যের মধ্যে তাদের অজান্তে বিষ মিশিয়ে দেই ; এতে তারা দু'জন খানা খেয়েই বিষক্রিয়ায় মারা যাবে আর সম্পূর্ণ স্বর্ণ একা আমিই নিয়ে নিবো। এই চিন্তা করে সে খাদ্যের সাথে বিষ মিশিয়ে তা নিয়ে উপস্থিত হলো। ওদিকে যে দু'জন জঙ্গলে রয়ে গিয়েছিল, তারা চিন্তা করলো—আমরা সেই লোককে স্বর্ণের এক তৃতীয়াংশ কেন দেই ; বরং সে এলেই তাকে আমরা

হত্যা করবো এবং আমরা দু'জনেই স্বর্ণ ভাগ করে নিয়ে নিবো। ঘটনার বর্ণনাকারী বলেন, যেই চিন্তা সেই কাজ—লোকটি বাজার থেকে আসলে তাকে তারা হত্যা করে ফেললো এবং খাদ্য খেয়ে নিলো। ফলে, খাদ্যের সাথে মিশ্রিত বিষক্রিয়ায় এরা দুজনও মারা গেল। এখন শুধু স্বর্ণ এবং পার্শ্বে তিনটি লাশ খালি জঙ্গলে পড়ে রইল। হযরত ঈসা (আঃ) ফেরার পথে এদিক দিয়ে আসছিলেন, তখন তিনি তার সঙ্গীদেরকে বললেন—এরই নাম দুনিয়া ; সতর্ক থেকো, সাবধানে চলো।

একদা বাদশাহ্ যুল-কারনাইন এক সম্প্রদায়ের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে থামলেন। তাদের অবস্থা ছিল—মানুষের জন্য উপাদেয় উপকরণ বলতে যা আছে, তা কিছুই তাদের কাছে ছিল না। এরা প্রচুর পরিমাণে কবর খুঁড়ে রেখেছিল। ভোর হতেই কবরের পার্শ্বে গিয়ে উপস্থিত হতো। সেগুলোর দেখা-শুনা করতো। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতো। নামায পড়তো। চতুষ্পদ জন্তুর মত সবুজ-তাজা ঘাস ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করতো। এসব তরুলতার উপরই তারা সম্পূর্ণ জীবিকা নির্বাহ করতো।

বাদশাহ্ যুল-কারনাইন তাদের শাসন পরিচালকের নিকট লোক পাঠিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য সংবাদ দিলেন। কিন্তু সে জওয়াব দিল, তাঁকে আমার কোন প্রয়োজন নাই, বরং তার যদি আমার নিকট কোন প্রয়োজন থাকে, তবে তিনিই আমার কাছে আসুন। যুল-কারনাইন এ উত্তর পেয়ে বললেন, সে ঠিকই বলেছে। অতঃপর তিনি নিজেই শাসনকর্তার নিকট গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আমি আপনাকে সংবাদ দেওয়ার পর আপনি উপস্থিত না হওয়াতে আমি নিজেই হাজির হলাম। সে বললো, আমার কোন প্রয়োজন থাকলে অবশ্যই আমি হাজির হতাম। যুল-কারনাইন জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার আপনাদেরকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় ব্যতিক্রমী দেখি? শাসনকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার এ কথার অর্থ কি? তিনি বললেন, অর্থাৎ দুনিয়ার সাথে কিছুমাত্র সম্পর্কও আপনাদের দেখছি না, আপনারা সোনা-রূপা প্রভৃতি কিছুই জমা করেন নাই, যদ্দ্বারা উপকৃত হবেন? শাসনকর্তা বলতে লাগলেন, আমরা এসবকে ঘৃণা করি। কারণ, দেখা গেছে, যাদের হাতেই সম্পদ হয়েছে, তারাই দুনিয়া এবং দুনিয়ার সম্পদের মোহে মত্ত হয়ে গেছে। ফলে, এতোদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ থেকে

তারা বঞ্চিত রয়ে গেছে। যুল-কারনাইন জিজ্ঞাসা করলেন, এর কি কারণ যে, আপনারা কবর খুঁড়ে রেখেছেন, ভোর-সকালে এসে সেগুলোর দেখা-শুনা করেন, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন? শাসনকর্তা বললেন, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন আমরা এসব কবর এবং আমাদের পার্থিব আশা-আকাংখার প্রতি দৃষ্টি করবো তখন এসব কবর আমাদেরকে দুনিয়ার আশা-আকাংখা ও লোভ-লালসা থেকে বিরত রাখবে।

যুল-কারনাইন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা তরুলতা খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন ; এছাড়া আহারের যোগ্য আরকিছু আপনাদের নিকট দেখি না, আপনারা কি চতুষ্পদ জন্তু পালন করে সেগুলোর দুধ পান করে জীবন কাটাতে পারেন না? তাছাড়া এসব জন্তুকে আপনারা সওয়ারীর কাজেও ব্যবহার করতে পারেন। শাসনকর্তা বললেন, আমরা আমাদের উদরকে জীব-জানোয়ারের কবর বানাতে পছন্দ করি না। আমাদের অভিজ্ঞতা যে, যমীনের উদ্ভিদ আহার করেই আমরা তৃপ্ত হয়ে যাই। বস্তুতঃ আদম-সন্তানের জন্য অতি সাধারণ ও মামুলী খাদ্যই যথেষ্ট ; গলধঃকরণের পর যে কোন ধরনের খাদ্যের স্বাদ আর বাকী থাকে না। এ কথা বলার পর শাসনকর্তা যুল-কারনাইনের পশ্চাৎ থেকে হাত বাড়িয়ে একটি মৃতদেহের ধ্বংসাবশেষ মাথার খুলি উঠিয়ে তাকে বললেন, আপনি কি জানেন—এ লোকটি কে? তিনি অজ্ঞতা ব্যক্ত করে লোকটির পরিচয় জানতে চাইলে শাসনকর্তা বললেন, সে এ পৃথিবীর একজন বাদশাহ। বহু ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল সে। কিন্তু জুলুম-অত্যাচর, অন্যায়-অনাচার, খেয়ানত ও অবাধ্যতার সীমা অতিক্রম করার পর সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আজকে তার ধ্বংসাবশেষের অবস্থা এই। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা তার সমস্ত কৃতকর্ম লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন ; পরকালের সেই বিচার দিনে তার শাস্তি হবে। অতঃপর আরেকটি মাথার খুলি উঠিয়ে শাসনকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি জানেন ইনি কে? যুল-কারনাইন অজ্ঞতা প্রকাশ করে পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, ইনিও একজন বাদ্শাহ, পূর্বের জালেম বাদশাহর পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অধিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু তিনি পূর্বের বাদশাহর বিপরীত জুলুম-অত্যাচার ও অন্যায়-অনাচার থেকে দূরে রয়েছেন। রাজ্যে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহর সম্মুখে বিনয় ও নিষ্ঠা অবলম্বন করেছেন।

পরিশেষে তিনিও দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং আজকে তারও অস্তিত্বের অবস্থা এই, যা আপনি অবলোকন করছেন। কিন্তু তাঁর আমলনামাও আল্লাহর নিকট লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত রয়েছে। আখেরাতে তিনি আল্লাহর কাছে পুরস্কারপ্রাপ্ত হবেন।

অতঃপর বাদশাহ-যুল-কারনাইনের মাথার খুলির দিকে দৃষ্টি করে শাসনকর্তা বললেন, আপনার এ খুলির অবস্থাও উক্ত খুলিদ্বয়ের যে কোন একটির ন্যায় হবে। আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন—কোন্ অবস্থার অনুকূলে আপনি জীবন পরিচালনা করে যাচ্ছেন। যুল-কারনাইন বললেন, হে শাসনকর্তা! আপনি কি আমার সাথীত্ব গ্রহণ করতে সম্মত আছেন? আপনাকে ভাই হিসাবে গ্রহণ করে নিবো। আপনি আমার ওজীর ও পরামর্শদাতা হবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে যা কিছু দিয়েছেন, তাতে আপনাকে শরীক করে নিচ্ছি। তিনি বললেন, আপনার এবং আমার একই অবস্থানে একত্রিত হওয়া ঠিক নয়, বরং এহেন সহঅবস্থান অবলম্বন করা আমাদের উভয়ের মধ্যে কারও পক্ষে সম্ভব হবে না। যুল-কারনাইন কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, এর কারণ হচ্ছে, মানুষ আপনার শত্রু এবং আমার বন্ধু। যুল-কারনাইন বললেন, এর কারণ? তিনি বললেন, আপনার ধন-ঐশ্বর্যের কারণে তারা আপনার শত্রুতে পরিণত হয়েছে। আর আমি এসব কিছু পরিত্যাগ করেছি, কাজেই আমার শত্রু কেউ নাই। যুল-কারনাইন এতদশ্রবণে অবাক-বিস্ময়ে অভিভূত হোন এবং অন্তরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়ে আপন গন্তব্যের পথে বিদায় নেন।

জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন ঃ

يَا مَنْ تَمَتَّعَ بِالدُّنْيَا وَزِينَتِهَا
وَلَا تَنَامُ عَنِ اللَّذَّاتِ عَيْنَاهُ

ওহে, যে দুনিয়ার চাকচিক্য ও ভোগ-বিলাসে মত্ত রয়েছ, এমনকি এই ভোগমত্ততার কারণে রাতের নিদ্রা পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়েছ—

شَغَلْتَ نَفْسَكَ فِيمَا لَيْسَ تُدْرِكُهُ

تَقُوْلُ لِلّٰهِ مَاذَا حِيْنَ تَلْقَاهُ

প্রবৃত্তির তাড়নায় তুমি এমন এক বস্তুর পিছনে পড়ে রয়েছ যা কোনদিন পাবে না। উপরন্তু যেদিন তুমি আল্লাহর সম্মুখীন হবে, সেদিন আল্লাহর কাছে তোমার কি জবাবদিহি হবে?

মাহমুদ বাহেলী (রহঃ) আবৃত্তি করেছেন ঃ

اَلَا اِنَّمَا الدُّنْيَا عَلَى الْمَرْءِ فِتْنَةٌ
عَلٰى كُلِّ حَالٍ اَقْبَلَتْ اَوْ تَوَلَّتْ

"জেনে রাখ, এ দুনিয়া হাসিল হোক আর না হোক সর্বাবস্থায়ই সে মানুষের জন্য ফেতনা ও পরীক্ষা।"

فَاِنْ اَقْبَلَتْ فَاسْتَقْبِلِ الشُّكْرَ دَائِمًا
وَمَهْمَا تَوَلَّتْ فَاصْطَبِرْ وَتَثَبَّتْ

"কাজেই দুনিয়া যদি তোমার অনুকূলে আসে, তাহলে তুমি সর্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যদি প্রতিকূল হয়, তবে ধৈর্য ধারণ কর এবং দৃঢ় থাক।"

অধ্যায় ঃ ৬০

দান-খয়রাত ও সদ্‌কার ফযীলত

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, "যে ব্যক্তি একটি ক্ষুদ্র খেজুর পরিমাণও হালাল উপার্জন থেকে আল্লাহ্‌র পথে দান করে—জেনে রাখ, আল্লাহ্ কেবল হালাল বস্তুই কবুল করেন–আল্লাহ্ তা'আলা সেই দানকৃত বস্তু ডান হাতে গ্রহণ করে নেন ; এতে বরকত ও কল্যাণ দিয়ে ভরে দেন, অতঃপর এটিকে দাতার অনুকূলে লালন করতে থাকেন যেমন তোমরা শিশুকে লালন কর। এভাবে সেই বস্তুটি পাহাড়সম বৃহৎ রূপ ধারণ করে। পবিত্র কুরআনে এর সপক্ষে সাক্ষ্য রয়েছে, ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ

"তারা কি অবগত নয় যে, আল্লাহ্‌ই নিজ বান্দাদের তওবা কবূল করেন, আর তিনিই সদ্‌কা-খয়রাত কবূল করেন।" (তওবাহ্ ঃ ১০৪)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

"আল্লাহ্ সূদকে ধ্বংস করে দেন এবং সদ্‌কাকে বৃদ্ধি করে দেন।" (বাকারাহ্ ঃ ২৭৬)

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ۔

"দানে কখনও ধন কমে না। ক্ষমায় ক্ষমতা ও ইয্যত–সম্মান বাড়ে। আল্লাহ্র জন্যে বিনয় অবলম্বন ও নম্র স্বভাব উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে।"

ত্বব্রানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "দান–খয়রাত মাল–সম্পদে কোনরূপ ঘাট্তি আনয়ন করে না। বান্দা দান–খয়রাতের জন্য হাত বাড়ানোর সাথে সাথে প্রদত্ত বস্তু গ্রহীতার হাতে পৌছার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করে নেন।"

আরও বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি এমন কোন বস্তুর জন্য যা না হলেও তার চলে, যদি কারও কাছে হাত পাতলো, তবে আল্লাহ্ তার অভাবের দরজা খুলে দেন, অর্থাৎ তার অভাব–অনটন লেগেই থাকবে।"

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِيْ مَالِيْ وَاِنَّمَا لَهٗ مِنْ مَالِهٖ ثَلٰثٌ مَا اَكَلَ فَاَفْنٰى اَوْ لَبِسَ فَاَبْلٰى اَوْ اَعْطٰى فَاَقْتَنٰى وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهٗ لِلنَّاسِ -

"বান্দা বলে, আমার মাল আমার মাল। অথচ সম্পদের যে অংশটুকু সে তিন কাজে ব্যয় করতে পেরেছে, কেবল সে অংশটুকুই তার ঃ এক. যা খেয়ে শেষ করলো দুই. যা পরিধান করে পুরানো–অকেজো করলো এবং তিন. যা আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে জমা রাখলো। এ ছাড়া আর যা থাকবে, তা তার নয় ; অন্যদের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তি।"

বর্ণিত আছে, তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি কথা বলবেন, অর্থাৎ মাঝে কোন দু'ভাষী হবে না। সে ডানে তাকাবে, দেখবে শুধু যা পাঠিয়েছে তা। বামে তাকাবে, দেখবে শুধু যা পাঠিয়েছে তা। সামনে তাকাবে, দেখবে শুধু আগুনই আগুন ; যা তার চেহারা বরাবর বিরাজ করছে। অতএব, তোমরা আগুন থেকে বাঁচ ; খেজুরের একটি ক্ষুদ্রাংশ দিয়ে হলেও।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ـ

"পানি যেমন আগুন নিভিয়ে দেয়, দান-খয়রাত ও সদ্কা তেমনি পাপ মোচন করে দেয়।"

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'ব ইব্নে আজ্রাহ্ (রাযিঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ اَلنَّارُ اَوْلَى بِهِ الخ

"হারাম খাদ্যের দ্বারা উৎসারিত রক্ত-মাংস বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না ; বরং দোযখেরই যোগ্য। হে কা'ব ইব্নে আজ্রাহ্! সকল মানুষই দুনিয়া থেকে বিদায় হয় ; কিন্তু কেউ বিদায় হয় দোযখের আগুন থেকে নিজকে মুক্ত করে আর কেউ নিজের জীবন ধ্বংস করে দোযখের উপযুক্ত হয়ে। হে কা'ব! নামাযে আল্লাহ্র নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ হয় আর রোযা হচ্ছে (দোযখের আগুন থেকে আত্মরক্ষার জন্য) ঢালস্বরূপ। সদ্কা ও দান-খয়রাত গুনাহ্সমূহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমন সবল লোক ভারী পাথরকে সরিয়ে দেয়। অন্য রেওয়ায়াতে আছে যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।"

বর্ণিত আছে, "সদ্কা ও দান-খয়রাত খোদায়ী গজবকে ফিরিয়ে রাখে, অপমৃত্যু থেকে হেফাযত করে।"

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সদ্কার ওসীলায় অপমৃত্যুর সত্তরটি দরজা বন্ধ করে দেন।

হাদীস শরীফে আরও আছে, "কেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত দাতা ব্যক্তিগণ নিজ নিজ সদ্কার ছায়ায় অবস্থান করবে।"

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, "কখনও এমন হয় যে, মানুষ কিছু সদ্কা করে, ফলতঃ শয়তানের সত্তরটি জাল ভেঙ্গে যায়।"

একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সর্বোত্তম সদ্কা কোন্‌টি? তিনি বললেন, "অভাবী হয়েও দান করা ; তোমার দান তাদের থেকেই আরম্ভ কর যাদের ব্যয়ভার

বহন করা তোমার দায়িত্ব।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, এক দেরহাম পরিমাণ দানের সওয়াব একশত দেরহামের সওয়াবকেও অতিক্রম করে গেছে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা কি করে? তিনি বললেন, "এক ব্যক্তির নিকট প্রচুর পরিমাণ মাল-সম্পদ আছে, সে এক পার্শ্ব থেকে একশত দেরহাম দান করলো। অপরদিকে একজন অভাবী লোকের নিকট মাত্র দুই দেরহাম আছে, তন্মধ্য থেকে সে একটি দেরহাম দান করে দিল।"

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ ভিক্ষুক বা প্রার্থী (আব্‌দারকারী)-কে কখনও ফিরিয়ে দিও না। কিছু দিতে না পার—অন্ততঃপক্ষে একটি ক্ষুর হলেও তাকে দাও।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ "সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ তা'আলা এমন দিনে (অর্থাৎ হাশরের দিন) আরশের নীচে ছায়াতলে স্থান দিবেন, যেদিন এ ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক তারা, যারা এমন গোপনে দান-খয়রাত করে যে, বাম হাত পর্যন্ত টের করতে পারে না যে, তাদের ডান হাত কি করছে।"

ত্ববরানী শরীফের এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, "সৎকাজে মানুষকে বিপর্যয় ও প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা করে, গোপন সদ্‌কা আল্লাহ্‌র রোষ নির্বাপিত করে এবং আত্মীয়তার সংরক্ষণ আয়ু বর্ধিত করে। বস্তুতঃ প্রতিটি নেক কাজই সদ্‌কা। দুনিয়াতে যারা সৎ আখেরাতেও তারা সৎ, পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যারা অসৎ আখেরাতেও তারা অসৎ। বেহেশ্‌তে সৎলোকেরাই প্রথম প্রবেশ করবে।"

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করেছেন- সদ্‌কা কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "বহু গুণ অতিরিক্ত সওয়াব যে আমলটির, সেটিই সদ্‌কা—আল্লাহ্‌র কাছে আরও অধিক সওয়াব রয়েছে।" অতঃপর এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً

"কে আছে, যে আল্লাহ্‌কে করজ দিবে উত্তম করজ দেওয়া, অতঃপর

আল্লাহ্ এ–কে তার জন্য বর্ধিত করে দিবেন বহুগুণে।” (বাক্বারাহ্ ঃ ২৪৫) আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সর্বোত্তম সদ্‌কা কোন্‌টি? তিনি বললেন, অভাবীকে গোপনে যা দান করা হয় আর নিজের অভাব –অনটন সত্ত্বেও কষ্ট সহ্য করে যা দিয়ে অপরের সাহায্য করা হয়। অতঃপর এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

“তোমরা যদি সদ্‌কাসমূহ প্রকাশ্যে প্রদান কর সে–ও ভাল কথা। আর যদি এতে গোপনীয়তা অবলম্বন কর এবং দরিদ্রদেরকে দিয়ে দাও, তবে তোমাদের জন্য অতি উত্তম।” (বাক্বারাহ্ ঃ ২৭১)

হাদীস শরীফে আছে, কোন মুসলমান বিবস্ত্র কোন মুসলমানকে পোষাক দান করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বেহেশ্‌তের সবুজ পোষাক পরিধান করাবেন। কোন অভুক্ত মুসলমানকে খাদ্য খাওয়ালে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বেহেশ্‌তের ফল খাওয়াবেন। আর যদি কোন মুসলমান পিপাসার্ত কোন মুসলমানকে পানি পান করায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বেহেশ্‌তের সিল–মোহরযুক্ত খোশবূদার শরাব পান করাবেন।

হাদীস শরীফে আছে, মিসকীনকে দান করলে যে ক্ষেত্রে এক সদ্‌কার সওয়াব লাভ হয়, গরীব অভাবী আত্মীয়কে দান করলে দ্বিগুণ সওয়াব হয়—এক, সদ্‌কার, দ্বিতীয়, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার।

এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উত্তম সদ্‌কা কোন্‌টি? নবীজী বলেছেন, তোমার যে আত্মীয় তোমার সাথে গোপনে শত্রুতা পোষণ করে, তাকে দান করা উত্তম সদ্‌কা।

বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি একটি দুগ্ধবতী পশু (উস্ট্রী, গাভী, ছাগল প্রভৃতি) অপরকে এই মর্মে দান করে যে, সে এ থেকে দুধ পান করবে এবং পরে তা ফিরিয়ে দিবে, অথবা কেউ যদি অপরকে ঋণ দেয় কিংবা সফরসাথীকে কেউ যদি হাদিয়া–উপহার পেশ করে, তবে এতে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব হবে।

বর্ণিত আছে যে,

كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ۔

"ঋণদান একটি বিশেষ সদ্‌কা।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

رَأَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا اَلصَّدَقَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ۔

"যে রাত্রিতে আমাকে ইস্‌রা ও মিরাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সে রাত্রিতে আমি দেখেছি—বেহেশ্‌তের দরজায় লিখিত রয়েছে যে, সদ্‌কা বা দানের সওয়াব দশগুণ আর ঋণ প্রদানের সওয়াব আঠার গুণ।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদের যে সাহায্য করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলা তার সাহায্য করবেন।

বর্ণিত আছে, একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ইসলাম কোন্‌টি? তিনি বললেন, আহার করাও এবং পরিচিত অপরিচিত সকল (মুসলমান)-কে সালাম দাও।

বর্ণিত আছে, এক সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে দুনিয়ার সবকিছু সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃষ্ট। রাবী বলেন, আমি পুনরায় আরজ করলাম, আমি কি আমল করলে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবো? হুযূর বললেন ঃ আহার করাও, সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটাও, আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় কর এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তুমি নামায (তাহাজ্জুদ) পড়। তাহলে তুমি নিরাপদে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে।

আরও বর্ণিত হয়েছে, যেসব কাজে আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হয়, তন্মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে খানা খাওয়ানো।

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজ ভাইকে তৃপ্ত করে আহার করিয়েছে, পানি পান করিয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তিকে দোযখ

থেকে সাত খন্দক দূরে রাখবেন। দুই খন্দকের মধ্যবর্তী দূরত্বের পরিমাণ হচ্ছে পাঁচশত বছরের পথ।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, হে আদম–সন্তান! আমি পীড়িত হয়েছিলাম আর তুমি আমাকে দেখতে আস নাই। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমি কিভাবে আপনাকে দেখতে আসবো অথচ আপনিই সমস্ত জগতের প্রতিপালক প্রভু? আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার বান্দা অমুক পীড়িত হয়েছিল আর তুমি তাকে দেখতে যাও নাই? তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে নিশ্চয় আমাকে তার নিকট পেতে?

হে আদম–সন্তান! আমি তোমার নিকট খানা চেয়েছিলাম তুমি আমাকে খানা দেও নাই। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমি আপনাকে কিরূপে খানা দিতাম অথচ আপনিই সমস্ত জগতের প্রতিপালক প্রভূ? তিনি বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার বান্দা অমুক তোমার নিকট খানা চেয়েছিল আর তুমি তাকে খানা দেও নাই? তুমি কি জানতে না যে, যদি তাকে খানা দিতে নিশ্চয় তা আমার নিকট পেতে?

আল্লাহ্ বলবেন, হে আদম–সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম আর তুমি আমাকে পানি পান করাও নাই। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমি আপনাকে কিরূপে পানি পান করাবো, যখন আপনিই সমস্ত জগতের প্রতিপালক প্রভু? তিনি বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল আর তুমি তাকে পানি পান করাও নাই। তুমি কি জানতে না যে, যদি তাকে পানি পান করাতে তবে তা আমার নিকট পেতে?

অধ্যায় ঃ ৬১

মুসলমান ভাইয়ের উপকার সাধন ও প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص

"তোমরা সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অপরের সহযোগিতা কর।" (মায়িদাহ্ ঃ ২)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যার্থে তার উপকার সাধনের নিমিত্ত অগ্রসর হবে, তার আমলনামায় আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের সমতুল্য সওয়াব লেখা হবে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ لِلّٰهِ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِقَضَاءِ حَوَائِجِ النَّاسِ اٰلٰى عَلٰى نَفْسِهٖ اَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ بِالنَّارِ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وُضِعَتْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يُحَدِّثُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَالنَّاسُ فِى الْحِسَابِ۔

"আল্লাহ্ তা'আলার এমন কিছু মখলূক রয়েছে, যাদেরকে তিনি মানুষের উপকার সাধন ও প্রয়োজন মিটানোর জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ পাক নিজ পবিত্র সত্তার কসম করে বলেছেন—তাদেরকে তিনি দোযখ-আগুনের শাস্তি দিবেন না কখনও। ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য নূরের মঞ্চ তৈয়ার করা হবে। অন্যান্য লোকেরা যখন হিসাবে ব্যস্ত থাকবে, তখন তারা আল্লাহ্র সাথে কথোপকথনে মগ্ন থাকবে।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ سَعٰى لِاَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فِىْ حَاجَةٍ قُضِيَتْ لَهُ اَوْ لَمْ تُقْضَ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَكُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ-

"যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের কোন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে, অতঃপর তা সমাধা হোক না হোক, আল্লাহ্ তা'আলা তার অতীত ও ভবিষ্যতের গুনাহ্ মাফ করে দিবেন এবং দু' বিষয়ের মুক্তিপত্র লিখে দিবেন ঃ এক. দোযখের আগুণ থেকে মুক্তি দুই.নেফাক (মুনাফেকী) থেকে মুক্তি।"

হযরত আনাস (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের উপকারার্থে কোন পথে অগ্রসর হবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি কদমে সত্তরটি নেকী লিখবেন এবং সত্তরটি গুনাহ্ মোচন করবেন। যদি মুসলমান ভাইয়ের উপকার সাধন হয়, তবে সে গুনাহ্ থেকে সদ্যপ্রসুত শিশুর ন্যায় পবিত্র হয়ে যাবে। আর যদি চেষ্টারত অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে বিনা হিসাবে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।"

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে তার প্রয়োজন ও সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলো এবং তাকে সৎ পরামর্শ দিল, আল্লাহ্ তা'আলা দোযখ ও তার মাঝে সাত খন্দক দূরত্ব স্থাপন করে দিবেন—এক খন্দক থেকে অপর খন্দক পর্যন্ত দূরত্ব হবে যমীন ও আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।"

হযরত ইব্নে উমর (রাযিঃ)–সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কোন কোন সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ তা'আলা প্রচুর নেয়ামত ও ধন–ঐশ্বর্য দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত তারা মুক্ত মনে মানুষের কল্যাণ সাধন ও অভাব দূরীকরণে ব্রতী থাকে, সেই নেয়ামত তাদের কাছেই

স্থায়ী রাখেন। আর যদি এরা সংকীর্ণ-হৃদয় হয়ে যায়, তবে তা অন্যদেরকে দিয়ে দেন।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা কি জান—জঙ্গলের বাঘ হুংকার দিয়ে কি বলে? সাহাবীগণ আরজ করলেন, আল্লাহ্ ও রাসূলই উত্তম জানেন। তিনি বললেন, বাঘ বলে, আয় আল্লাহ্! আমি যেন কোন সৎলোকের উপর চড়াও (হামলা) না করি।

হযরত আলী (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "তোমাদের কারও যদি কোনকিছুর প্রয়োজন বা সমস্যা দেখা দেয়, তবে সেটা সমাধানের জন্য জুমারাতে (বৃহস্পতিবারে) ভোর-সকালে রওনা হও এবং ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সূরা আলি-ইমরানের শেষ কয়েকখানি আয়াত, আয়াতুল-কুরসী, সূরা কদর ও সূরা ফাতেহা পড়ে নাও। কেননা, এতে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল মকসূদ পূরণ হয়।"

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে হাসান ইব্নে হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একদা আমার কোন একটি প্রয়োজনে আমি হযরত উমর ইব্নে আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়েছিলাম। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, আপনার যখনই কোনকিছুর প্রয়োজন হয়, আমার এখানে লোক পাঠিয়ে দিবেন (আমি তৎক্ষণাৎ আপনার হুকুম পালনার্থে কাজ করে দিবো)। আমি আল্লাহ্র সম্মুখে বড় লজ্জিত হই, যখন দেখি—আপনি স্বয়ং আমার দরজায় উপস্থিত হয়েছেন।"

ইব্নে হাব্বান ও হাকেম (রহঃ) রেওয়ায়াত করেছেন যে, একদা এক ব্যক্তি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি বড় গুনাহ্ করে ফেলেছি ; আমার জন্যে কি কোন তওবা আছে? হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা জীবিত আছেন? লোকটি বললো, না। হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার খালা জীবিত আছেন? লোকটি বললো, হাঁ। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলে দিলেন, তুমি তোমার খালার সাথে সদ্ব্যবহার কর।

বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইরশাদ করেন ঃ "সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে সদ্ব্যবহার করার নাম ছেলা-রেহ্‌মী বা আত্মীয়তা রক্ষা করা নয়, বরং প্রকৃত ছেলা-রেহ্‌মী হচ্ছে, আত্মীয়তা ছেদনকারীর সাথে আত্মীয়তা অটুট রাখা।"

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, ঐ সত্তার কসম যিনি দুনিয়ার সকল আওয়াজ শুনেন, যে কোন ব্যক্তি যদি কারও মনে আনন্দ দিতে পারে অর্থাৎ তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে, আল্লাহ্ তা'আলা এই আনন্দ দানের বিনিময়ে বান্দার জন্য 'লুতফ ও মেহেরবানী' সৃষ্টি করেন। যে কোন মুসীবতে সে পতিত হলে 'আল্লাহ্‌র মেহেরবানী' তার প্রতি উঁচু স্থান থেকে নিম্নপানে প্রবাহিত পানির ন্যায় দ্রুত ধাবিত হয় এবং তার মুসীবত এমন ভাবে দূর করে দেয়, যেমন নিজ শস্যখেত থেকে মালিক অন্যের উট তাড়িয়ে দেয়।

হযরত আলী (রাযিঃ) আরও বলেছেন, নীচ ও অযোগ্য লোকের কাছে নিজের প্রয়োজন অন্বেষণ অপেক্ষা গোটা প্রয়োজনটিই ভুলে যাওয়া আরও সহজতর বিষয়।

তিনি আরও বলেছেন যে, কারও কাছে নিজের প্রয়োজনের তাগিদে বারবার যেয়ো না। কেননা, গোবৎস গাভীর স্তন্যপানে সীমা অতিক্রম করলে তাকে শিং মেরে দেয়।

জনৈক আরবী কবি বলেছেন, যার সারমর্ম হচ্ছে, যতদিন তোমার সামর্থ ও সুযোগ আছে, অন্যের উপকার ও কল্যাণ সাধনে অবহেলা করো না। তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র করুণা ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর—তোমাকে তিনি অন্যের প্রতি এহ্‌সান ও অনুগ্রহ করার যোগ্য করেছেন এবং তোমাকে অপর থেকে অনেপক্ষ ও অমুখাপেক্ষী রেখেছেন।

অপর একজন বলেছেন, নিজের শক্তি সামর্থ অনুযায়ী মানুষের কল্যাণ সাধন ও অভাব দূরীকরণে ব্যাপৃত থাক। কেননা, এতে তোমার জীবনের এ দিনগুলোই হবে সর্বোৎকৃষ্ট দিন।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যার হাতকে আল্লাহ্ তা'আলা মানবের কল্যাণের নিমিত্ত কবূল করে নিয়েছেন। আর ধ্বংস ঐ ব্যক্তির যার হস্তে মানুষের ক্ষতিই সাধিত হয়।"

অধ্যায় ঃ ৬২

উযূর ফযীলত

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بِشَيْئٍ مِنَ الدُّنْيَا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ.

"যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে দুই রাকাত নামায এমনভাবে আদায় করলো যে, পার্থিব কোন বিষয় সম্পর্কে নামাযের মধ্যে সে কোনরূপ চিন্তা করলো না, সে ব্যক্তি সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যাবে।"

অন্য সূত্রে আরও সংযোজিত হয়ে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَلَمْ يَسْهُ فِيْهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থাৎ—উপরোক্ত দুই রাকাতে যদি সে কোনরূপ ভুল-ত্রুটি না করে, তাহলে (এই উযূ ও নামাযের ওসীলায়) আল্লাহ্ তা'আলা তার অতীতের গুনাহ্ মা'ফ করে দিবেন।

হাদীসে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ "আমি কি তোমাদেরকে বলবো—কি কাজ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গুনাহ্ মা'ফ করবেন এবং তোমাদের মর্যাদা বুলন্দ করবেন? তবে শুন, তা হচ্ছে—কষ্ট-ক্লিষ্টের অবস্থায়ও পরিপূর্ণ উযূ করা, মসজিদে বেশী বেশী উপস্থিত হওয়া ; এক, নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করা—এ হচ্ছে রাবাত। কথাটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার উচ্চারণ করেছেন। অর্থাৎ জিহাদের সময় সীমান্ত প্রহরার যে মর্যাদা, নামাযের জন্য অপেক্ষা করারও সেই মর্যাদা রয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূর অঙ্গসমূহ একবার

করে ধৌত করে বলেছেন ঃ 'অন্ততঃপক্ষে একবার ধৌত না করলে এ দ্বারা নামায কবূল হবে না।' (অতঃপর) দুইবার করে ধৌত করে বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি দু'বার করে ধৌত করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন। (অতঃপর) উযূর প্রতিটি অঙ্গ তিন তিনবার ধৌত করে বলেছেন ঃ "এ হচ্ছে আমার, আমার পূর্বেকার আম্বিয়া-কেরামের এবং পরম করুণাময়ের পরম বন্ধু হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের উযূ।"

হাদীস শরীফে আছে ঃ "উযূর সময় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র যিক্র (স্মরণ) করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সমস্ত দেহকে গুনাহ্ হতে পবিত্র করে দিবেন।" আর যে যিক্র করবে না ; তার কেবল উযূর অঙ্গগুলো আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র করবেন।"

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি উযূ অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও পুনরায় উযূ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার আমলনামায় দশটি নেকী লিখে দিবেন।' আরও বর্ণিত আছে ঃ 'উযূর উপর উযূ অর্থ নূর-এর উপর নূর।' বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব মহান উক্তি উম্মতকে তাজা উযূর জন্যে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যেই বিবৃত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "যখন কোন মুসলিম বান্দা উযূ করে এবং কুলি করে তখন তার গুনাহ্সমূহ মুখ হতে বের হয়ে যায়, যখন নাক ধৌত করে তখন তার গুনাহ্সমূহ নাক হতে বের হয়ে যায়, যখন চেহারা ধৌত করে তখন চেহারা হতে গুনাহ্সমূহ নির্গত হয়ে যায় এমনকি তার দুই চোখের পাতার নীচ হতেও গুনাহ্ নির্গত হয়ে যায়। অতঃপর যখন সে দুই হাত ধোয় তখন তার দুই হাত হতেও গুনাহ্সমূহ বের হয়ে যায় এমনকি দুই হাতের নখসমূহের নীচ হতেও গুনাহ্সমূহ বের হয়ে যায়। অতঃপর যখন সে মাথা মসেহ্ করে তখন তার মাথা হতে গুনাহ্সমূহ বের হয়ে যায় এমনকি তার দুই কান হতেও বের হয়ে যায়। অবশেষে যখন সে দুই পা ধোয় তখন দুই পা হতে গুনাহ্সমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার দু' পায়ের নখসমূহের নীচ হতেও বের হয়ে যায়। অতঃপর তার মসজিদের দিকে গমন ও নামায

হয় তার জন্য অতিরিক্ত (অর্থাৎ অধিক সওয়াবের কারণ।"

বর্ণিত আছে ঃ "বা-উযূ (যে উযূ অবস্থায় আছে) ব্যক্তি রোযাদারের ন্যায়।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূকার্য সম্পন্ন করে আকাশের দিকে দৃষ্টি করে পড়বে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

তার জন্য বেহেশ্‌তের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে ; যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে।"

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন ঃ "সত্যিকার উযূ তোমা হতে শয়তানকে দূরে সরিয়ে রাখবে।"

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ "তোমরা উযূ অবস্থায় আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও এস্তেগফার করতে করতে নিদ্রা যাও, কেননা রূহ্ যে অবস্থায় কবজ করা হবে, (কিয়ামতের দিন) তাকে সে অবস্থায়ই উঠানো হবে।"

বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রাযিঃ) এক সাহাবীকে কা'বা শরীফের গিলাফ আনার জন্য মিসর পাঠিয়েছিলেন। পথিমধ্যে শ্যাম দেশে এক দরবেশ ব্যক্তির বাড়ীর সন্নিকটে তিনি অবস্থান করলেন। দরবেশ ছিলেন একজন যবরদস্ত বিজ্ঞ ও আলেম লোক। তাই সাহাবী তাঁর নিকট কিছু জ্ঞানের কথা জানার জন্য তাঁর বাড়ীতে গেলেন। দরজায় আওয়ায দেওয়ার পর দরবেশ লোকটি যথেষ্ট বিলম্ব করে ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন। সাহাবী তার নিকট হতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করার পর দীর্ঘ সময় বিলম্ব করে দরজা খোলার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। জওয়াবে দরবেশ বললেন ঃ "আপনি খলীফার পক্ষ হতে রাজকীয় প্রভাব ও শান-শওকত নিয়ে আসছেন—তা দেখে আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেছি এবং দরজাতেই আপনাকে থামিয়ে দিয়েছি। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে বলেছেন ঃ "যদি তুমি কারও প্রভাব ও জাঁক-জমকে ভীত হও, তবে শীঘ্র উযূ করে নিবে এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে উযূ করার

নির্দেশ দিবে। কেননা, যে ব্যক্তি উযূ করে নেয়, আমি তাকে নিরাপত্তার আশ্রয় দান করি।" দরবেশ বললেন ঃ "এজন্যেই আমি দরজা বন্ধ রেখেছি এবং নিজে উযূ করেছি, পরিবার-পরিজনকে উযূর নির্দেশ দিয়েছি, আর আমি নামাযও পড়েছি। ফলে, আমরা সকলেই আল্লাহ্‌র নিরাপত্তায় আশ্রিত হওয়ার পর আপনার জন্য দরজা খুলেছি।"

অধ্যায় ঃ ৬৩

নামাযের ফযীলত

সমস্ত ইবাদতের মধ্যে নামায যেহেতু শ্রেষ্ঠতম এবং অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, তাই, পবিত্র কুরআনের রীতি (পুনঃ অবতারণা) অনুসারে পুনরায় নামাযের আলোচনা করা গেল।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَا اُعْطِیَ عَبْدٌ عَطَاءً خَیْرًا مِنْ اَنْ یُّوْذَنَ لَهٗ فِیْ رَکْعَتَیْنِ یُصَلِّیْهِمَا۔

'দুই রাকাত নামায পড়ার তওফীক হওয়া বান্দার উপর (আল্লাহ্ পাকের) সবচেয়ে বড় এহ্সান।'

মুহাম্মদ ইব্নে সীরিন (রহঃ) বলেন ঃ আমাকে যদি দুই রাকাত নামায অথবা বেহেশ্ত এই দুইয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার এখ্তিয়ার দেওয়া হয়, তাহলে আমি দুই রাকাত নামাযকেই গ্রহণ করবো। কারণ, এতে রয়েছে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি, আর বেহেশ্ত প্রাপ্তিতে রয়েছে আমার সন্তুষ্টি।'

বর্ণিত আছে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা সাত–আসমান সৃষ্টি করেছেন, তখন ফেরেশ্তাদের দ্বারা তা সম্পূর্ণ ভরপুর করে দিয়েছেন। তারা সকলেই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে মগ্ন। কেউ এক মুহূর্তের জন্যেও ইবাদত থেকে অন্যমনস্ক হয় না।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক আসমানের ফেরেশ্তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ইবাদত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং এক আসমানের ফেরেশ্তাগণ আপন আপন পদভরে দাঁড়িয়ে ইবাদতরত রয়েছেন ; এভাবে তাঁরা কেয়ামতের সিঙ্গা ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত থাকবেন। আরেক আসমানের ফেরেশ্তাগণ রুকূ অবস্থায় রয়েছেন। অপর এক আসমানের ফেরেশ্তাগণ সেজদায় পড়ে রয়েছেন। অনুরূপ, আরেক আসমানের ফেরেশ্তাগণ আপন

আপন ডানা বিছিয়ে আল্লাহ্‌র মহানত্ব ও অসীম গুণাবলীর প্রকাশে ব্যাপৃত রয়েছেন। ইল্লিয়্যীন ও আরশের ফেরেশ্‌তাগণ আরশে মু'আল্লা'র চতুর্পার্শ্বে তওয়াফরত রয়েছেন—এমতাবস্থায় তারা আল্লাহ্‌র গুণ-কীর্তন ও তসবীহ্-তাহ্‌লীল এবং দুনিয়াবাসীদের জন্য মাগফেরাতের দো'আয় নিমগ্ন থাকছেন। মুসলমানদের ফযীলতময় বৈশিষ্ট্যের কারণে উপরোক্ত সর্ববিধ ইবাদতকে তাদের জন্য এক নামাযের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করে দিয়েছেন। অধিকন্তু তাদেরকে কুরআন মজীদ তেলাওয়াতের সবিশেষ ইবাদতের তওফীক দানে ভূষিত করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা ও হক আদায়ের জন্য যাবতীয় শর্ত ও নিয়ম-নীতি অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের হুকুম করেছেন।

যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ٥

"ঐ মুত্তাকীগণ এমন যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করে অদৃশ্য বস্তুসমূহের প্রতি এবং নামায কায়েম করে, আর আমি তাদেরকে যা রিযিক প্রদান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে।" (বাক্বারাহ্ ঃ ৩)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ

"এবং নামায কায়েম কর।" (মুয্‌যাম্মিল ঃ ২০)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَقِمِ الصَّلَاةَ

"এবং নামায কায়েম করুন।" (হূদ ঃ ১১৪)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلَاةَ

"এবং যারা রীতিমত নামায আদায়কারী।" (নিসা ঃ ১৬২)

কুরআন মজীদের সর্বত্র যেখানেই নামাযের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে, সেখানেই 'নামায কায়েম করা'র কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে নামাযের বিষয় এভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ○

"অতএব, বড় সর্বনাশ ঐ সকল নামাযীর জন্য, যারা নিজেদের নামাযকে ভুলে থাকে।" (মাউন ঃ ৪,৫)

অর্থাৎ, মুনাফেকদেরকে শুধু নাম মাত্র নামায পাঠকারী বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে, প্রকৃত মু'মিনদেরকে 'নামায কায়েমকারী' বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, নামায অনেকেই পড়ে, কিন্তু নামায কায়েমকারীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। গাফলত ও অবহেলাভরে নামায পাঠকারীরা কেবল প্রথানুরূপ আমল করে যায়, তারা এ বিষয় আদৌ চিন্তা করে না যে, আমার নামায আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে অনেক নামাযী এমন রয়েছে, যাদের নামাযের মাত্র এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশ বা এক ষষ্ঠাংশ—এভাবে এক দশমাংশ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন—আমলনামায় লেখা হয়।' অর্থাৎ নামাযের মধ্যে যে ক্ষুদ্রাংশে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে মন নিবিষ্ট থাকে, কেবল সেই ক্ষুদ্র অংশটুকু কবূল হওয়ার যোগ্য হয়।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি হুযূরে ক্বাল্‌ব অর্থাৎ একাগ্রতা সহকারে দুই রাকাত নামায পড়ে, সে সদ্যপ্রসূত সন্তানের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যায়।

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র দরবারে নামায কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যখন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে নিজেকে নিমজ্জিত করে নামায পড়া হবে। যদি এরূপ নাহয় ; বরং নামাযের মধ্যে নানাবিধ চিন্তা ও অহেতুক কল্পনার অবতারণা হয়, তবে এর দৃষ্টান্ত হবে এরূপ,— বাদশাহ্‌র দরবারে কেউ স্বীয় অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনার মানসে দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান হলো, ঠিক যে সময় বাদশাহ্ উপস্থিত হলেন, তখন ক্ষমা প্রার্থনাকালে যদি সে এদিক সেদিক তাকাতে থাকে অথবা অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, তবে বাদশাহ্ তার

প্রার্থনা কতটুকু কবূল করবেন? বাদশাহ্র প্রতি তার ধ্যান ও মনোযোগ যতটুকু, তার আবেদন বা প্রার্থনাও ঠিক ততটুকু কবূল করা হবে। নামাযের বিষয়টিও ঠিক তদ্রূপ ; অন্যমনস্ক হয়ে অবহেলা ভরে নামায পড়লে, তা আল্লাহ্র দরবারে কবূল হবে না।

স্মরণ রেখো, নামাযের উদাহরণ হচ্ছে ওলীমার ন্যায় ; বাদশাহ্ লোকদিগকে ওলীমার দাওয়াত দিচ্ছেন, রাজকীয় দাওয়াত, আয়োজনও তদ্রূপ—নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের সমাহার। অনুরূপ, আল্লাহ্ তা'আলা লোকদেরকে নামাযের প্রতি আহ্বান করেছেন এবং এতে রয়েছে সর্বপ্রকার আমল ও যিকির। সুতরাং নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্র ইবাদত করা মূলতঃ সর্ববিধ ইবাদতের আস্বাদ গ্রহণ করা। মনে কর, নামাযের আমলসমূহ সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যাদি আর যিকির বা তসবীহসমূহ সুমিষ্ট পানীয় বস্তু।

বর্ণিত আছে, নামাযের মধ্যে বার হাজার খাছলত বা গুণ-বিশেষণ রয়েছে এবং তৎসমুদয় গুণাবলীকে মাত্র বারটি খাছলতের মধ্যে জমা করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তির নামাযের প্রতি আসক্তি আছে এবং বার হাজার খাছলত বা গুণাবলী সম্বলিত নামায পড়তে চায়, সে যেন বারটি খাছলতকে হৃদয়ঙ্গম করে পরিপূর্ণভাবে অন্তরে গেঁথে নেয়। এভাবে নামায পড়লে, তবে সে নামাযই হবে কামেল ও মুকাম্মাল নামায। তন্মধ্যে ছয়টি খাছলত নামায আরম্ভ করার পূর্বের সাথে সম্পর্কিত আর ছয়টি খাছলত নামাযের ভিতরগত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। প্রথমোক্ত ছয়টি খাছলত হলো ঃ

এক, ইলম ঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ইলম সহকারে যদি স্বল্প আমলও করা হয়, তবে তা জাহালতের বা অজ্ঞতার অধিক আমলের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

দুই, উযূ ঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ হচ্ছে, "উযূ ব্যতীত নামায হয় না।"

তিন, লেবাস ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"প্রত্যেকবার মসজিদে উপস্থিত হওয়াকালে নিজেদের পোষাক পরিধান করে নাও।" (আ'রাফ ঃ ৩১)

অর্থাৎ, নামাযের সময় লেবাস গ্রহণ কর বা উন্নত পোষাক পরিধান কর।

চার, সময় ঃ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا ۝

"অবশ্যই মুমিনদের উপর নামায নির্ধারিত সময়ে ফরয।" (নিসা ঃ ১০৩)

অর্থাৎ, নির্ধারিত সময়ে নামায পড়া ফরয।

পাঁচ, কেবলা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ফরমান ঃ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ط

"আপনার চেহারা মসজিদে-হারামের (কা'বার) দিকে ফিরিয়ে নিন। আর তোমরা যেখানেই থাক, স্বীয় চেহারা ঐ দিকেই ফিরাও।" (বাক্বারাহ ঃ ১৪৪)

ছয়, নিয়্যত ঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'প্রত্যেক আমলই নিয়্যতের উপর নির্ভর করে। সুতরাং যার নিয়্যত যেরূপ হবে, তার আমলও সেরূপ হবে।'

অপর ছয়টি খাছলত যা নামাযের ভিতরগত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, তা নিম্নরূপ ঃ

এক, তকবীর ঃ হাদীস শরীফে আছে, 'তকবীর হচ্ছে নামাযের তাহ্রীমাহ্।' অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার' দ্বারা নামায আরম্ভ হয় এবং নামায ব্যতীত অন্যান্য কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আর সালামের দ্বারা নামায হতে বের হয়ে অন্যান্য কাজের জন্য অনুমতিপ্রাপ্তি হয়।

দুই, ক্বিয়াম বা দাঁড়ান ঃ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ۝

"আল্লাহ্র সম্মুখে বিনয়ী অবস্থায় দণ্ডায়মান হও।" (বাক্বারা ঃ ২৩৮)

তিন, সূরা ফাতেহা ঃ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ

"যে পরিমাণ কুরআন সহজে পাঠ করা যায়, পাঠ কর।"

(মুয্যাম্মিল ঃ ২০)

চার, রুকূ ঃ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَارْكَعُوا

"তোমরা রুকূ কর।" (বাক্বারাহ্ ঃ ৪৩)

পাঁচ, সেজদা ঃ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَاسْجُدُوا

"তোমরা সিজ্দা কর।" (ফুচ্ছিলাত ঃ ৩৭)

ছয়, কুঊদ নামাযের বৈঠক ঃ হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ নামাযরত ব্যক্তি সর্বশেষ সেজদার পর তাশাহ্হুদ পরিমাণ সময় বসবে—এতে তার নামায পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে।

উপরোক্ত বারোটি খাছলত নামাযের ভিতর সন্নিবেশিত হওয়ার পর সিলমোহরের প্রয়োজন। আর তা হলো, **এখলাস**। নামাযের প্রত্যেকটি খাছলত আদায়ের সময় এখলাসের প্রতি সনিষ্ঠ দৃষ্টি রাখলে সেগুলো পরিপূর্ণ ভাবে মোহরযুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۙ

"আপনি খাঁটি বিশ্বাসে আল্লাহ্র ইবাদত করতে থাকুন।" (যুমার ঃ ২)

সেইসঙ্গে নামাযের পরিপূর্ণতার জন্য ত্রিবিধ ইলম অর্জন করাও অপরিহার্য। প্রথমতঃ নামাযে কি কি আমল ফরয এবং কি কি সুন্নত স্পষ্টভাবে সেগুলো জানা। দ্বিতীয়তঃ উযূর ফরয ও সুন্নতসমূহ জানা। উযূর এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে উযূর সমাধা করবে এবং এ উযূর দ্বারা যে নামায পড়বে, তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত নামায হবে। তৃতীয়তঃ শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া এবং হিম্মতের সাথে তা প্রতিহত করা।

উযূর পরিপূর্ণতা হাসিল হয় তিনটি বিষয়ের দ্বারা। এক,—হিংসা-বিদ্বেষ ও ধোঁকা-প্রতারণা থেকে অন্তর পবিত্র করে নিবে। দুই,—দেহকে পাপাচার হতে পবিত্র করে নিবে। তিন,—উযূর জন্য পানি ব্যয় করতে কোনরূপ অপচয় করবে না।

পোষাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা হাসিল হয় তিনটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখলে। এক,—হালাল মালের দ্বারা পোষাক তৈরী করবে। দুই,—পোষাক বাহ্যিক না-পাকী থেকে পবিত্র থাকা চাই। তিন,—পোষাক সুন্নত মুতাবেক হওয়া চাই ; অহংকার ও লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে না হওয়া চাই।

নামাযের জন্য সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখার বিষয়টির হাসিল হবে এ তিনটি বিষয়ে অভ্যস্থ হলে ঃ এক,—তোমার দৃষ্টি যেন চাঁদ, সূর্য ও তারকার প্রতি থাকে; যখনই নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখনই তা পড়ে নিবে। দুই,—তোমার কর্ণ সর্বদা আযানের অপেক্ষায় থাকবে। তিন,—তোমার অন্তরে সময়ের গুরুত্ব থাকতে হবে এবং তৎপ্রতি মনোযোগী ও ধ্যানমান হবে।

ক্বেবলারুখ হওয়ার ব্যাপারে তিনটি বিষয় বিদ্যমান থাকতে হবে ঃ এক,—চেহারা ক্বেবলার দিকে থাকবে। দুই,—অন্তর আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকবে। তিন,—আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে খুশূ-খুযূ সহকারে বিনয়াবনত থাকবে।

নিয়্যতের পরিপূর্ণতার জন্য তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে ঃ এক,—যখন যে নামায পড়ার ইচ্ছা করবে প্রারম্ভেই সেই নামাযকে নির্ধারণ করে নিবে এবং অন্তরে তা' উপস্থিত রাখবে। দুই,—অন্তরে এই ধ্যান দৃঢ় করে নিবে যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং তিনি আমাকে দেখছেন। অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়-ভীতি সহকারে নামাযে দণ্ডায়মান হবে। তিন,—নামাযরত অবস্থায় মনের অবস্থার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে—শয়তান যেন পার্থিব চিন্তা-কলহের কুমন্ত্রণায় ফেলে তোমাকে ওয়াসওয়াসাগ্রস্ত না করতে পারে।

তকবীর বা 'আল্লাহু আকবার' বলার পরিপূর্ণতা লাভ হয় তিনটি বিষয়ের দ্বারা ঃ এক,—বিশুদ্ধ উচ্চারণে দৃঢ়ভাবে তকবীর বল। দুই,—কান বরাবর

উভয় হস্ত উত্তোলন কর। তিন,—তকবীরের সময় অন্তর যেন নামাযে উপস্থিত থাকে, এ সময় আল্লাহ্ তা'আলার বড়ত্ব ও মহানত্বের ধ্যান করবে।

নামাযে ক্বিয়াম বা দাঁড়ানোর পরিপূর্ণতার জন্য তিনটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা অপরিহার্য ঃ এক,— তোমার চোখের দৃষ্টি সেজদার স্থানে নিবদ্ধ থাকবে। দুই,—অন্তর আল্লাহ্র পাকের ধ্যানে মগ্ন থাকবে। তিন,- ডানে-বামে তাকাবে না।

কেরাআতের পরিপূর্ণতার জন্য তিন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। এক,- ধীর-স্থির ও শান্তভাবে সহীহ্শুদ্ধ ও সুন্দর প্রক্রিয়ায় সূরা ফাতেহা পড়বে। দুই,—চিন্তা-ফিকির সহকারে তেলাওয়াত করবে ; অর্থের প্রতি মনোযোগ সহকারে ধ্যান করবে। তিন,—নামাযে যা পড়, বাস্তব জীবনে সে অনুযায়ী আমল করবে।

রুকূর পরিপূর্ণতার জন্য তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্যঃ এক,—পৃষ্ঠদেশ সোজা-বরাবর রাখবে ; একদিক উঁচু অপরদিক নীচ যেন না-হয়। দুই,—উভয় হস্ত হাঁটুর উপর এমনভাবে স্থাপন করবে যেন হাতের অঙ্গুলিসমূহ ফাঁক ফাঁক থাকে। তিন,—শান্তভাবে রুকূ করবে এবং তসবীহ্ পড়ার সময় আল্লাহ্র মহানত্বের ধ্যান করবে।

নামাযে কা'দা বা বৈঠকের পরিপূর্ণতার জন্য তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে ঃ এক,—বাম পায়ের পাতার উপর বসবে এবং ডান পা সোজা খাড়া করে রাখবে। দুই,—তাশাহুদের দো'আ পড়বে এবং এতে আল্লাহ্র মহত্বের প্রতি ধ্যান করবে, নিজের জন্য এবং সমগ্র ঈমানদারদের জন্য দো'আ করবে। তিন,—নামায পূর্ণ হওয়ার পর সালাম ফিরাবে।

সালামের পূর্ণতা লাভ হয় এভাবে—সত্যিকার আন্তরিকতা ও গভীর উপলব্ধি নিয়ে সালাম ফিরাবে। ডান দিকে সংরক্ষক ফেরেশ্তাগণ, উপস্থিত মুসল্লীবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে সালাম ফিরাবে। বাম দিকে সালাম ফিরাতেও অনুরূপে নিয়্যত করবে। সালাম ফিরানোর সময় দুই কাঁধ পর্যন্ত দৃষ্টি সীমিত রাখবে।

এখলাসের পরিপূর্ণতার জন্য তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এক,- একমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য নামায পড়বে ; অন্য কারও সন্তুষ্টি বা লৌকিকতা যেন উদ্দেশ্য না-হয়। দুই,—একথা একীন করবে যে, নামায

এবং সমস্ত নেক আমলের তওফীক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই প্রদত্ত; আমার নিজের কৃতিত্ব বলতে কিছুই নাই। তিন,—পঠিত নামাযের হেফাযত ও সংরক্ষণে সর্বদা সচেষ্ট ও সতর্ক থাকবে—নিজের কোন ত্রুটি বা পাপাচারের কারণে যেন নষ্ট না হয়ে যায়। বরং ক্বিয়ামতের দিন যেন এই নামায কাজে আসে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ

"যে ব্যক্তি নেক আমল নিয়ে এসেছে।' (কাসাস ঃ ৮৪)

উক্ত আয়াতে এ কথা বলেন নাই ঃ مَنْ عَمِلَ بِالْحَسَنَةِ ('যে ব্যক্তি নেক আমল করেছে।') সুতরাং আল্লাহ্‌র দরবারে নামায নিয়ে হাজির হওয়ার জন্য এর সংরক্ষণ জরুরী।

অধ্যায় ঃ ৬৪

ক্বিয়ামতের বিভীষিকা

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছি—ইয়া রাসূলুল্লাহ্, ক্বিয়ামতের দিন কি বন্ধু বন্ধুকে স্মরণ করবে? তিনি বলেছেন ঃ "ক্বিয়ামতের দিন তিন জায়গায় কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। এক. মীযান-পাল্লার নিকট ; যে পর্যন্ত না সে জানতে পারবে যে, তার পাল্লা হালকা রয়েছে কি ভারী হয়েছে। দুই. আমলনামা বিতরণের সময় ; যে পর্যন্ত না সে জানতে পারবে যে, আমলনামা সে ডান হাতে প্রাপ্ত হবে কি বাম হাতে। তিন. যখন দোযখের মধ্য থেকে বিরাট-বিশাল একটি গর্দান বের হয়ে তাদেরকে অগ্নির লেলিহান শিখায় আবদ্ধ করে নিবে এবং বলতে থাকবে যে, আল্লাহ্ আমাকে তিন ধরনের লোকের উপর ন্যস্ত করে দিয়েছেন, দুনিয়াতে যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে মাবূদ বানিয়েছে, আর অবাধ্যতা ও হঠকারিতা করেছে, আর যারা ক্বিয়ামতের দিনকে অবিশ্বাস করেছে। এই তিন শ্রেণীর লোকদেরকে সে পেঁচিয়ে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করবে। জাহান্নামের একটি পুল রয়েছে চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম তরবারীর চেয়েও ধারালো— এতে রয়েছে অগ্রভাগ বাঁকানো আঁকড়া বা লৌহ-শলাকা ; উপরন্তু কাঁটাদার ছোট ছোট চারা গাছ।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টি করার সময়ই (ক্বিয়ামতের) সিঙ্গা সৃষ্টি করেছেন এবং তা হযরত ইস্রাফিল (আঃ)-এর হাতে দিয়ে রেখেছেন। তিনি আরশের দিকে তাকিয়ে অপলক নেত্রে প্রতীক্ষা করছেন যে, কখন ফুৎকারের আদেশ করা হয়। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া

রাসূলাল্লাহ্, সিঙ্গা কি? তিনি বললেন ঃ নুরের শিং। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তা কেমন? তিনি বললেন ঃ ঐ সত্তার কসম, যিনি আমাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন, আসমান-যমীনের প্রশস্ততা জুড়ে এর পরিধি ; তিনবার এতে ফুৎকার দেওয়া হবে— নফ্খায়ে ফাযা' (ভয়-বিভীষিকা ও ত্রাসের ফুৎকার), নফ্খায়ে সা'ক্ব (বেহুঁশকরণের ফুৎকার) এবং নফ্খায়ে বা'ছ (পুনরুত্থানের ফুৎকার)। আর এই শেষোক্ত ফুৎকারে আত্মাসমূহ (রূহ্) বের হবে। তখন এমন দেখা যাবে, যেন অসংখ্য-অগণিত মক্ষিকায় আসমান-যমীন ভরে গেছে। অতঃপর এসব রূহ্ (আত্মা) নাকের ছিদ্র-পথ দিয়ে দেহসমূহে প্রবেশ করবে। এরপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি সে ব্যক্তি যার কবর সর্বপ্রথম বিদীর্ণ (উন্মুক্ত) হবে। অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত জিব্রাঈল, মিকাঈল ও ইস্রাফিল (আঃ)-কে যখন যিন্দা করা হবে, তখন তাঁরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের পার্শ্বে গিয়ে উপস্থিত হবেন। তাঁদের নিকট থাকবে (হুযূরের আরোহণের জন্য) বুরাক্ব, আরও থাকবে জান্নাতের পোষাক। কবর মুবারক বিদীর্ণ হওয়ার পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করবেন, হে জিবরাঈল। আজকে এ কোনদিন ? তিনি বলবেন, আজকে ক্বিয়ামত-দিবস। হক-নাহাকের ফয়সালার দিবস। ক্বারিয়াহ্ তথা করাঘাতকারীর দিবস। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, হে জিব্রাঈল! আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বল্বেন, আপনি সুসংবাদ নিন ; সর্বপ্রথম আপনার কবরই বিদীর্ণ হয়েছে।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বল্বেন ঃ "হে জ্বিন ও মানবকুল! আমি তোমাদের মঙ্গল চেয়েছি, এই নাও তোমাদের কর্মফল তোমাদের আমলনামায় রয়েছে। যদি ভাল হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্র প্রশংসা কর। আর যদি বিপরীত কিছু পাও, তবে অন্য কাউকে নয় নিজকেই ভর্ৎসনা কর।"

হযরত ইয়াহ্য়া ইব্নে রাযী (রহঃ)-এর মজলিসে এক ব্যক্তি এ আয়াতখানি তিলাওয়াত করেছিল ঃ

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ۝ وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ۝

"যেদিন আমি মুক্তাকীদেরকে করুণাময়ের নিকট মেহ্মানরূপে একত্রিত করবো, আর পাপীদের তৃষ্ণার্ত অবস্থায় দোযখের দিকে তাড়িয়ে নিবো।" (মার্য়াম ঃ ৮৬)

অর্থাৎ পাপীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পায়ে হাঁটিয়ে নেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন ঃ "হে লোকসকল! কোথায় দৌড়াচ্ছ—থাম, থাম ; এইতো আগামীকল্যই তোমাদেরকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে। চতুর্দিক থেকে তোমরা দলে দলে উপস্থিত হতে থাকবে এবং আল্লাহ্র সম্মুখে একা একা দন্ডায়মান হবে। জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজ সম্পর্কে তোমাদেরকে অক্ষরে অক্ষরে জিজ্ঞাসা করা হবে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা সহকারে জামাআত-বন্দী অবস্থায় পরম করুণাময়ের মহান দরবারে পৌছিয়ে দেওয়া হবে। আর পাপীদেরকে পায়ে হাঁটিয়ে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় কঠিন আযাবের সোপর্দ করা হবে ; দলে দলে তারা দোযখে প্রবেশ করবে। ওহে ভাইয়েরা আমার! তোমাদের সামনে এমন একদিন রয়েছে, যে দিনটির পরিমাণ তোমাদের গণনা অনুযায়ী পঞ্চাশ হাজার বছর দীর্ঘ হবে। সে দিনটি হবে প্রকম্পনকারী সিঙ্গা-ফুঁকের দিন। মহা বিভীষিকাময় ক্বিয়ামতের দিন। বিশ্বজগতের রব্বের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার দিন। লজ্জা, অনুতাপ, অনুশোচনা ও হায় আফ্সূস করার দিন। চুলচেরা ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব-নিকাশের দিন। দুঃখ-দৈন্য অভাব-অনটন ও ঘাট্তি-কম্তির দিন। চিৎকার, আহাজারি ও আর্তনাদের দিন। হক ও সত্য প্রকাশিত হওয়ার দিন। উত্থান ও পুনর্জীবিত হওয়ার দিন। আপন কৃতকর্ম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার দিন। লাভ-লোকসান চূড়ান্ত হওয়ার দিন। চেহারা কালো কিংবা সাদা হওয়ার দিন। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে না আসার দিন-তবে হাঁ, যারা পবিত্র আত্মা নিয়ে উপস্থিত হবে। অনাচারীদের উযর-আপত্তি কোন কাজে না আসার ; উপরন্তু তাদের উপর অভিশাপ ও খারাবী বর্ষিত হওয়ার দিন।"

হযরত মুকাতিল ইব্‌নে সুলাইমান (রহঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন সমগ্র মখ্‌লূক একশত বছর নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকবে ; কোনই কথা বলবে না। একশত বছর গভীর অন্ধকারে বিপন্ন ও দিশাহারা হয়ে থাকবে। আর একশত বছর উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় পরস্পর উলট-পালট খেতে থাকবে আর স্বীয় রব্বের নিকট কাতর মোকদ্দমা নিবেদন করতে থাকবে। পক্ষান্তরে, পঞ্চাশ হাজার বছর বিলম্বিত দিনটি নিষ্ঠাবান মুমিনের উপর একটি হালকা ফরয নামাযের ন্যায় স্বল্প সময়ে অতিবাহিত হয়ে যাবে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ اَرْبَعَةِ اَشْيَاءَ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَ اَفْنَاهُ وَعَنْ جَسَدِهٖ فِيْمَ اَبْلَاهُ وَعَنْ عِلْمِهٖ فِيْمَ عَمِلَ بِهٖ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَ اَنْفَقَهٗ.

"(হাশরের দিন) বান্দাকে চারটি প্রশ্ন না করা পর্যন্ত তার পদদ্বয় আপন জায়গা থেকে নড়বে না ঃ এক. তার জীবন কি কাজে ব্যয় করেছে? দুই. তার শরীরকে কি বিষয়ে সে জীর্ণ করেছে? তিন. যে বিদ্যা সে অর্জন করেছে, সেই অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে? চার. ধন-দৌলত কোথা হতে উপার্জন করেছে এবং তা কিভাবে ব্যয় করেছে?"

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "প্রত্যেক নবীকে একটি মকবূল দো'আর অধিকার দেওয়া হয়েছে। সকল নবী তা দুনিয়াতেই গ্রহণ করে নিয়েছেন। কিন্তু আমি তা আখেরাতে আমার উম্মতের শাফা'আতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছি।"

আয় আল্লাহ্! আমাদেরকেও তোমার প্রিয় হাবীবের শাফা'আত নসীব কর। আমীন॥

অধ্যায় ঃ ৬৫

দোযখ ও মীযান-পাল্লার বয়ান

একই বিষয়ের আলোচনা ইতিপূর্বে যদিও হয়েছে, বিষয়বস্তু পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে পুনঃআলোচনা করা যেতে পারে। কেননা হতে পারে এ পুনরাবৃত্তির ওসীলায় উদাসীন ও বিধ্বস্ত হৃদয়সমূহের যথেষ্ট উপকার হবে। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনেও দোযখ ও কিয়ামতের বিভীষিকার উল্লেখ বারবার করেছেন, যাতে বিবেকবান লোকদের এ থেকে উপকৃত হওয়া সহজতর হয়। আর এ বিষয়েও যেন সতর্কীকরণ হয়ে যায় যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া সবকিছুই বৃথা ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ এবং একমাত্র আখেরাতের জীবনই সর্বতঃ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।

আল্লাহ্ তা'আলা আপন অনুগ্রহ ও দয়াগুণে আমাদেরকে দোযখ থেকে হেফাযত করুন—দোযখের ভয়াবহতা সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, দোযখের অভ্যন্তর ভীষণ কালো-অন্ধকার ; আলোর নাম-নিশানাও সেখানে নাই। দোযখের সাতটি দরজা রয়েছে। প্রতিটি দরজায় সত্তর হাজার পাহাড় রয়েছে। প্রতিটি পাহাড়ে সত্তর হাজার আগুনের শাখা রয়েছে। প্রতিটি শাখায় সত্তর হাজার আগুনের কুণ্ড রয়েছে। প্রতিটি কুণ্ডে সত্তর হাজার আগুনের উপত্যকা রয়েছে। প্রতিটি উপত্যকায় সত্তর হাজার আগুনের অট্টালিকা রয়েছে। প্রতিটি অট্টালিকায় সত্তর হাজার সর্প এবং সত্তর হাজার বিচ্ছু রয়েছে। প্রতিটি বিচ্ছুর সত্তর হাজার লেজ রয়েছে। প্রতিটি লেজের সত্তর হাজার বিষ-থলি রয়েছে। যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন এ সবকিছু থেকে পর্দা অপসারণ করা হবে। এগুলো বিরাটকায় প্রাচীর হয়ে জ্বিন ও মানবকুলের ডানে, বামে, সম্মুখে, উপরে এবং পিছনে উড়তে থাকবে। এহেন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দেখে জ্বিন ও মানবকুল ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উপুড় হয়ে পড়ে যাবে এবং চিৎকার করে বলতে থাকবে—পরওয়ারদিগার! বাঁচাও, বাঁচাও।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কিয়ামতের দিন দোযখকে এমন অবস্থায় আনা হবে যে, এর সত্তর হাজার লাগাম হবে এবং প্রতিটি লাগামে সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে ; তারা দোযখকে হেঁচড়িয়ে আনতে থাকবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোযখের ফেরেশতাদের বিরাটকায় দেহের কথা বর্ণনা করেছেন, কুরআন পাকে যেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

غِلَاظٌ شِدَادٌ

"পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব।" (তাহ্রীম ঃ ৬)

আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "দোযখের এক একজন ফেরেশতা এরূপ বিরাট বিশাল দেহবিশিষ্ট হবে যে, কাঁধের এক পার্শ্ব থেকে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত এক বৎসরের দূরত্ব হবে। এক একজনের শরীরে এই পরিমাণ শক্তি হবে যে, হাতুড়ীর এক আঘাতেই বৃহৎ একটি পাহাড় চূর্ণ–বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সত্তর হাজার দোযখীকে এক আঘাতে দোযখের গভীর তলদেশে পৌঁছিয়ে দিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝

"দোযখের উপর ঊনিশ নিয়োজিত রয়েছেন।" (মুদ্দাস্সির ঃ ৩০)

এতদ্বারা যাবানিয়া তথা কঠোর শাস্তির ফেরেশতাদের সর্দারদেরকে বুঝানো হয়েছে। নতুবা সাধারণভাবে দোযখের ফেরেশতাদের সংখ্যা কত তা একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন।

কুরআনে ইরশাদে হয়েছে ঃ

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ

"আপনার রব্বের সৈন্যদেরকে একমাত্র তিনিই জানেন।"

(মুদ্দাস্সির ঃ ৩১)

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—দোযখের প্রশস্ততা কতটুকু? তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমার তা জানা নাই। তবে এই রেওয়ায়াত আমার নিকট পৌঁছেছে যে, দোযখস্থিত প্রত্যেক আযাবের ফেরেশতার কানের লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত সত্তর বছরের দূরত্ব এবং এর মধ্যে পঁচা ও দুর্গন্ধময় রক্ত–পূঁজের উপত্যকাসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে।

তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়াতে আছে, দোযখের এক একটি দেওয়ালের স্থূলতা চল্লিশ বছরের পথ পরিমাণ দূরত্ব রাখে।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ نَارَكُمْ هٰذِهِ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ

"তোমাদের দুনিয়ার এ আগুন দোযখের প্রচণ্ড উত্তপ্ত আগুনের তুলনায় সত্তর ভাগের এক ভাগ উষ্ণতা রাখে।"

সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুনিয়ার আগুনের প্রচণ্ডতাই তো যথেষ্ট ছিল। হুযূর বললেন, আরও ঊনসত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং প্রতি গুণে দুনিয়ার অগ্নির সমপরিমাণ প্রচণ্ডতা রয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ দোযখবাসীদের মধ্য হতে একজন দোযখীও যদি তার একটি হাত জগতবাসীর উপর বের করে, তবে এর প্রচণ্ড উত্তাপে সমগ্র দুনিয়া প্রজ্জ্বলিত হয়ে যাবে। দোযখের একজন দারোগাও যদি ইহজগতে বের হয়ে আসে, তবে জগতবাসীরা তার মধ্যে আল্লাহ্‌র রোষ ও আযাব–গজবের লক্ষণাদি প্রত্যক্ষ করে মরে যাবে। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হুকুমে দোযখবাসীর উপর ফেরেশতা যে কি পরিমাণ ক্রোধান্বিত, তা দেখে দুনিয়াবাসীরা সহ্য করতে পারবে না।)

মুসলিম শরীফ প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল। তিনি বললেন, জান তোমরা এ কিসের শব্দ? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক

পরিজ্ঞাত। তিনি বললেন, এ হচ্ছে একটি পাথর, যা সত্তর হাজার আগে জাহান্নামের আগুনের ভিতর ছোঁড়া হয়েছিল ; এতদিন পর্যন্ত তা জাহান্নামের গভীরতার দিকে যাচ্ছিল—আর এখন এইমাত্র জাহান্নামের তলদেশে গিয়ে পৌঁছলো।

হযরত উমর ইব্‌নে খাত্তাব (রাযিঃ) বলতেন, তোমরা দোযখের কথা খুব বেশী বেশী স্মরণ কর ; ধ্যান কর। কারণ দোযখাগ্নির উত্তাপ খুবই প্রচণ্ড, এর গভীরতা বহুদূর পর্যন্ত, এর বেড়ী লোহার।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলতেন, দোযখের অগ্নি দোযখবাসীদেরকে এমনভাবে গিলে ফেলবে, যেমন পাখী দানা গিলে ফেলে।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—কুরআনের আয়াত ঃ

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ○

"যখন দোযখে তাদেরকে দূর থেকে দেখবে, তখন তারা (দোযখবাসীরা) এর তর্জন ও গর্জন শুনতে পাবে।" (ফুরকান ঃ ১২)

উক্ত আয়াতে 'দোযখের দেখা'র কথা উল্লেখিত হয়েছে ; তাহলে কি দোযখের চক্ষু আছে? হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) জবাবে বললেন, তোমরা কি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস শোন নাই— তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে, সে যেন দোযখের দুই চোখের মাঝখানে স্বীয় ঠিকানা করে নেয়। আরজ করা হয়েছিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), দোযখেরও কি চোখ আছে? তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলার এ ফরমান শোন নাই? তিনি বলেছেন ঃ

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ

"দোযখ যখন তাদেরকে দূর থেকে দেখবে।"

এ হাদীসের সমর্থনে আরও হাদীস রয়েছে— যেমন বর্ণিত আছে, জাহান্নামের আগুনের ভিতর থেকে একটি গর্দান বের হবে ; এর দু'টো

চোখ থাকবে যা দিয়ে দেখবে, একটি জিহ্বা থাকবে যা দিয়ে কথা বলবে। সে বলবে ঃ আমাকে ওদের উপর নিযুক্ত করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্যকে শরীক করেছে। পাখী যেমন ক্ষুদ্র একটি তিল্‌কেও স্পষ্ট দেখতে পায় ; উক্ত গর্দান পাপাচারীকে তদপেক্ষা অধিক স্পষ্ট লক্ষ্য করবে এবং তাকে গিলে ফেলবে।

মীযান-পাল্লা

হাদীস শরীফে আছে, নেকীর পাল্লা হবে নূরের আর বদীর পাল্লা হবে অন্ধকারের।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ জান্নাতকে আরশের ডান দিকে, জাহান্নামকে আরশের বাম দিকে এবং নেকীসমূহ আরশের ডান দিকে আর বদীসমূহ আরশের বাম দিকে রাখা হবে। এভাবে নেকীসমূহ জান্নাতের (মোকাবিলায়) কাছাকাছি এবং বদীসমূহ জাহান্নামের (মোকাবেলায়) কাছাকাছি হবে।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন ঃ নেকী-বদী পরিমাপের মীযান দুই পাল্লাবিশিষ্ট হবে এবং এর মুঠি হবে একটি। তিনি আরও বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা যখন বান্দাহর আমলসমূহ পরিমাপের ইচ্ছা করবেন, তখন এগুলোকে আকৃতি দান করবেন।

অধ্যায় ঃ ৬৬

অহংকার ও আত্মগর্বের কুৎসা ও অনিষ্টকারিতা

আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে, তোমাকে এবং জগতের সকলকে দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ নসীব করুন। এ কথা স্মরণ রেখো যে, অহংকার (অর্থাৎ সৎগুণাবলীতে অন্যের তুলনায় নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে করা—একে 'তাকাব্বুর'ও বলা হয়) ও আত্ম-গর্ব (অর্থাৎ অন্যের দিকে লক্ষ্য না করে নিজকে মহতি গুণের অধিকারী বলে ধারণা করা—একে 'উজ্ব'ও বলা হয়) এমন দুই নিকৃষ্ট স্বভাব যে, এরা যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী ও নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়। উপরন্তু বহু অসৎ স্বভাবেরও উৎপত্তি ঘটায়। বস্তুতঃ মানবের দুর্ভাগ্যের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কল্যাণকর বিষয়াবলী ও সদুপদেশমূলক কথাবার্তার প্রতি কর্ণপাত না করে সেগুলোকে অগ্রাহ্য করে দেয়।

আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ বলেছেন, লজ্জা ও অহংকারের মাঝখানে ইল্ম বরবাদ হয়ে যায়। উঁচু প্রাসাদের সাথে যেমন বন্যা-স্রোতের সংঘর্ষ হয়, তেমনি অহংকারের সাথে ইল্মেরও হয়ে থাকে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।" তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি অহংকার ও দম্ভভরে পরিহিত পোষাক টেনে চলবে, আল্লাহ্ পাক তার প্রতি (রহ্মতের) দৃষ্টি করবেন না।"

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, দম্ভ-অহংকারের সাথে রাজত্বও টিকতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে অহংকার ও ধ্বংস-অনাচারকে একত্র উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ط

"এই আখেরাতে আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য ও অনাচার চায় না।" (কাসাস ঃ ৮৩)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

"আমি এমন লোকদেরকে আমার নিদর্শনাবলী থেকে বিমুখ করে রাখবো, যারা পৃথিবীতে অহংকার করে।" (আ'রাফ ঃ ১৪৬)

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আমি অহংকারীদেরকে দেখেছি, তাদের প্রত্যেকের অবস্থাই বিগড়ে গেছে। অর্থাৎ যে নেআমতের উপর দম্ভ করতো, তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

জাহেয্ বলেছেন, কুরাইশীদের মধ্যে মাখযুম গোত্র, উমাইয়াহ্ গোত্র আরও অন্যান্য কতক আরবীয় লোক অর্থাৎ জাফর ইব্নে কেলাব এবং যুরারাহ্ ইব্নে আদী' গোত্রের লোকেরা অহংকারী। আর পারস্যের রাজারা তো অন্যদেরকে গোলাম এবং নিজেদেরকে মালিক মনে করে।

আব্দুদ্দার গোত্রের একজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—তুমি খলীফার কাছে যাও না? সে উত্তর করেছে, আমি মনে করি—তথাকার গমনপথে যে পুলটি রয়েছে, সেটি আমার মর্যাদার বোঝ বহন করতে পারবে না।

হাজ্জাজ ইব্নে আরতাতকে কেউ বলেছিল—তুমি জামাআতে শরীক হও না? সে বলেছে, সবজি বিক্রেতাদের (নিম্নপর্যায়ের) সাথে আমাকে দাঁড়াতে হবে।

বর্ণিত আছে, একদা হযরত ওয়ায়েল ইব্নে হুজ্র হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলে তিনি তাকে এক খণ্ড জমি দান করলেন এবং মুআবিয়া (রাযিঃ)–কে তা পৃথক করে লিখে দেওয়ার জন্য বললেন। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) দ্বি–প্রহরের প্রচণ্ড গরমের মধ্যে

তার সাথে রওনা হলেন এবং তার উস্ত্রীর পিছনে পায়ে হেঁটে চললেন। সূর্যের তাপ শরীরের চামড়া পুড়ে ফেলার মত অত্যধিক ছিল। তিনি ইব্‌নে হুজ্‌রকে বললেন, আমাকে তোমার উস্ত্রীর উপর সওয়ার করিয়ে নাও। সে বললো, তুমি বাদশাহ্‌দের সাথে বসার উপযুক্ত নও। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) বললেন, তাহলে তোমার জুতা-জোড়া আমাকে দাও। পরিধান করে রৌদ্রের তাপ থেকে কিছুটা রক্ষা পাই। সে বললো, হে আবূ সুফিয়ানের পুত্র! আমি কার্পণ্যের কারণে অস্বীকার করছি না বরং আমি অপছন্দ করি যে, তুমি যদি আমার জুতা পরিধান কর, তাহলে তুমি ইয়ামানের বাদশাহ্‌দের পর্যায়ে পৌঁছলে। কাজেই তোমার জন্য এ-ই যথেষ্ট যে, তুমি আমার উস্ত্রীর ছায়া ঘেসে চল। কথিত আছে, পরবর্তীতে এমন এক সময় এসেছে যখন হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) খেলাফতে অধিষ্ঠিত। এই লোক তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়েছে। তখন তিনি তাকে স্বীয় পালংকের উপর নিজের সাথে বসিয়ে কথা বলেছেন ; সমাদর করেছেন। মাসরূর ইব্‌নে হিন্দ একজনকে বলেছিল, আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন? সে বললো, না। মাসরূর বললো, আমি মাসরূর ইব্‌নে হিন্দ। লোকটি বললো, আমি আপনাকে চিনি না। মাসরূর বললো, ধ্বংস সেই ব্যক্তির যে চন্দ্রকে চিনে না।

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী কবির উপদেশ হচ্ছে, "দম্ভ-অহঙ্কার কেবল আহ্‌মক যারা তারাই করতে পারে.। তুমি যদি জানতে অহংকারের মধ্যে কি ধ্বংসাত্মক বিষ লুক্কায়িত রয়েছে, তবে তুমি কখনও অহংকার করতে না। বস্তুতঃ অহংকার যেমন মানুষের দ্বীন-ধর্মকে ধ্বংস করে দেয়, তেমনি বুদ্ধি-বিবেক ও ইয্‌যত-সম্মানকেও বিনাশ করে দেয়।"

বস্তুতঃ দম্ভ-অহমিকা নিতান্ত নিম্ন পর্যায়ের লোকই করে থাকে। পক্ষান্তরে বিনয় ও নম্র স্বভাব তারাই অবলম্বন করে থাকে যারা অভিজাত ও উচ্চ পর্যায়ের।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ

"তিনটি ব্যাধি মানুষকে ধ্বংস করে দেয়—অদম্য লোভ-লালসা, বেপরোয়া প্রবৃত্তি ও আত্ম-প্রশংসা।"

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ হযরত নূহ (আঃ) মৃত্যুকালে তাঁর দুই পুত্রকে উপস্থিত করে বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে দু'টি বিষয়ে হুকুম দিচ্ছি, আর দু'টি বিষয়ে নিষেধ করছি—নিষেধ করছি এই যে, তোমরা শির্‌ক এবং অহংকারে লিপ্ত হয়ো না। আর হুকুম দিচ্ছি যে, তোমরা 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'–এর ছিফাত ও আদর্শের উপর থেকে তা পাঠ কর। কেননা, এই কালেমাকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় সাত আসমান, যমীন ও তন্মধ্যকার সবকিছুকে রাখা হয়, তবে অবশ্যই এই কালেমার পাল্লা ভারী হবে। অনুরূপ, যদি সাত আসমান, যমীন ও তন্মধ্যকার সবকিছু দিয়ে একটি বৃত্ত তৈরী হয় এবং 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'–কে সেই বৃত্তে রাখা হয়, তবে এই কালেমার ভারে বৃত্তটি চূর্ণ–বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আমি তোমাদেরকে আরও হুকুম করছি, তোমরা 'সুব্‌হানাল্লাহি ওয়াবিহাম্‌দিহী' পড়। কেননা, এই কালেমা প্রতিটি বস্তুর সালাত (নামায ও দো'আ)। এরই ওসীলায় সকলেই রিযিকপ্রাপ্ত হয়।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, (বড় ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি) যাকে আল্লাহ্ পাক স্বীয় কিতাবের জ্ঞান দান করেছেন, অতঃপর দম্ভ–অহংকারমুক্ত জীবন–যাপন করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, তাকে সুসংবাদ, মুবারকবাদ!

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে সালাম (রাযিঃ) একদা বাজারে গমন করেন, তখন তার মাথায় লাকড়ির একটি বোঝা ছিল। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে উচ্চতর মর্যাদা দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও আপনি কেন এই কষ্ট করছেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ

أَرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَ الْكِبْرَ عَنْ نَفْسِيْ -

"আমি আমার নফ্‌সের মধ্য হতে অহংকার দূর করার চেষ্টা করছি।"

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ

"তারা যেন নিজেদের পা সজোরে না ফেলে।" (নূর ঃ ৩১)

তফসীরে কুরতুবী কিতাবে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে যে, দম্ভ–অহংকারভরে পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হারাম। এমনিভাবে যে সকল পুরুষ জুতা পায়ে মাটির উপর সশব্দে (আঘাত হানার ন্যায়) চলে, বস্তুতঃ এরূপ চলাও হারাম। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এটা অহংকার ও আত্মাভিমানেরই অন্তর্ভুক্ত। আর তা মস্ত বড় গুনাহ্।

অধ্যায় ঃ ৬৭

এতীমের প্রতি দয়া এবং তাদের প্রতি অন্যায়-উৎপীড়ন না করা

বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "আমি এবং এতীমের অভিভাবক বেহেশ্তে এভাবে থাকবো— অতঃপর শহাদত অঙ্গুলি ও মধ্যমা অঙ্গুলি একত্র করে দেখিয়েছেন এবং দুইয়ের মাঝে কিছুটা ফাঁক রেখেছেন।"

মুসলিম শরীফে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, "নিজ আত্মীয় হোক বা না হোক, যদি কেউ এতীম-অনাথের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে, তবে আমি এবং সে জান্নাতে এভাবে থাকবো— অতঃপর শাহাদত ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয় একত্র করে দেখিয়েছেন।"

"বায্যার' কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি এতীমের অভিভাবক হবে- সে এতীম তার আত্মীয় হোক বা না হোক— সে এবং আমি জান্নাতে এই রকম একসঙ্গে থাকবো—অতঃপর দুটি অঙ্গুলি একত্র করে দেখিয়েছেন। অনুরূপ, যে ব্যক্তি তিন কন্যার লালন-পালনের জন্য পরিশ্রম করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার জন্য আল্লাহ্র রাস্তায় এমন জিহাদকারী ব্যক্তির সওয়াব রয়েছে, যে জিহাদরত অবস্থায় রোযাদার ও গোটা রাত নামায আদায়কারী ছিল।"

ইব্নে মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি তিনজন এতীমের লালন-পালন করবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় সওয়াব পাবে, যে গোটা রাত নামায আদায়কারী, দিনে রোযাদার এবং সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্র পথে তলোয়ার উত্তোলন করে জিহাদরত ছিল। আমি এবং সে ব্যক্তি জান্নাতে ভাই-ভাই থাকবো, যেমন এ দুই অঙ্গুলি,—এ কথা বলে শাহাদত ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয় একত্র করে দেখিয়েছেন।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্য হতে

তিনজন এতীমের পানাহারের দায়িত্ব নিয়েছে, আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই জান্নাতে দাখেল করবেন ; যদি সে ক্ষমার অযোগ্য কোন গুনাহ্ না করে (যেমন শির্ক, কুফ্র ইত্যাদি)। অপর এক রেওয়ায়াতে "এ এতীমগণ যতদিন অন্যের মুখাপেক্ষী থাকে" অংশটুকু রয়েছে।

ইব্‌নে মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسَنُ اِلَيْهِ ... الخ

"মুসলমানদের সর্বোৎকৃষ্ট ঘর সেটি, যে ঘরে এতীম রয়েছে এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করা হয় । পক্ষান্তরে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ঘর সেটি যে ঘরে এতীমের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়।"

আবূ ইয়ালা' হাসান সনদে রেওয়ায়াত করেছেন যে, "আমি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে বেহেশ্‌তের দরজা খুলবে। কিন্তু আমি দেখবো—একজন মহিলা আমার আগেই অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করবো, তুমি কে? সে বলবে, আমি এতীমদের লালন–পালনকারীনি একজন মহিলা।

ত্বব্‌রানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "ঐ সত্তার কসম, যিনি আমাকে হক ও সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন—কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দিবেন না, যে এতীমের প্রতি দয়া ও রহম করবে, কথা–বার্তায় তার সাথে সদয় আচরণ করবে, তার এতীমি ও অসহায়ত্বের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হবে এবং আপন প্রতিবেশীর সাথে নিজ প্রতিপত্তির কারণে অহংকার ও উৎপীড়ন করবে না।"

মুসনাদে আহমদ কিতাবে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন এতীমের মাথায় হাত বুলায়, সে তার স্পর্শ করা প্রতিটি কেশের জন্য একটা করে পুরস্কার লাভ করবে? আর যে লোক কোন এতীম বালক বা বালিকার উপকার করবে, সে এবং আমি পরস্পর একসঙ্গে হবো যেমন আমার হাতের দু'টো অঙ্গুলি।

মুহাদ্দেসীনের একটি জামাআত রেওয়ায়াত করেছেন এবং হাকেম রেওয়ায়াতটিকে সহীহ্ বলে আখ্যায়িত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত

ইয়াকূব (আঃ)–কে জানিয়েছেন যে, আপনার দৃষ্টিশক্তি রহিত হওয়া, পৃষ্ঠদেশ নুয়ে যাওয়া, ইউসূফ (আঃ)–এর সাথে তাঁর ভাইদের আচরণ এসবকিছুর কারণ হচ্ছে, আপনি পরিজনের জন্য একটি বকরি যবেহ্ করে নিজেরা খেয়েছিলেন, কিন্তু আগন্তুক একজন রোযাদার অভুক্ত মিসকীনকে তা থেকে খেতে দেন নাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সতর্ক করে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁর সৃষ্ট জীবের সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো, তারা এতীম–মিসকীনকে ভালবাসবে, তাদের প্রতি সদয় হবে। অতঃপর তাঁকে মিসকীনদের জন্য খানা তৈরী করে তাদেরকে খাওয়ানোর হুকুম করলেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাই করলেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "বিধবা ও দরিদ্রের সাহায্যকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী ব্যক্তির সমতুল্য। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছেন যে, সে ব্যক্তি সমস্ত দিনের রোযাদার এবং সমস্ত রাত্রির নামায আদায়কারীর সমতুল্য।"

ইব্নে মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلسَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكَالَّذِىْ يَقُوْمُ اللَّيْلَ وَيَصُوْمُ النَّهَارَ۔

"বিধবা ও মিসকীনের সাহায্যকারী আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীর ন্যায় এবং রাতভর নামায আদায়কারী ও দিনভর রোযাদারের সমতুল্য।"

জনৈক বুযুর্গ নিজের পূর্বেকার অবস্থা ব্যক্ত করে বলেন যে, জীবনের শুরুভাগে আমি মদ্যপায়ী পাপাচারী ছিলাম। একদা একটি এতীম শিশুকে দেখে তার প্রতি আমি দয়ার্দ্র হয়ে আপন সন্তানের ন্যায় বরং তদপেক্ষা বেশী তাকে আদর–সোহাগ ও সাহায্য করলাম। অতঃপর একদা আমি স্বপ্নে দেখি—আযাবের ফেরেশতা আমাকে পাকড়াও করে দোযখের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ; এমন সময় সেই এতীম শিশুটি উপস্থিত হয়ে ফেরেশতাকে বাধা

দিয়ে বললো, তাকে ছেড়ে দাও, আমি আল্লাহ্র সাথে তার বিষয়ে কথা বলে নিই। কিন্তু আযাবের ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করলো। তৎক্ষণাৎ একটি আওয়ায আসলো—"একে ছেড়ে দাও ; সে এতীমের সাহায্য করেছে ; এ সাহায্যের বিনিময়ে আমি তাখে মুক্তি দিলাম।" অতঃপর আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে গেলাম। বস্তুতঃ সেদিন থেকেই আমি এতীমের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা ও দয়া প্রদর্শনে খুবই মনোযোগী হয়ে গেলাম।

আলবী খান্দানের (হযরত ফাতেমার তরফে হযরত আলী (রাযিঃ)র বংশধর) একজন বিত্তশালী লোক কয়েকটি কন্যা-সন্তান রেখে মারা যান। এদের মা-ও ছিলেন আলবী খান্দানের। স্বামীর মৃত্যুতে এ ভদ্র মহিলা এতীম শিশু-সন্তানদের নিয়ে বিপাকে পড়ে গেলেন। অভাব ও দারিদ্রের তাড়নায় সন্তানদের নিয়ে তিনি গৃহ থেকে বের হয়ে গেলেন। অনাবাদ এক মসজিদে সন্তানদেরকে রেখে রুজির অন্বেষায় শহরের একজন ধনী লোকের গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়ে নিজের বৃত্তান্ত অবস্থা বর্ণনা করলেন। লোকটি ছিল মুসলমান। কিন্তু মহিলার কথায় সে বিশ্বাস না করে বললো, তোমার এসব দাবী-দাওয়ার উপর সাক্ষী আনয়ন কর। মহিলা বললেন, আমি অত্র এলাকায় অপরিচিতা একজন মুসাফির স্ত্রীলোক ; আমার পক্ষে সাক্ষী পেশ করা সম্ভব নয়। ফলে লোকটি তাকে কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতা করলো না। অতঃপর সে ভদ্র মহিলা একজন মজূসীর (অগ্নিপূজক) নিকট গিয়ে নিজের অসহায়ত্বের কথা বললেন। মজূসী লোকটি তাঁর কথায় বিশ্বাস করলেন এবং সাহায্য-সহযোগিতায় আগ্রহান্বিত হলেন এবং নিজের এক কন্যাকে পাঠিয়ে মসজিদে অপেক্ষমান শিশুদেরকে আনয়ন করলো। মা ও এতীম শিশুদেরকে সযত্নে আপন গৃহে অবস্থানের ব্যবস্থা করে খুব সেবা-যত্ন করতে লাগলো। এদিকে সেই মুসলমান লোকটি অর্ধরাতে স্বপ্ন দেখে—কিয়ামত কায়েম হয়ে গেছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন শির মোবারকে হামদ (প্রশংসা)-পতাকা বহন করছেন আর সম্মুখেই তাঁর বৃহৎ একটি অতি সুন্দর প্রাসাদ। সে জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ প্রাসাদটি করা জন্য? তিনি বললেন, একজন মুসলমানের জন্য। লোকটি বললো, আমিও তো একজন আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসী মুসলমান। হুযূর বললেন, তুমি যে মুসলমান, এ কথার উপর সাক্ষী আনয়ন কর। লোকটি এ কথা শুনে

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভদ্র মহিলার সাথে তার আচরণের কথা শুনালেন। ফলে, তার অন্তরে তীব্র আক্ষেপ ও অনুশোচনার উদ্রেক হলো। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েই সে ভদ্র মহিলার তালাশে বের হয়ে গেল। বহু তালাশের পর খোঁজ পেল যে, মজূসী লোকটি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে। সে মজূসী লোকটিকে বললো, ভদ্র মহিলাটিকে আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন। কিন্তু সে অস্বীকার করে বললো, আমি কস্মিনকালেও তাঁকে আমার এখান থেকে অন্যত্র দিবো না। কারণ, তাঁর ওসীলায় আমার অফুরন্ত বরকত ও কল্যাণ নসীব হয়েছে। মুসলমান লোকটি বললো, এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে আমার ওখানে পাঠিয়ে দিন। এতেও সে অস্বীকার করলো। অতঃপর তার উপর সে জোর প্রয়োগ করতে চাইলো। তখন মজূসী বলতে লাগলো, তুমি যে উদ্দেশ্যে তাঁকে নিতে চাচ্ছো, আমি সেজন্যে তোমার অপেক্ষা আরও বেশী হকদার। তুমি স্বপ্নে যে প্রাসাদটি দেখেছো, সেটি আমারই জন্যে তৈরী করা হয়েছে। তুমি আমার উপর মুসলমান হওয়ার গর্ব প্রকাশ কর? আল্লাহ্‌র কসম! আমি এবং আমার পরিজন সকলেই সেই রাত্রিতে ঘুমানোর পূর্বেই মুসলমান হয়ে গেছি এবং আমিও সে স্বপ্ন দেখেছি, যা তুমি দেখেছো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, আলবী খান্দানের মহিলাটি এবং তার সন্তানরা কি তোমার ঘরে আছে? আমি বলেছি—হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন তিনি বলেছেন, এ প্রাসাদটি তোমার এবং তোমার পরিজনের জন্য। অতঃপর সে মুসলমান নিরাশ হয়ে চলে গেল। তখন তোর মনে কি পরিমাণ দুঃখ ও আফসূস যে ছিল তা একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন।

অধ্যায় ঃ ৬৮

হারাম খাওয়া

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না।" (নিসা ঃ ২৯)

আয়াতখানির বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সূদ, জুয়া, ডাকাতি, চুরি, আত্মসাৎ, মিথ্যা সাক্ষ্য, বিশ্বাস ভঙ্গ, মিথ্যা কসম প্রভৃতি সকল প্রকার অন্যায় পন্থাই এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন, কোন বিনিময় ছাড়া অর্জিত মালই এখানে উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত আয়াতখানি যখন নাযিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম কারও কিছু খেতে সংকোচ বোধ করতঃ তা থেকে বিরত থাকতে আরম্ভ করেন। এতে সূরা নূরের এ আয়াতখানি নাযিল হয় ঃ

وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ....أَوْ

بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ....أَوْ صَدِيقِكُمْ

"স্বয়ং তোমাদের জন্যেও কোন দোষ নাই যে, তোমরা নিজেদের পিতৃগণের গৃহ হতে কিংবা তোমাদের ভ্রাতৃগণের গৃহ হতে, কিংবা তোমাদের ভগ্নিগণের গৃহ হতে, কিংবা তোমাদের চাচাদের গৃহ হতে...... অথবা তোমাদের বন্ধুগণের গৃহ হতে। (নূর ঃ ৬১)

এক উক্তি অনুযায়ী প্রথমোক্ত আয়াতখানি দ্বারা 'ভ্রান্ত ও বিকৃতভাবে অনুষ্ঠিত লেন-দেন'কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ উক্তির স্বপক্ষে দলীল পেশ

করা হয়েছে যে, হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন। আয়াতখানি 'মুহ্‌কাম' এবং অ-রহিত, অর্থাৎ এর বিধান বলবৎ রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। বস্তুতঃ এ বিষয়টিও বাতেল পন্থায় খাওয়ার অন্তর্ভুক্ত। পূর্বোক্ত আয়াতের পরবর্তী অংশ হচ্ছে ঃ

إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً

"অন্যের অধিকারভুক্ত সে সম্পদ হারাম নয়, যা ব্যবসা-বাণিজ্য বা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে অর্জিত হয়।" নিসা ঃ ২৯)

বৈধ উপায়ে অনুষ্ঠিত তেজারত বা ব্যবসা-বাণিজ্যে উভয় পক্ষে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিনিময় থাকে। কাজেই তা বাতেলের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর করয এবং হেবার মধ্যে যদিও দু'দিকে বিনিময় বিদ্যমান থাকে না, কিন্তু শরীয়তের অন্যান্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তা বিধানগতভাবে তেজারতের ন্যায় বৈধ।

উপরোক্ত আয়াতে বিশেষভাবে 'খাওয়া'র বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে- এর অর্থ এই নয় যে, এ নিষিদ্ধতা শুধু 'খাওয়া'র বিষয়ের মধ্যেই সীমিত। বরং সাধারণতঃ যেহেতু মানুষ খাওয়ার মাধ্যমেই উপকৃত হয়ে থাকে বেশী, তাই এটাকে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এর দৃষ্টান্ত আরও রয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ط

"যারা এতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, অবশ্যই তারা আগুনের দ্বারা আপন উদর পূর্তি করছে।" (নিসা ঃ ১০)

বিভিন্ন হাদীসে হারাম খাওয়া থেকে বেঁচে চলার জন্য সতর্ক এবং হালাল খাওয়ার জন্য হুকুম করা হয়েছে। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ـ

"আল্লাহ্ তা'আলা নিজে পাক–পবিত্র এবং পাক–পবিত্র বস্তুই তিনি কবূল করেন।"

আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারগণকে সে হুকুমই করেছেন, যা আম্বিয়ায়ে কেরামকে করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ط

"হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর এবং নেক আমল কর।" (মুমিনূন ঃ ৫১)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

"হে ঈমানদারগণ ! যে পবিত্র বস্তু আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে তোমরা খাও।" (বাকারাহ্ ঃ ১৭২)

উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যে দীর্ঘ সফর করে ক্লান্ত–শ্রান্ত, উস্ক–খুস্ক ও ধূলি–মলিন অবস্থায় আকাশের দিকে হাত উত্তোলন করে দো'আ করে— আয় আল্লাহ্! (ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে নিষ্ঠার সাথে খুব দো'আ করে,) কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, লেবাস হারাম; হারামের উপর তার জীবিকা ; এরূপ ব্যক্তির দো'আ আল্লাহ্র কাছে কিরূপে কবূল হতে পারে? অর্থাৎ এরূপ দো'আ কবূল হয় না।

ত্ববরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হালাল রুজির অন্বেষা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। ত্ববরানী ও বায়হাকী শরীফে আছে ঃ

طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرَائِضِ .

"ফরয দায়িত্বসমূহের পরপরই হালাল রুজি অন্বেষা ফরয।"

তিরমিযী ও হাকেম রেওয়ায়াত করেন ঃ

مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

"যে ব্যক্তি পাক ও হালাল খাদ্য খাবে, সুন্নত অনুযায়ী আমল করবে এবং তার দুরাচার থেকে লোকজন নিরাপদ থাকবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আন্হুম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজকাল এরূপ লোক আপনার উম্মতের মধ্যে অনেক রয়েছে। হুযূর বললেন ঃ আমার পরবর্তী যুগসমূহেও থাকবে।

মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি কিতাবে 'হাসান' সনদে বর্ণিত হয়েছে ঃ

أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ خُلُقٍ وَعِفَّةٌ فِي طَعْمَةٍ.

"তোমার মধ্যে চারটি গুণ যদি বিদ্যমান থাকে, তবে পার্থিব কোন সম্পদ লাভ না হলেও তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার ঃ এক,—আমানতের হেফাজত। দুই,— সত্য বলা। তিন,— সদ্ব্যবহার। চার,— হালাল খাদ্য খাওয়া।"

ত্ববরানী শরীফে আছে, সুসংবাদ সে ব্যক্তির জন্য, যার উপার্জন হালাল, যার গোপন ও অপ্রকাশ্য অবস্থাসমূহ সৎ, যার প্রকাশ্য অবস্থাসমূহ পছন্দনীয় এবং যার অনিষ্ট থেকে মানুষ নিরাপদ। আরও সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আপন ইলম অনুযায়ী আমল করে এবং অহেতুক কথা বলা থেকে বিরত থাকে। ত্ববরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হে সা'দ! হালাল খাদ্য খাও—তোমার দো'আ কবূল হবে। ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যার আয়ত্ত্বাধীনে আমার প্রাণ—একটি লুকমাও যদি কেউ হারাম মাল থেকে পেটে নিক্ষেপ করে, তবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন আমল কবূল হয় না। যে ব্যক্তির শরীরের গোশত হারাম দ্বারা লালিত হয়েছে, তা দোযখেরই বেশী উপযুক্ত।

বায্যার কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, যার আমানত নাই, তার দ্বীন নাই। তার নামাযও নাই, যাকাতও নাই। যে ব্যক্তি হারাম মাল উপার্জন করলো

এবং তা দিয়ে কোর্তা (জামা) বানিয়ে পরিধান করলো, এ কোর্তা যতক্ষণ পর্যন্ত শরীর থেকে সে অপসারণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায কবূল হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে একদম বেপরোয়া যে, তিনি এমন কোন ব্যক্তির নামায কবূল করবেন যে হারাম মালের কোর্তা পরিহিত অবস্থায় তা আদায় করেছে।

মুসনাদে আহমদে হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দশ দেরহাম দিয়ে একটি কাপড় খরিদ করলো, এর মধ্যে যদি একটি দেরহামও হারাম থাকে এ পোষাক পরিহিত অবস্থায় তার নামায কবূল হবে না। অতঃপর তিনি দুই কানে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়ে বললেন, একথা যদি আমি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট না শুনে থাকি, তবে আমার এ কর্ণদ্বয় বধির হয়ে যাবে।

বায়হাকী শরীফে আছে, যে ব্যক্তি জেনে-শুনে চুরির মাল খরিদ করে, সে ক্ষতি এবং গুনাহের মধ্যে চোরের সঙ্গে শরীক হয়ে গেল।

মুসনাদে আহ্‌মদে বর্ণিত হয়েছে, কসম সেই সত্তার যার হাতে আমার জীবন—তোমাদের মধ্যে যদি কেউ দড়ি হাতে নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে লাকড়ি কেটে পিঠে বোঝা বহন করে জীবিকা উপার্জন করে তা থেকে পানাহার করে, তবে এটা আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ ও হারাম খাদ্যে মুখ লাগানো থেকে অনেক উত্তম।

ইব্‌নে খুযাইমাহ ও ইব্‌নে হাব্বানে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি হারাম মাল সঞ্চয় করে তা থেকে সদকা ও দান-খয়রাত করে, তার জন্য কোন সওয়াব নাই, উপরন্তু এ জন্যে আরও (গুনাহের) বোঝা হবে।

ত্ববরানী শরীফে আছে, যে হারাম মাল উপার্জন করে তা দিয়ে (গোলাম খরিদ করে অথবা মুসলমন বন্দীকে) আযাদ করে, এসবকিছু তার জন্য (গুনাহের) বোঝা হবে।

মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যে যেরূপ রুজি বন্টন করেছেন, তেমনি আখলাক-চরিত্রও বন্টন করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া এমন ব্যক্তিকেও দেন, যাকে তিনি ভালবাসেন না আবার এমন ব্যক্তিকেও দেন, যাকে তিনি ভালবাসেন। পক্ষান্তরে দ্বীন কেবল ঐ ব্যক্তিকেই দান করেন, যাকে তিনি ভালবাসেন। আর যাকে

তিনি দ্বীন দান করলেন বুঝে নাও যে, তিনি তাকে পছন্দ করে নিয়েছেন। ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যার মুঠোয় আমার প্রাণ—বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তর ও জিহ্বা মুসলমান না হয়। এমনিভাবে বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিবেশী তার কষ্টদায়ক আচরণ থেকে নিরাপদ না হয়। সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার কষ্টদায়ক আচরণ কি? তিনি বললেন, ধোকা এবং জুলুম। যে বান্দা হারাম উপার্জন করে এবং তা থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, এ খরচ কোনদিন কবূল হয় না। আর এ উপার্জিত সম্পদ যে কাজেই ব্যয়িত হবে, তাতে কোন বরকত হয় না। আর হারাম সম্পদ উপার্জন করে যা রেখে যাবে, তা দোযখের দিকে নিয়ে যাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা মন্দকে মন্দের দ্বারা মিটান না, বরং মন্দকে মোচন করতে হলে সৎ কাজে ব্যাপৃত হতে হবে। নাপাকী দিয়ে নাপাকী দূর করা যায় না।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, কোন্ জিনিস মানুষকে বেশী দোযখে দাখেল করবে? তিনি বলেছেন জিহ্বা ও গোপনাঙ্গ। আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কোন্ জিনিস মানুষকে বেশী জান্নাতে দাখেল করবে? তিনি বলেছেন, আল্লাহ্-ভীতি (তাকওয়া) এবং সদাচার।

তিরমিযী শরীফে আছে, কেয়ামতের দিন বান্দাকে চারটি প্রশ্ন না করা পর্যন্ত তার কদম (জায়গা থেকে) নড়বে না ঃ এক—জীবন কি কাজে শেষ করেছ? দুই—যৌবন কিসে ব্যয় করেছ এবং কোথায় খরচ করেছ? চার—স্বীয় ইলমের উপর কতটুকু আমল করেছ?

বায়হাকী শরীফে আছে, দুনিয়া সজীব-সুন্দর ও অতীব আকর্ষণীয়। যে ব্যক্তি তা হালালভাবে উপার্জন করে হক ও সত্যের পথে ব্যয় করে, আল্লাহ্ তাকে সওয়াব দিবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি হারাম পন্থায় উপার্জন করে না-হক ও অন্যায় পথে ব্যয় করে, আল্লাহ্ তাকে অপমান ও লাঞ্ছনার স্থানে নিক্ষেপ করবেন। আর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের সম্পদে খেয়ানত করে, তাদের জন্য কেয়ামতের দিন দোযখের আগুন রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ٥

"তা (আগুন) যখনই কিছু নিস্তেজ হতে থাকবে, তখনই তাদের জন্য আরও সতেজ করে দিবো।" (বনী ইসরাঈল ঃ ৯৭)

সহীহ ইব্‌নে হাব্বানে বর্ণিত হয়েছে ঃ শরীরের যে অস্থি-রক্ত হারাম সম্পদে গড়েছে, তা জান্নাতে যাবে না, বরং তা দোযখেরই বেশী উপযুক্ত।

অধ্যায় ঃ ৬৯

সূদের নিষিদ্ধতা

সূদের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। হাদীস শরীফেও সূদের ব্যাপারে বিশদ আলোকপাত করা হয়েছে। বুখারী ও আবূ দাঊদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীরের চামড়া ক্ষত করে সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী ; এ গর্হিত কাজের পেশাদার, সূদগ্রহীতা এবং সূদ্‌দাতার প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। কুকুর ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং জীব-জন্তুর প্রতিকৃতি প্রস্তুতকারীর প্রতিও অভিসম্পাত করেছেন।

ইমাম আহমদ, আবূ ইয়ালা, ইব্‌নে খুযাইমাহ্ ও ইব্‌নে হাব্বান (রহঃ) হযরত আব্দুলাহ্ ইব্‌নে মাস্‌ঊদ (রাযিঃ) সূত্রে রেওয়ায়াত করেন যে, সূদ গ্রহীতা, সূদ-দাতা, সূদের সাক্ষী, জ্ঞাতভাবে সূদের চুক্তিপত্রের লেখক, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শরীরের চামড়া ক্ষতকারী ; এ কর্মের পেশাজীবী, যাকাত দানে অবহেলাকারী এবং হিজরত করার পর ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হযরত মুহাম্মাদুর্ রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানে এরা সকলেই অভিশপ্ত।

হাকেম (রহঃ) বর্ণনা করেন, চার প্রকার লোকের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট ; তাদেরকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না ঃ এক—মদ্যপানে অভ্যস্থ, দুই—সূদখোর, তিন—অন্যায়ভাবে এতীমের মাল ভক্ষণকারী, চার-পিতামাতার অবাধ্য সন্তান।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের সনদ-শর্তে উত্তীর্ণ হাকেমের রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সূদের মাধ্যমে তিয়াত্তরটি পাপের দরজা উন্মুক্ত হয়। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন পাপটি নিজ মা'কে বিবাহ করার সমতুল্য।

বায়্‌যার কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সূদের মাধ্যমে সত্তরটি পাপের দরজা

উন্মুক্ত হয়। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন পাপটি মার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমতুল্য।

ত্বব্‌রানী কবীর কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে সালাম (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "সূদের মাধ্যমে এক দেরহাম উপার্জন করা মুসলমান অবস্থায় তেত্রিশ বার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া থেকেও জঘন্যতম।" হাদীসখানির সনদ-পরম্পরায় এন্‌কেতা' অর্থাৎ এক স্তরে রাভির শূন্যতা রয়েছে। আবার এ হাদীসখানিই ইব্‌নে আবিদ্দুনিয়া, বগভী প্রমুখ সহীহ সনদে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সালামের উক্তি বলে রেওয়ায়াত করেছেন। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে এরূপ বক্তব্যসম্বলিত রেওয়ায়াত হুযূর সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই বক্তব্য হিসাবে পরিগণিত। কেননা সূদের একটি মাত্র দের্‌হাম উপার্জনের পাপ এতো অধিক সংখ্যক ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্যতম হওয়ার বিষয়টি ওহীর মাধ্যম ছাড়া অবগত হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সালাম (রাযিঃ) হাদীসখানি সরাসরি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে শুনেই রেওয়ায়াত করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, ক্বেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সৎ-অসৎ সকলকে দাঁড়ানোর অনুমতি দিবেন। কিন্তু সূদখোর লোক এমনভাবে দাঁড়াবে যেমন সেই ব্যক্তি যাকে শয়তান স্পর্শ করে মোহাভিভূত করে দেয়।

মুসনাদে আহ্‌মদ ও ত্বব্‌রানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "জেনে-শুনে সূদের এক দের্‌হাম পরিমাণ খাদ্য ভক্ষণ করা ছত্রিশ বার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে মারাত্মক ও জঘন্যতম।"

যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজে জালেমের সাহায্য করলো, সে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আশ্রয় থেকে বের হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি সূদের এক দেরহাম পরিমাণও ভক্ষণ করলো ; সে তেত্রিশ জেনা অপেক্ষাও জঘন্যতম পাপ করলো। শরীরের যে গোশত্ হারাম খাদ্যের দ্বারা পয়দা হলো, তা দোযখে প্রবেশেরই অধিকতর যোগ্য।

ইব্‌নে মাজাহ্ ও বায়হাকী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবূ হুরাইরাহ্

(রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ সূদের মধ্যে সত্তরটি গুনাহ্ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্নতম হচ্ছে, মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

হাকেম (রহঃ) হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে রেওয়ায়াত করেন যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিপক্ক হওয়ার আগেই বৃক্ষের উপর রেখে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে, যখন কোন জনপদে সূদ ব্যাপক হয়ে যায়, তখন সে জনপদের অধিবাসীরা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র আজাবের উপযুক্ত করে নিলো।

আবূ ইয়ালা হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রাযিঃ) সূত্রে রেওয়ায়াত করেন যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الزِّنَا وَالرِّبَا إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ.

যে সম্প্রদায়ের মধ্যে জেনা এবং সূদ ব্যাপক হয়ে যায়, তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র আজাবের উপযুক্ত করে নিলো।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে—

مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّبَا إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرُّشَا إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّعْبِ وَالسَّنَةُ الْعَامُ الْمُقْحِطُ نَزَلَ فِيهِ غَيْثٌ أَمْ لَا-

"যে সম্প্রদায়ের মধ্যে সূদ ব্যাপক হয়ে যায়, তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আর যাদের মধ্যে ঘুষ ব্যাপক হয়ে যায়, তারা শত্রুর ভয়ে সর্বদা আতঙ্কগ্রস্ত থাকে এবং বৃষ্টি হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় দূর্ভিক্ষ-জর্জরিত থাকে।"

মুসনাদে আহমদ ও ইব্‌নে মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে রাতে আমাকে মেরাজ করানো হয়েছে, আমি যখন সে রাতে সপ্তম আকাশে পৌঁছি, তখন উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি—কেবল বজ্রপাত, বিদুৎ আর ঘোর অন্ধকার। অতঃপর একদল লোকের নিকট গেলাম, তাদের পেট ছিল বিশাল ঘরের ন্যায়। বাহির থেকে এদের পেটের ভিতর সাপ, বিচ্ছু দেখা যাচ্ছিল। আমি হযরত জিব্‌রাঈল

(আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সূদখোর। এ হাদীসখানি ইস্ফাহানীও রেওয়ায়াত করেছেন। আর মুসনাদে আহ্মদে বিস্তৃতভাবে এবং ইব্নে মাজাহ্ শরীফে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসফাহানী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে রেওয়ায়াত করেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমাকে ঊর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়ার পর আমি দুনিয়ার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ; এখানে এমন ধরনের লোক ছিল, যাদের পেটগুলো বড় বড় ঘরের ন্যায়। এরা ফেরাউনী সম্প্রদায়ের লোকদের প্রবেশ-পথে থুবড়ে পড়ে রয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় এদেরকে আগুনের উপর দাঁড় করানো হয়। আর তারা বলতে থাকে—আয় রব্ব তা'আলা! কেয়ামত যেন কোনদিন কায়েম না হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের সূদখোর লোক। এরা এমনভাবে দাঁড়ায় যেমন শয়তানের স্পর্শে মস্তিস্ক-বিকৃত লোক।

ত্বরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের পূর্বে ব্যভিচার, সূদ ও মদ্যপানের ব্যাপক প্রচলন ঘটবে।

ত্ববরানী শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত কাসেম ইব্নে ওয়াররাক বলেন ঃ একদা আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আওফা (রাযিঃ)-কে দেখেছি, তিনি পোদ্দারদের (মুদ্রা-পরীক্ষক) বাজারে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে বলছেন, হে পোদ্দারগণ! তোমরা সুসংবাদ শ্রবণ কর। তারা বললো, হে আবূ মুহাম্মদ! (হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আওফা'র উপনাম) আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিন ; আপনি আমাদেরকে কিসের সুসংবাদ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পোদ্দারদের সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা দোযখের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

ত্ববরানী শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, তোমরা ঐ সকল গুনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করে চল, যেগুলো ক্ষমা করা হবে না। যেমন, খিয়ানত করা। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি কোন বস্তুর খিয়ানত করবে, কিয়ামতের দিন সেই বস্তু সহকারে তাকে উপস্থিত করা হবে। আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে, সূদ খাওয়া। যে ব্যক্তি সূদ খেলো, সে কিয়ামতের দিন মস্তিস্ক-বিকৃত উন্মাদের ন্যায়

উত্থিত হবে। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ـ

"যারা সূদ গ্রহণ করে,তারা সেই অবস্থা ব্যতীত দাঁড়াবে না যে অবস্থায় ঐ ব্যক্তি দাঁড়ায়, যাকে শয়তান স্পর্শ করে মোহাভিভূত করে দিয়েছে। (বাকারাহ্ ঃ ২৭৫)

ইসফাহানীর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সূদখোর কিয়ামতের দিন উন্মাদ অবস্থায় উঠবে এবং তার শরীরের একাংশ টেনে হেঁচড়ে চলবে। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ـ

"তারা সেই অবস্থা বতীত দাঁড়াবে না যে অবস্থায় ঐ ব্যক্তি দাঁড়ায় যাকে শয়তান স্পর্শ করে মোহাভিভূত করে দিয়েছে। (বাকারাহ ঃ ২৭৫)

ইব্‌নে মাজাহ্ ও হাকেম (রহঃ) রেওয়ায়াত করেছেন ঃ

مَا اَحَدٌ اَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا اِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهٖ اِلٰى قِلَّةٍ

"অর্থের প্রাচুর্যের লক্ষ্যে যে কেউ সূদের লোন-দেন করবে, পরিণামে ঘাটতি ছাড়া কিছু হবে না।"

হাকেম (রহঃ) আরও রেওয়ায়াত করেন ঃ

اَلرِّبَا وَاِنْ كَثُرَ فَاِنَّ عَاقِبَتَهٗ اِلٰى قَلٍّ ـ

"সূদ যদিও প্রচুর পরিমাণের হয়, তবু তার শেষ ফল হ্রাসের দিকে।"

ইমাম আবূ দাউদ ও ইব্‌নে মাজাহ (রহঃ) হযরত হাসান (রাযিঃ) সূত্রে

এবং তিনি হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন—

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلَّا اٰكِلُ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ اَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ ـ

"এমন একদিন অবশ্যই আসবে যখন সূদ থেকে কেউই মুক্ত থাকতে পারবে না। যদি সরাসরি নাও খায় তবু এর প্রভাব তাকে আক্রমণ করবে।"

'যাওয়ায়িদুল–মুসনাদ' গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে আহমদ থেকে বর্ণিত রেওয়ায়াত যে, ঐ সত্তার কসম যার কুদরতের হাতে আমার জীবন, আমার উম্মতের মধ্য হতে এক দল লোক অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত অবস্থায় দম্ভ–অহংকার ও আমোদ–প্রমোদের মধ্যে রাত্র কাটাবে অতঃপর সকালেই তারা বানর ও শূকরের আকৃতি ধারণ করবে। কেননা, তারা হারামকে হালাম মনে করতো, গায়িকা নারীদেরকে আনয়ন করতো, মদ্যপান করতো, সূদ খেতো এবং রেশমী পোষাক পরিধান করতো।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) রেওয়ায়াত করেন ঃ এই উম্মতের মধ্যে এমন একদল লোক হবে, যারা পানাহার, খেলাধূলা ও আমোদ–উল্লাসে রাত কাটাবে, কিন্তু পরক্ষণেই সকালে বিকৃত হয়ে বানর ও শূকরের রূপ ধারণ করবে। কেউ কেউ মাটিতে ধ্বসে যাবে, কারও কারও উপর পাথর বর্ষিত হবে। সকালে অন্যান্য লোকেরা বলাবলি করবে—রাতে অমুক লোক মাটিতে পুতে গেছে এবং অমুক বাড়ীটি মাটিতে ধ্বসে গেছে। কোন কোন গোত্র এবং বাড়ীর উপর এমন প্রচণ্ডভাবে পাথর বর্ষিত হবে, যেমন কওমে লূতের উপর বর্ষিত হয়েছিল। এর কারণ হচ্ছে, তারা মদ্যপান করতো, রেশমের বস্ত্র পরিধান করতো, গায়িকা নারী রাখতো, সূদ খেতো এবং আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতো। এখানে আরও একটি অসৎ স্বভাবের কথার উল্লেখ ছিল, কিন্তু বর্ণনাকারী সেটা ভুলে গেছেন। হাদীসখানি ইমাম আহমদ (রহঃ)–ও স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

অধ্যায় ঃ ৭০

বান্দার হকের বয়ান

বান্দার হকসমূহ কি কি? যখন সাক্ষাত হয় তখন তাকে সালাম করা, সে সালাম করলে তার জওয়াব দেওয়া, দাওয়াত দিলে তা কবূল করা, যখন সে হাঁচি দেয় আর বলে—আল-হামদুলিল্লাহ্ তখন জওয়াবে বলা-ইয়ারহামুকাল্লাহ্, যখন সে অসুস্থ হয় তখন তাকে দেখতে যাওয়া, মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় শরীক হওয়া, বান্দা কোন বিষয়ে কসম খেলে তাকে কসম পূরণে সহায়তা করা, যখন সে উপদেশ প্রার্থনা করে তখন তাকে উপদেশ প্রদান করা, অসাক্ষাতে তার হিত-কামনা করা (গীবত না করা), নিজের জন্য যা কামনা কর তার জন্যেও তা কামনা করা এবং নিজের জন্য যা অপছন্দ কর তার জন্যেও তা অপছন্দ করা। এসবকিছু হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اربع من حق المسلمين عليك ان تعين محسنهم وان تستغفر لمذنبهم وان تدعو لمدبرهم و تحب تائبهم.

"তোমাদের উপর মুসলমানের প্রতি চারটি হক রয়েছে ঃ এক—সৎ লোকের সাহায্য করবে। দুই—পাপীদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তিন—বিদায়ীদের জন্য দো'আ করবে। চার—বিদায়ীর স্থলাভিষিক্তের প্রতি ভালবাসা পোষণ করবে।"

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) পবিত্র কুরআনের আয়াত رحماء بينهم (অর্থাৎ তারা পরস্পর পরস্পরের জন্য সহানুভূতিশীল)-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, পুন্যবান মুসলমানেরা দুর্বলদের জন্য এবং দুর্বল মুসলমানেরা

পুন্যবানদের জন্য দো'আ ও কল্যাণ কামনা করবে। অর্থাৎ দুর্বলরা পুন্যবান–দেরকে দেখে দো'আ করবে—হে আল্লাহ্! তাদেরকে তুমি পুন্যের যে অংশ দিয়েছ, তাতে তুমি আরও বরকত ও বৃদ্ধি দান কর, এর উপর তাদের দৃঢ় করে দাও এবং আমাদেরকে তা থেকে উপকৃত হওয়ার তওফীক দাও। আর পুন্যবানরা দুর্বলদের দেখে দো'আ করবে—হে আল্লাহ্! তাদেরকে হিদায়াত দান কর, তাদের তওবা কবূল কর, তাদের ভুল–ত্রুটি ক্ষমা করে দাও।

বান্দার হকসমূহের মধ্যে একটি হক হচ্ছে, মুমিনদের জন্য সে বিষয়টিই পছন্দ করবে, যেটি নিজের জন্যে পছন্দ কর। হযরত নূ'মান ইব্‌নে সাবেত (রাযিঃ)–সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَدُّدِهِمْ وَ تَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكٰى عَضْوٌ مِنْهُ تَدَاعٰى سَائِرُهُ بِالْحُمّٰى وَالسَّهَرِ -

"পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসা এবং একে অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের ব্যাপারে মুমিনদের উদাহরণ হলো, একটি দেহ। যখন দেহের একটি অঙ্গ বেদনাগ্রস্ত হয় তখন সর্বশরীর জ্বর ও রাত–জাগরণের মাধ্যমে পীড়িত হয়।"

হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا -

"মুমিন মুমিনের জন্য একটি ইমারত সদৃশ। যার এক অংশ অপর অংশকে সুদৃঢ় করছে।"

বান্দার হকসমূহের মধ্যে আরেকটি হক হচ্ছে, কোন মুসলমানকে কথায় বা কাজে কষ্ট না দেওয়া। হাদীস শরীফে আছে ঃ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

"প্রকৃত মুসলমান সে যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে আমলের ফাযায়েল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

فَإِنْ لَّمْ تَقْدِرْ فَدَعِ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقْتَ بِهَا عَلٰى نَفْسِكَ

"তুমি যদি এসব কল্যাণে সমর্থ না হও, তবে অন্ততঃপক্ষে মানুষের ক্ষতি করা থেকে নিজকে বাঁচাও। কেননা, এটাও একটা সদকা (পুন্যের কাজ) যা তুমি নিজের উপর করলে।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "মুসলমানদের মধ্যে উৎকৃষ্ট সেই ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট হতে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।"

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেছেন— তোমরা কি জান, সত্যিকার মুসলমান কে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই উত্তম জানেন। তিনি বললেন, সত্যিকার মুসলমান সে, যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট হতে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন—সত্যিকার মুমিন কে? হুযূর বললেন, সত্যিকার মুমিন সে, যার অনিষ্ট থেকে মুমিনদের জান-মাল নিরাপদ থাকে। সাহাবায়ে কেরাম আরও জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যিকার মুহাজির কে? তিনি বললেন, যে মন্দ কাজ পরিহার করে এবং তা বেছে চলে।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইসলাম কি? তিনি বলেছেন ঃ

اَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لِلّٰهِ وَيَسْلَمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ

"তোমার অন্তঃকরণকে আল্লাহ্র সোপর্দ করা এবং মুসলমানগণ তোমার কথা ও কাজের অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকা।"

মুজাহিদ বলেন, দোযখীদেরকে খোস-পাঁচড়ায় আক্রান্ত করা হবে। তারা এতো অধিক মাত্রায় চুলকাবে যে তাদের শরীরের চামড়া ও মাংস পৃথক হয়ে হাড্ডি ভেসে উঠবে। অতঃপর আওয়াজ আসবে ; এদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে—ওহে! তোমাদের কি কষ্ট হয়? তারা বল্‌বে ঃ হাঁ। তখন বলা হবে, এ হচ্ছে তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল যে, তোমরা দুনিয়াতে মুমিনদেরকে কষ্ট দিতে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমি দেখেছি— বেহেশতের মধ্যে এক ব্যক্তি একটি বৃক্ষের উপর দোলায়মান রয়েছে। বৃক্ষটির কারণে চলার পথে মুসলমানদের কষ্ট হতো। লোকটি তা কেটে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল।

হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) আরজ করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন একটা কিছু শিক্ষা দেন, যা দিয়ে আমি উপকৃত হতে পারি। হুযূর বল্‌লেন, মুসলমানদের চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু (কাঁটা পাথর ইত্যাদি) সরিয়ে রাখ। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ زَحْزَحَ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا يُؤْذِيهِمْ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ حَسَنَةً وَمَنْ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ حَسَنَةً اَوْجَبَ لَهُ بِهَا الْجَنَّةَ

"মুসলমানদেরকে চলার পথে কষ্ট দেয় এমন কোন জিনিস যে ব্যক্তি তাদের পথ থেকে সরিয়ে রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার আমলনামায় নেকী লিখবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা যার জন্য নেকী লিখলেন, তার জন্য বেহেশ্‌ত অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يُشِيرَ اِلٰى اَخِيهِ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيهِ ـ

"কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয নয় যে, সে অপর কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি এমন কোন ইঙ্গিতময় দৃষ্টিতে দেখবে, যাতে তার কষ্ট হয়।"

অপর এক হাদীসে বলেছেন ঃ

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا۔

"কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয় যে, সে অপর মুসলমানকে ভয় দেখাবে।"

তিনি আরও বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَكْرَهُ اَذَى الْمُؤْمِنِيْنَ۔

"আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না যে, কেউ মুমিনদেরকে কষ্ট দিবে।"

রবী' ইব্‌নে খায়সাম (রহঃ) বলেন ঃ মানুষ দুই প্রকারে বিভক্ত ঃ মুমিন; তাদেরকে কষ্ট দিওনা। আর মূর্খ–জাহেল ; তাদের সাথে মূর্খতাসুলভ আচরণ করো না।

বান্দার হকসমূহের মধ্যে আরও একটি হক হচ্ছে, প্রত্যেক মুসলমানের সাথে বিনয়–বিনম্র আচরণ করা ; কারও সাথে দম্ভ–অহমিকায় প্রবৃত্ত না হওয়া। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা দাম্ভিক ও অহংকারী লোকদেরকে পছন্দ করেন না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা বিনম্র স্বভাব অবলম্বন কর এবং সেজন্যে এতো অধিক মাত্রায় প্রচেষ্টা চালাও যে, একজনও যেন দম্ভ–অহংকার না করে। তারপরেও যদি কেউ দম্ভ–অহংকার করে, তবে এ অহংকারে তোমরা ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

"আপনি বাহ্যিক (দৃষ্টিতে তাদের সাথে যে) আচরণ (সমীচীন মনে হয়, তা) গ্রহণ করুন, আর ভাল কাজের শিক্ষা দিতে থাকুন এবং মূর্খদের থেকে একদিকে সরে থাকুন। (আ'রাফ ঃ ১৯৯)

হযরত আবূ আউফা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মুসলমানের সাথে নম্র ও অমায়িক ব্যবহার করতেন, বিধবা মহিলা কিংবা দরিদ্র–মিসকীনেরও কোন অভাব দূরীকরণ বা সমস্যা সমাধানের জন্য সাথে চলতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না।

বান্দার আরেকটি হক হচ্ছে, কারও বিরুদ্ধে কারও কথা না শুনা এবং একের কথা অপরের কাছে (ক্ষতির উদ্দেশ্যে) না পৌছানো।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

খলীল ইব্‌নে আহমদ (রহঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি তোমার নিকট অন্যের চুগলী করলো ; জেনে রাখ—সে ব্যক্তি অন্যের কাছেও তোমার চুগলী করবে। তোমার কাছে অন্যের ক্ষতির কথা যে পৌছাতে পারলো, সে অন্যের কাছে তোমার ক্ষতির কথা পৌছাতে বিরত থাকবে না।"

বান্দার আরেকটি হক হচ্ছে, রাগান্বিত হয়ে পরিচিত কারও থেকে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখো না।

হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ .

"কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয় যে, সে তার অপর কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্কচ্ছেদ করে রাখবে ; সাক্ষাৎ হলেও এড়িয়ে চলবে। এ দু'জনের মধ্যে সেই আল্লাহ্‌র কাছে শ্রেষ্ঠ যে বিচ্ছেদ-ভাব ভঙ্গ করে প্রথমে অপরকে সালাম করে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ اَقَالَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"যে ব্যক্তি মুসলমানের ভুল-ক্রটি মার্জনা করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন।"

হযরত ইকরিমাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে বলেছেন, আমি দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছি, এর কারণ হচ্ছে, আপনি আপনার ভাইদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বলেন ঃ

مَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهٖ قَطُّ اِلَّا اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ - وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য কোনদিন কারো থেকে প্রতিশোধ নেন নাই। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলার বিধান লংঘন করা হলে, তিনি সেজন্যে শাস্তি দিয়েছেন।"

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন, "যদি কেউ কারও অপরাধ ক্ষমা করে দেয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই এই ক্ষমাকারীকে ক্ষমা করে দিবেন।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "দানে ধন কমে না, ক্ষমার বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাকারীর সম্মান বৃদ্ধি করেন ; আল্লাহ্র জন্য যে নত (বা বিনম্র) হয় তিনি তাকে উন্নত করেন।

অধ্যায় ঃ ৭১

প্রবৃত্তির অনুসরণের জঘন্যতা ও যুহ্দের বয়ান

[যুহ্দ ঃ দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও ঘৃণা]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ

"আপনি কি সেই ব্যক্তির অবস্থা দেখেছেন, যে নিজের প্রবৃত্তিকে আপন মাবূদ সাব্যস্ত করেছে, আর আল্লাহ্ তাকে (সত্য উপলবিদ্ধ করার) জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন?" (জাসিয়াহ্ ঃ ২৩)

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযি) বলেছেন ঃ উপরোক্ত আয়াতে কাফের ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশনা ও দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকেই নিজের জন্য একটি মনগড়া ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ সে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে। তার প্রবৃত্তি তাকে যেদিকে ডাকে, সেদিকেই সে সাড়া দেয়। আল্লাহ্‌র কুরআন ও হুকুম--আহ্‌কামের কোন পরোয়াই সে করে না। এক কথায়—সে নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব অবলম্বন করে নিয়েছে।

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط

"আপনি তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবেন না।" (মায়েদাহ্ ঃ ৪৮)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

"আপনি স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। কেননা, তা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে।" (ছোয়াদ ঃ ২৬)

প্রবৃত্তির এহেন জঘন্যতার কারণেই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করে দো'আ করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَوًى مُطَاعٍ وَشُحٍّ مُتَّبَعٍ

"হে আল্লাহ্! আমি রিপুর তাড়না, কার্পণ্য ও লোভ-লালসা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ هَوًى مُطَاعٌ وَشُحٌّ مُتَّبَعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ

"তিনটি ব্যাধি ধ্বংসাত্মক— রিপুর তাড়না, লোভ-লালসা এবং খোদ-পছন্দী বা আত্মপ্রশংসা।"

বস্তুতঃ প্রতিটি গুনাহ্ই প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিঃসৃত হয়ে ধ্বংসের কারণ হচ্ছে। আর এ অনুসরণই মানুষকে দোযখের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বাঁচার তওফীক দিন।

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, দুটি বিষয়ের মধ্যে কোন্‌টি সত্য ও সঠিক, তা যদি তুমি নির্ণয় করতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পতিত হও, তবে দেখ—কোন্ বিষয়টি তোমার প্রবৃত্তির চাহিদার বেশী নিকটবর্তী। যে বিষয়টি বেশী নিকটবর্তী সেটি তুমি ছেড়ে দাও। কারণ এটিই ভুল ও পরিত্যাজ্য। এরূপ অর্থেই ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন ঃ

اِذَا حَالَ اَمْرُكَ فِيْ مَعْنَيَيْنِ

وَلَمْ تَدْرِ حَيْثُ الْخَطَا وَالصَّوَابُ

"যখন দু'বিষয়ের যে কোন একটির সত্যাসত্যে তুমি দ্বিধায় পতিত হও এবং ভুল-সঠিক নির্ণয় করতে না পার,

فَخَالِفْ هَوَاكَ فَإِنَّ الْهَوٰى
يَقُودُ النُّفُوسَ إِلٰى مَا يُعَابُ.

"তখন তুমি তোমার কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা কর, কেননা প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে মন্দ ও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে।"

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, "তুমি দু' বিষয়ের দ্বিধায় পতিত হলে, অধিক আকর্ষণীয়টি ছেড়ে দাও আর কঠিন ও কষ্টকর বিষয়টি গ্রহণ করে নাও।" এ উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে, সহজ বিষয়ের প্রতি প্রবৃত্তি আকৃষ্ট হয় বেশী আর কঠিন ও কষ্টকর বিষয় থেকে প্রবৃত্তি দূরে সরে থাকতে চায়।

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, তোমরা এসব নফস ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। বস্তুতঃ এরাই বাতেল ও মন্দ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। হক ও সত্য বাহ্যতঃ ভারী হয়, বাতেল ও মন্দ কাজ বাহ্যতঃ সহজ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অসহনীয় মহা ক্ষতির কারণ হয়। গুনাহ পরিত্যাগ করা তওবা কবূল করানো অপেক্ষা সহজ। দু' একটা কামাতুর দৃষ্টি কিংবা মুহূর্তকালের মোহ–বিলাস কি স্বাদ–আস্বাদন দীর্ঘকালের জন্য দুঃখ–কষ্ট ও ভোগান্তির কারণ হয়।

হযরত লোকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে অতি মূল্যবান নসীহত করেছেন যে, সর্বপ্রথম আমি তোমাকে তোমার নফস ও প্রবৃত্তি থেকে ভয় দেখাচ্ছি এবং হুঁশিয়ার করছি যে, মানুষ মাত্রেরই নফস ও প্রবৃত্তি রয়েছে এবং তার প্রচুর খাহেশ ও চাহিদা রয়েছে। তুমি যদি তার চাহিদা মুতাবেক খোরাক দাও, তাহলে সে তোমার সাথে অবাধ্যতা শুরু করবে ; উপরন্তু সে তোমার কাছে আরও দাবী করবে। কেননা, মানুষের অন্তরাত্মায় নফস এমনভাবে লুক্কায়িত রয়েছে, যেমন পাথরের মধ্যে আগুন। পাথরের উপর আঘাত করলে তা জ্বলে উঠে ; আগুনের হলকা বের হয়। আর যদি আঘাত না করে এমনিতেই রাখা হয়, তবে আগুন সুপ্ত ও লুক্কায়িত থাকে। জনৈক আরবী কবি তাই বলেছেন ঃ

إِذَا مَا أَجَبْتَ النَّفْسَ فِيْ كُلِّ دَعْوَةٍ
دَعَتْكَ إِلَى الْأَمْرِ الْقَبِيْحِ الْمُحَرَّمِ

"তুমি নফসের প্রতিটি আহ্বানে যদি সাড়া দাও, তবে তোমাকে সে মারাত্মক হারাম এবং জঘন্য ও নিকৃষ্ট কাজের দিকে আহ্বান করবে।"

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْصِ الْهَوٰى قَادَكَ الْهَوٰى
إِلَى كُلِّ مَا فِيْهِ عَلَيْكَ مَقَالُ

"মনের সাধ–অভিলাষ ও রিপুর বিরোধিতা যদি তুমি না কর, তবে এই রিপু তোমাকে এমন এমন অন্যায়–অশ্লীল কর্মের দিকে টেনে নিয়ে যাবে, যার ফলে তোমার উপর আপত্তি উঠবে।"

وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ لَنْ تَسُوْدَ وَلَنْ تَرٰى
طُرُقَ الرَّشَادِ إِذَا اتَّبَعْتَ هَوَاكَ

"এ কথা মনের গহীনে গেঁথে নাও যে, প্রবৃত্তির অনুসরণে যদি তুমি মত্ত থাক, তাহলে কস্মিনকালেও নেতৃত্বের ধারে–কাছেও তুমি যেতে পারবে না এবং হেদায়াতের সুপথেও চলতে পারবে না।"

إِذَا شِئْتَ إِتْيَانَ الْمَحَامِدِ كُلِّهَا
وَنَيْلَ الَّذِيْ تَرْجُوْهُ مِنْ رَحْمَةِ الرَّبِّ

"সৎ গুণাবলীর সমন্বয় তোমার মধ্যে হোক এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহে তুমি ধন্য হও—এ যদি চাও,

فَخَالِفْ هَوَى النَّفْسِ الْمُسِيْئَةِ إِنَّهُ

لاعدى واردى من هوى الحب

"তাহলে এ বিভৎস নফসের বিরোধিতা অবশ্যই কর। কেননা এ নফস তোমার জন্যে ভালবাসা ও প্রেমের চাইতেও বেশী মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক

هما سببا حتف الهوى غيران في
هوى الحب مهما عف بعدا عن الذنب

"এ উভয়বিধ নফসের মৃত্যু হলো, এর বিরোধিতা। অবশ্য নফসের মৃত্যুর জন্য বিরোধিতার পর পাপাচার পরিহার ও সততারও প্রয়োজন রয়েছে।"

وجل المعاصي في هوى النفس فاعتمد
خلاف الذي تهواه ان كنت ذا لب

"প্রবৃত্তির অনুসরণ ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করণের মধ্যে বড় বড় গুনাহ্ ও পাপাচার নিহিত রয়েছে। সুতরাং তুমি যদি বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার হয়ে থাক, তবে গোড়াতেই তা পরিত্যাগ কর।"

انارة العقل مكسوف بطوع هوى
وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا

"প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণেই মানুষের আকল-বুদ্ধি নিষ্প্রভ হয়ে থাকে। আর যারা প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে চলে, তাদের আকল হয় তীক্ষ্ণ ধারালো।"

لقد ترفع الايام من كان جاهلا
ويردي الهوى ذا الرأي وهو لبيب

"সমাজ ও পরিবেশ মূর্খ লোকদেরকেও সম্মান দিতে জানে, কিন্তু প্রবৃত্তির অনুসারী বিদগ্ধ ও বুদ্ধিজীবীকে সে ধ্বংস করে দেয়।"

وَقَدْ تَحْمَدُ النَّاسُ الْفَتٰى وَهُوَ مُخْطِئٌ
وَيَعْذُلُ فِي الْاِحْسَانِ وَهُوَ مُصِيْبٌ

"এমনও হয় যে, কেউ ভ্রান্ত কাজ করেও লোকের প্রশংসা পায়, আবার কেউ সঠিক কাজ করেও মানুষের ভর্ৎসনার পাত্র হয়। (আর তা কেবল প্রবৃত্তির অনুসরণেরই ফল।)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلَ وَقَالَ لَهٗ اَقْبِلْ فَاَقْبَلَ وَقَالَ لَهٗ اَدْبِرْ فَادْبَرَ فَقَالَ وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَا رَكَّبْتُكَ اِلَّا فِيْ اَحَبِّ الْخَلْقِ اِلَيَّ وَ خَلَقَ الْحُمْقَ فَقَالَ لَهٗ اَقْبِلْ فَاَقْبَلَ وَقَالَ لَهٗ اَدْبِرْ فَادْبَرَ فَقَالَ وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَا رَكَّبْتُكَ اِلَّا فِيْ اَبْغَضِ الْخَلْقِ اِلَيَّ...

"আল্লাহ্ তা'আলা আকল–বুদ্ধিকে সৃষ্টি করে বলেছেন, অগ্রসর হও। সে অগ্রসর হয়েছে। আবার বলেছেন, পিছনে হট। সে পিছনে সরেছে। অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ আমার ইয্যত ও পরাক্রমশীলতার কসম, আমি তোর দ্বারা কেবল তাদেরকেই ধন্য করবো, যাদের আমি ভালবাসি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নির্বুদ্ধিতা ও বোকামীকে সৃষ্টি করে বললেন, অগ্রসর হও। সে অগ্রসর হলো। আবার বললেন, পিছনে হট। সে পিছনে সরলো। এবার আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আমার ইয্যত ও পরাক্রমশীলতার কসম, আমি তোকে নিকৃষ্টতম লোকদের উপর সওয়ার করিয়ে দিবো।"

(তিরমিযী)

জনৈক আরবী কবির ভাষায় ঃ

وَقَدْ اَصَابَ رَأْيُهُ عَيْنَ الصَّوَابِ

مَنِ اسْتَشَارَ عَقْلَهُ فِيْ كُلِّ بَابِ

"যে ব্যক্তি সর্ববিষয়ে বিবেকের পরামর্শ নেয়, সে অবশ্যই লক্ষ্যস্থলে পৌছুতে সক্ষম হয়।"

وَقَدْ رَاٰى اَنَّ الْهَوٰى مَهْمَا يُجِبْ

يَدْعُوْ اِلٰى سُوْءِ الْعَوَاقِبِ وَالْعِقَابِ

"জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তির চোখে একথা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে যে, যখনই কাম-প্রবৃত্তির আহ্বানে সাড়া দেওয়া হয়েছে, তখনই কোনো না কোনো অঘটন ঘটেছে এবং মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।"

اِذَا شِئْتَ اَنْ تَحْظٰى وَاَنْ تَبْلُغَ الْمُنٰى

فَلَا تُسْعِدِ النَّفْسَ الْمُطِيْعَةَ لِلْهَوٰى

"তুমি যদি সফল জীবন যাপন করে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছুতে চাও, তবে বল্গাহীন ও স্বেচ্ছাচারী এ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।"

وَخَالِفْ بِهَا عَنْ مُقْتَضٰى شَهَوَاتِهَا

وَاِيَّاكَ اَنْ تَحْفِلْ بِمَنْ ضَلَّ اَوْ غَوٰى

"বরং প্রবৃত্তির সাধ-অভিলাষ ও কামনা-বাসনার কঠোর বিরোধিতা কর এবং ভ্রষ্ট-উদ্‌ভ্রান্ত ও আত্মম্ভরী লোকদের সংশ্রব থেকে আত্মরক্ষা করে চল।"

وَدَعْهَا وَمَا تَدْعُوْ اِلَيْهِ فَاِنَّهَا

لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ مِنْ هَمٍّ اَوْ هُدًى

"ছেড়ে দাও নফস এবং নফসের কাংখিত বিষয়। কেননা সে তো আগ্রহী অসাবধানদেরকে মন্দ কাজেরই প্ররোচনা দিয়ে থাকে।"

لَعَلَّكَ اَنْ تَنْجُوَ مِنَ النَّارِ اِنَّهَا
لَقَاطِعَةُ الْاَمْعَاءِ نَزَّاعَةُ الشَّوٰى

"এসব সাধনার ফলশ্রুতিতে তুমি দোযখের অগ্নি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে দোযখাগ্নি এমন জ্বলন্ত হলকা যা নাড়িভুড়ি কেটে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলবে এবং শরীরের চর্ম পর্যন্ত খসিয়ে ফেলবে।"

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, "কুপ্রবৃত্তি এমন একটি নিকৃষ্ট বাহন, যা তোমাকে ঘোর অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে, এমন চারণভূমি ও তাঁবু যা তোমাকে যন্ত্রণা ও ভোগান্তির আসনে বসাবে। অতএব, হুঁশিয়ার থাকতে হবে সে যেন তোমাকে নিকৃষ্ট ও মন্দ বাহনে আরোহন করিয়ে পাপ-পঙ্কিলতার আবাসে পৌছিয়ে না দেয়।"

জনৈক ব্যক্তিকে বলা হয়েছিল—তুমি যদি বিয়ে করে নিতে, তাহলে কতই না ভাল হতো! জবাবে সে বলেছে, আমি যদি আমার নফস ও প্রবৃত্তিকে তালাক দিতে সক্ষম হতাম তাহলে কতই না ভাল হতো! অতঃপর সে এ পংক্তিটি পাঠ করলো ঃ

تَجَرَّدْ مِنَ الدُّنْيَا فَاِنَّكَ اِنَّمَا
سَقَطْتَ اِلَى الدُّنْيَا وَاَنْتَ مُجَرَّدٌ

"দুনিয়া থেকে পৃথক থাক। কেননা, দুনিয়াতে প্রথম যখন তুমি এসেছ, তখন একেবারে সবকিছু থেকেই শূন্য ছিলে।"

বস্তুতঃ দুনিয়া হচ্ছে নিদ্রা, আখেরাত হচ্ছে জাগ্রতবস্থা, এ দুইয়ের মাঝখানে মউত। আর আমরা মিথ্যা স্বপ্নের মাঝখানে বিভোর হয়ে পড়ে রয়েছি। যে ব্যক্তি কামাতুর দৃষ্টিতে দেখবে, সে ব্যাকুলতা অস্থিরতা ও বিব্রত বোধ করবে,

যে প্রবৃত্তির কাছে সমাধান চাইবে, সে নিজের উপর জুলুম করবে আর যে দীর্ঘ আশা পোষণ করবে সে চূড়ান্তে পৌছুতে পারবে না। বস্তুতঃ মানুষের দীর্ঘ আশার কোন সীমা-পরিসীমা নাই।

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়েছেন যে, আমি তোমাকে আদেশ করছি প্রবৃত্তির সাথে তুমি জেহাদ কর। কেননা, প্রবৃত্তিই সকল নিকৃষ্ট ও মন্দ কাজের উৎস ; সৎ কাজের শত্রু। বস্তুতঃ রিপুতাড়িত প্রতিটি কাজই তোমার শত্রু। অনেক পাপাচারকে তোমার সামনে সে নেকী এবং সৎকাজের রূপ দিয়ে ধরে তোলে। এসব থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে পূর্ণ সতর্কতার সাথে দৃষ্টি রাখতে হবে ; অবহেলা মোটেই করা যাবে না। সততা অবলম্বন কর। মিথ্যাচার পরিহার কর। আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার কর। অস্বীকৃতি ত্যাগ কর। ধৈর্য ধর। অধৈর্য পরিহার কর। নিয়ত সহীহ্ কর। নিয়ত খারাপ করে নিজের আমল বরবাদ করোনা। আয় আল্লাহ্! আমাদের বিবেক-বুদ্ধিকে নফসের তাবেদারী হতে রক্ষা কর। দুনিয়ার মোহ ও প্রবৃত্তির অনুসরণে মত্ত রেখে আমাদেরকে আখেরাত থেকে বিমুখ করো না। সব সময় তোমার যিকরে মগ্ন রাখ, তোমার শোকরগুযার বান্দা হওয়ার তওফীক দাও।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয়ই হচ্ছে উৎকৃষ্টতম দ্বীনদারী। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, নেক আমলের সর্দার হচ্ছে তাকওয়া।

আরেক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

كُنْ وَرِعًا تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ اَشْكَرَ النَّاسِ

"তুমি মুত্তাকী-পরহেযগার হয়ে যাও (অর্থাৎ পাপকর্ম থেকে বেঁচে চল), তাহলে তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক ইবাদতগুযার বলে গণ্য হবে। অল্পে তুষ্ট থাক, তাহলে তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক শোকর-গুযার বলে গণ্য হবে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَرَعٌ يَصُدُّهٗ عَنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِذَا خَلَا لَمْ يَعْبَاِ

اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ -

"আল্লাহ্র ভয় যাকে গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত না রাখে, নির্জন একাকীত্বে সে আল্লাহ্র সর্বজ্ঞতা ছেফাতেরও পরওয়া করবে না।" (অর্থাৎ 'আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ–সর্বজ্ঞানী' এ কথার বিশ্বাস তাকে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে ফিরাবে না।)

হযরত ইবরাহীম আদহম (রহঃ) বলেন, 'যুহ্দ' অর্থাৎ পার্থিব ভোগ–বিলাসে অনাসক্তির তিনটি পর্যায় রয়েছে ঃ এক—ফরয পর্যায় ; অর্থাৎ হারাম কাজসমূহ থেকে বেঁচে চলা। দুই—নিরাপদ পর্যায় ; অর্থাৎ সন্দেহজনক কার্যসমূহ পরিহার করে চলা। তিন—ফযীলতের পর্যায় ; অর্থাৎ হালাল ক্ষেত্রসমূহেও বেঁছে বেঁছে চলা। বস্তুতঃ এটা 'যুহ্দে'র চমৎকার ব্যাখ্যা।

হযরত ইব্নে মুবারক (রহঃ) বলেন, 'যুহ্দ' মূলতঃ যুহ্দকে গোপন রাখারই নাম। যাহেদ (যুহ্দ অবলম্বনকারী ব্যক্তি) যখন লোকদের থেকে পলায়ন করে, তখন তোমরা তাকে তালাশ কর (এবং তার আদর্শ গ্রহণ কর) আর যদি সে লোকদেরকে তালাশ করে, তবে তোমরা তার থেকে দূরে পলায়ন কর।"

আরবী কবির ভাষায় ঃ

اِنِّي وَجَدْتُ فَلَا تَظُنُّنَّ غَيْرَهٗ
اِنَّ التَّوَرُّعَ عِنْدَ هٰذَا الدِّرْهَمِ

"আমি প্রকৃত তথ্য পেয়ে গেছি ; বাস্তব সত্য এছাড়া আর কোনটাই নয় যে, প্রকৃত যুহ্দ ও পরহেযগারী এই দেরহাম–দীনার ও টাকা–পয়সার মধ্যেই রয়েছে।

فَاِذَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ تَرَكْتَهٗ
فَاعْلَمْ بِاَنَّ تُقَاكَ تَقْوَى الْمُسْلِمِ

"তোমার ক্ষমতা ও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি তুমি তা পরিত্যাগ করতে পার, তাহলে বুঝে নাও—একজন সত্যিকার মুসলিমের তাকওয়া-পরহেযগারী তোমার মধ্যে আছে।"

যাহেদ প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তি হতে পারে না, যার থেকে দুনিয়া মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ; অতঃপর সে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি অবলম্বন করে। বরং প্রকৃত যাহেদ সে-ই, যার কাছে দুনিয়া প্রাচুর্য সহকারে আসে, এতদসত্ত্বেও সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং এ থেকে পলায়নপর হওয়াকেই সে প্রাধান্য দেয়। যেমন আবূ তাম্মাম বলেছেন ঃ

إِذِ الْمَرْءُ لَمْ يَزْهَدْ وَقَدْ صُبِغَتْ لَهُ

بِعُصْفُرِهَا الدُّنْيَا فَلَيْسَ بِزَاهِدٍ

"যুহ্‌দ অবলম্বনকারী ব্যক্তির মধ্যে যদি দুনিয়ার রঙ পরিদৃষ্ট হয়, তাহলে সে প্রকৃত যাহেদ নয়।"

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানীর উক্তি হচ্ছে, দুনিয়ার জীবনে আমরা যুহ্‌দ অবলম্বন কেন করবো না? যখন দুনিয়ার বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই যে, এর আয়ুষ্কাল, এর হিত-কল্যাণ এবং এর স্বচ্ছতা সবই ভেজালপূর্ণ ; এর নিরাপত্তাও ধোকাপূর্ণ। এ দুনিয়া যদি কারও লাভ হয়, তবে তাকে আহত করে, আর যদি কারও থেকে বিদায় নেয়, তবে তাকে ধ্বংস করে দেয়।

আরবী কবি বলেছেন ঃ

تَبًّا لِطَالِبِ دُنْيَا لَا بَقَاءَ لَهَا

كَأَنَّمَا هِيَ فِي تَصْرِيفِهَا حُلُمُ

"ধ্বংস দুনিয়া-প্রার্থীর জন্য। বস্তুতঃ দুনিয়ার কোনই স্থায়িত্ব নাই। এর আবর্তন-বিবর্তন সবই স্বপ্ন বৈ কিছু নয়।"

صَفَائُهَا كَدِرٌ سَرَاؤُهَا ضَرَرٌ

اَمَانُهَا غَرَرٌ اَبْوَارُهَا ظُلَمٌ

"এর স্বচ্ছতা ময়লাযুক্ত, এর আনন্দ দুঃখবহ, এর নিরাপত্তা ধোকাপূর্ণ, এর আলো অন্ধকারাচ্ছন্ন।"

شَبَابُهَا هَرَمٌ رَاحَاتُهَا سُقُمٌ
لَذَّاتُهَا نَدَمٌ وِجْدَانُهَا عَدَمٌ

"এর যৌবন বার্দ্ধক্য, এর আরাম ও সুস্থতা রোগ-পীড়া ও অশান্তি, এর স্বাদ অপমান এবং একে পাওয়া মানে বঞ্চিত হওয়া।"

فَخَلِّ عَنْهَا وَلَا تَرْكَنَّ لِزَهْرَتِهَا
فَاِنَّهَا نِعَمٌ فِي طَيِّهَا نِقَمٌ

"অতএব, দুনিয়াকে পরিত্যাগ কর, এর চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না। কেননা এ নেয়ামত ও ধন-দৌলতের পরতে পরতে কঠোর শাস্তি লুক্কায়িত রয়েছে।"

وَاعْمَلْ لِدَارِ نَعِيْمٍ لَا نَفَادَ لَهَا
وَلَا يُخَافُ بِهَا مَوْتٌ وَلَا هَرَمٌ

"প্রকৃত নেয়ামত ও দৌলতের স্থায়ী আবাস সেই আখেরাতের জন্যে কাজ করে যাও, যার কোন লয় নাই ক্ষয় নাই ; সেখানে মৃত্যু ও বার্দ্ধক্যেরও কোন আশংকা নাই।

ইয়াহ্‌য়া ইব্‌নে মু'আয (রহঃ)-এর উপদেশ হচ্ছে, দুনিয়ার প্রতি তোমার দৃষ্টিপাত হবে শিক্ষা হাসিলের জন্য। স্বেচ্ছায় তুমি যতটুকু না হলে না হয়, ততটুকু উপার্জন কর এবং অতি দ্রুত আখেরাতের অন্বেষায় অগ্রসর হয়ে চলো।

অধ্যায় ঃ ৭২

জান্নাতের বিশদ বর্ণনা ও জান্নাতবাসীদের মান-মর্যাদা

ওহে আধ্যাত্ম সাধনায় ব্রতী সত্য পথের পথিক! এ কথা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করে নাও যে, ইতিপূর্বে যে আবাসস্থল তথা জাহান্নামের ভীষণ আযাব ও সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে, ঠিক তার বিপরীতে অপর একটি আবাসও (জান্নাত) রয়েছে। এ আবাসের অফুরন্ত সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ ও নাজ-নেয়ামতের প্রতিও একটু দৃষ্টিপাত করে নাও। কেননা, যে ব্যক্তি উক্ত আবাসদ্বয়ের যে কোন একটি হতে দূর হবে, সে অবশ্যম্ভাবীভাবে অপরটির অধিবাসী হবে। কাজেই দোযখের ভয়াবহ ও মারাত্মক অবস্থাদি এবং ঘটনাবলীর উপর দীর্ঘ চিন্তা ও ধ্যান করে আপন অন্তঃকরণে এর ভীতি ও ত্রাস জাগরুক করে রাখ। পক্ষান্তরে, জান্নাতের প্রতিশ্রুত চিরস্থায়ী পুরস্কার ও নাজ-নেয়ামতের বিষয় দীর্ঘ সময়ব্যাপী ধ্যানমগ্নতার মাধ্যমে আপন হৃদয়-মনে এর প্রতি আকর্ষণ ও আশা সৃষ্টি করে রাখ। ভীতির চাবুক প্রয়োগ করে নিজকে সম্মুখপানে অগ্রসর করে চল। আশা-ভরসার সুনিয়ন্ত্রিত লাগাম ধরে সঠিক পথে বেগবান থাক। এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে তুমি এক বিশাল জগতের পুরস্কারে ভূষিত হবে ; সেই সাথে জাহান্নামের কঠিন ও মর্মন্তুদ শাস্তি থেকেও পরিত্রাণ পেয়ে যাবে।

এতদপ্রসঙ্গে জান্নাতবাসীদের পরম সুখময় জীবনের উপরও একটু দৃষ্টিপাত করে নাও—উজ্জ্বল, সজীব ও দীপ্তিমান হবে তাদের মুখমণ্ডল। সিলমোহরযুক্ত বিশুদ্ধ শরাব পান করানো হবে তাদের। চকচকে শ্বেত বর্ণের মোতি নির্মিত তাঁবুর ভিতর রক্তিম হীরকের সিংহাসনে আসন দেওয়া হবে। এর ভিতর সবুজ বর্ণের কারুকার্য-খচিত শয্যা থাকবে। পালঙ্কের উপর হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে। তা' নহরের পার্শ্বে স্থাপন করা হবে। মধু ও শরাবে ভরপুর হবে নহর। গোলাম-বালক ও খাদেমগণ সদা উপস্থিত থাকবে। শোভা

ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে বড় বড় চক্ষু বিশিষ্টা উত্তম স্বভাবসম্পন্না বেহেশতী হূর রূপসীগণ ; যেন তারা ইয়াকুত ও প্রবাল-রত্ন। তাদেরকে পূর্বে না কোন মানুষ স্পর্শ করেছে, আর না কোন জ্বিন। তারা জান্নাতের বিভিন্ন স্থানে চলাচল করবে। বিলাসভরে যখন তারা চলে তখন তাদের প্রত্যেককে সত্তর হাজার ফেরেশতা স্কন্ধে আলিঙ্গন করে নেয়। তাদের দেহাবয়বে শ্বেত বর্ণের চকচকে রেশমের পোষাক থাকবে। যা দেখলে নয়ন ঝলসে যায়। তাদের মস্তকোপরি মুক্তা ও প্রবাল-রত্নখচিত মুকুট থাকবে। মনোলোভা অভিমান, সুন্দর স্বভাব ও অপরূপ লাবণ্যে সুশোভিত থাকবে। কাজল-মাখা চোখ, মন-মাতানো সুগন্ধময় দেহ। বার্দ্ধক্য ও অভাব কোনদিন তাদেরকে স্পর্শ করবে না। ইয়াকূত নির্মিত প্রাসাদে সুদর্শন তাঁবুর ভিতর সুরক্ষিত অবস্থায় তারা বসবাস করবে। এ সকল প্রাসাদ জান্নাতের উদ্যানের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপিত হবে। বেহেশতী হূরগণ হবে আনত দৃষ্টিসম্পন্না। তাদের ও জান্নাতবাসীগণের সম্মুখে আব-খোরা ও পান-পাত্র এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শুভ্র বর্ণের তরল শরাবে পরিপূর্ণ পেয়ালাসমূহ পরিবেশিত হবে। তাদের আশে-পাশে লুক্কায়িত-সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায় বালকগণ ঘুরে বেড়াবে। এ হবে তাদের পুরস্কার আমলের বিনিময়ে ; যা দুনিয়াতে তারা করেছে। তারা নিরাপদ স্থানে থাকবে। উদ্যান, বাগ-বাগিচা ও নহরসমূহের মধ্যে এক উত্তম স্থানে সর্বশক্তিমান বাদশাহের সান্নিধ্যে অবস্থান করবে। এইখানেই তারা বিশ্বপ্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে। তাদের মুখমণ্ডলে বেহেশতের সুখ চমকাতে থাকবে। কোনরূপ অপমান ও লাঞ্ছনা তাদেরকে স্পর্শ করবে না বরং তারা পরম সম্মানিত বান্দা। তারা আপন প্রভুর নিকট হতে নানাবিধ উপঢৌকন পেতে থাকবে। সর্বদা তারা যা-ই চাবে, তা-ই পাবে। তথায় তাদের থাকবে না কোন ভয় বা দুঃখ ক্লেশ। তারা থাকবে মৃত্যু থেকে নিরাপদ সুখ-সম্পদের ভিতর। তারা বেহেশতী খাদ্য আহার করবে আর পান করবে বেহেশতী নহর থেকে অপরিবর্তনীয় স্বাদসম্পন্ন দুধ, সুস্বাদু সুরা, পরিশোধিত মধু। বেহেশতের যমীন রৌপ্যের। সুরকী প্রবাল-রত্নের। মাটি মুশকের। উদ্ভিদ জাফরানের। সুগন্ধময় ফুলের রস মেঘমালা হতে তাদের উপর বর্ষিত হবে। বেহেশতের টিলা হবে কর্পূরের। ইয়াকূত ও প্রবাল-রত্নখচিত রৌপ্যনির্মিত পেয়ালা হবে। সিল-মোহরযুক্ত বন্ধমুখ পেয়ালায় সালসাবীল

মিশ্রিত সুমিষ্ট পানীয় থাকবে। এর স্বচ্ছতার দরুন চতুর্দিকে জ্যোতি চমকাতে থাকবে। সূক্ষ্মতা ও রক্তিম বর্ণের দরুন পশ্চাৎ ভাগ থেকে পানীয় দেখা যাবে। কোন মানুষ তা প্রস্তুত করতে সক্ষম নয়। এর নির্মাণকার্যে কোনরূপ ত্রুটি থাকবে না। তা এমন খাদেমের হাতে থাকবে যার মুখশ্রী সূর্যরশ্মির ন্যায় উজ্জ্বল ; বরং তার লাবণ্য, শ্রী, ভ্রুকুটি ও কেশ কাঞ্চনের নিকট সূর্যরশ্মিরও তুলনা হয় না।

অতীব বিস্ময়কর বিষয় যে, যে ব্যক্তি এই অতুলনীয় বেহেশত-আগারের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে ; আরও বিশ্বাস রাখে যে, এর অধিবাসীদের মৃত্যু হবে না, চিরস্থায়ী বসবাস হবে এতে, তাদের কোন বিপদ-আপদ হবে না, কোন দুর্ঘটনা ঘটবে না, কোন পরিবর্তন-বিবর্তন হবে না, সে কিরূপে (ক্ষণস্থায়ী জগতের) এই আবাসের প্রতি ভালবাসা স্থাপন করে, যা ধ্বংস হয়ে খান্‌খান্‌ হয়ে যাওয়ার হুকুম রয়েছে আল্লাহ্‌র। কি করে সে এহেন নিকৃষ্ট ও ধ্বংসশীল আবাসের বসবাসে সন্তুষ্ট থাকে! আল্লাহ্‌র কসম! বেহেশ্‌তে যদি শুধুমাত্র, শরীরের সুস্থতা আর মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও বিপদ-আপদ থেকে নিস্কৃতির নেয়ামতটুকুই থাকতো, তবুও এই বেহেশত লাভের বিনিময়ে সামান্যতম সাধ-অভিলাষের প্রাধান্য পাওয়া তো দূরের কথা গোটা দুনিয়াটাই প্রত্যাখ্যাত হওয়ার উপযুক্ত ছিল। অথচ বেহেশতের অধিবাসীগণ রাজন্যবর্গের ন্যায় নানাবিধ সুখ-সম্ভোগের মধ্যে নিরাপদ থাকবে। তারা যা-ই চাবে, তা-ই পাবে। তারা প্রত্যহ আরশের নিকটবর্তী থাকবে, মহান আল্লাহ্‌র দীদারে মত্ত থাকবে। এই দীদারে তা... এমন সুখ উপভোগ করবে, যার তুলনায় বেহেশতের যাবতীয় সম্পদ অতি নগন্য। চিরস্থায়ীভাবে এই নেয়ামত তারা ভোগ করবে ; এখানে বসবাস করবে। এই সুখ ও আনন্দ লোপ পাওয়ার বা কেউ তা ছিনিয়ে নেওয়ার কোনই আশংকা থাকবে না।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্‌ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

يُنَادِىْ مُنَادٍ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْا فَلَا تَسْقَمُوْا

اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوْتُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشِبُّوْا

فَلَا تَهْرَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوْا فَلَا تَبْأَسُوْا اَبَدًا

"জান্নাতবাসীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে সেদিন এক ঘোষক ঘোষণা করবে—হে বেহেশতবাসীগণ! তোমাদের কাংক্ষিত সেই মুহূর্ত এসে গেছে। এখন থেকে তোমরা কেবল সুস্থই থাকবে ; কোনদিন পীড়িত হবে না। তোমরা চিরকাল জীবিত থাকবে ; কোনদিন তোমাদের মৃত্যু হবে না। চিরকাল তোমাদের যৌবন থাকবে ; কোনদিন বৃদ্ধ হবে না ; চিরকাল বেহেশতের নাজ-নেয়ামত উপভোগ করবে ; কোনদিন দুঃখ-কষ্টে পতিত হবে না।"

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক এ বিষয়টি এভাবে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَنُوْدُوْا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

"আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে—এই বেহেশত তোমাদেরকে দান করা হলো তোমাদের কৃতকার্যের বিনিময়ে।" (আ'রাফ ঃ ৪৩)

তুমি যখনই জান্নাতের নাজ-নেয়ামত ও বিভিন্ন আবস্থা সম্পর্কে জানতে ইচ্ছা কর, তখন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও অধ্যয়ন কর ; তাতেই তুমি জান্নাতের বিবরণ পেয়ে যাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলার বয়ানের উপর আর কোন বয়ান হতে পারে না। 'সূরা রাহ্মান' (২৭ পারা)-এর আয়াত ৪৬ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত, 'সূরা ওয়াকেয়াহ' পূর্ণ এ ছাড়া আরও অন্যান্য সূরায় বেহেশতের বর্ণনা রয়েছে ; সেগুলো তেলাওয়াত কর এবং মর্ম হৃদয়ঙ্গম কর।

আলোচ্য ক্ষেত্রে জান্নাতের বিশদ বিবরণ সম্বলিত কিছু হাদীস পেশ করছি।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের আয়াত ঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ ع

("আর যে ব্যক্তি নিজের রব্বের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয় ভয়

করতে থাকে, তার জন্য (বেহেশতে) রয়েছে দু'টি উদ্যান।")

—এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ দু'টি জান্নাত হবে রৌপ্যের। এতদুভয়ের পাত্রসমূহ এবং যাকিছু এর মধ্যে হবে সবই হবে রৌপ্যের। আর দু'টি জান্নাত হবে স্বর্ণের। এতদুভয়ের পাত্রসমূহ এবং যাকিছু এর মধ্যে হবে সবই হবে স্বর্ণের। আদন জান্নাতের মধ্যে বেহেশতবাসী এবং প্রভু রব্বে তা'আলার মাঝখানে আল্লাহ্‌র বড়ত্বের চাদর ছাড়া আর কোন পর্দা হবে না। এভাবে তারা আল্লাহ্‌র যিয়ারতে ধন্য হবে।

এরপর জান্নাতের দরজাগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর—ইবাদত-বন্দেগীর নানাবিধ প্রকারের ন্যায় জান্নাতের দরজাসমূহের সংখ্যা প্রচুর, যেমন বিভিন্ন রকমের গুনাহের অনুযায়ী দোযখের দরজাসমূহের সংখ্যাও অনেক।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهٖ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دُعِيَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ كُلِّهَا وَلِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصِّيَامِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: وَاللّٰهِ مَا عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ ضَرُوْرَةٍ مِّنْ اَيِّهَا دُعِيَ فَهَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِّنْهَا كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ۔

"যে ব্যক্তি আপন সম্পদের অংশ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করবে, তাকে জান্নাতের প্রতিটি দরজা হতে আহ্বান করা হবে। আর জান্নাতের দরজা হচ্ছে আটটি। আর যে ব্যক্তি (বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সাথে) নামাযী হবে, তাকে

নামাযের দরজা হতে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করবে এবং দান-খয়রাত করবে, তাকে সদকা ও দান-খয়রাতের দরজা হতে ডাকা হবে। আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারীকে জিহাদের দরজা হতে ডাকা হবে। হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! প্রত্যেক দরজায় এমন লোক অবশ্যই হবে, যাকে সেই দরজা থেকে ডাকা হবে। কিন্তু এমন লোকও কি কেউ হবে, যাকে বেহেশতের সবগুলো দরজা থেকে ডাকা হবে? তিনি বললেন, হাঁ হবে ; এবং আমি আশা করি তুমি তাদের মধ্যে একজন হবে।"

হযরত আসেম ইব্‌নে যামরাহ (রহঃ) হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি জাহান্নামের ভয়াবহ অবস্থা ও ঘটনাবলী আমাদের সম্মুখে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বিবৃত সমস্ত কথা আমি স্মরণ রাখতে পারি নাই। এক পর্যায়ে তিনি জান্নাত সম্পর্কে এ আয়াতখানি তেলওয়াত করলেন ঃ

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۔

"আর যারা তাদের রব্বকে ভয় করতো, তাদেরকে দলে দলে বেহেশতের দিকে পরিচালিত করা হবে।" (যুমার ঃ ৭৩)

অতঃপর তিনি বললেন ঃ জান্নাতবাসীগণ জান্নাতের নিকটবর্তী এক স্থানে পৌছে দেখবে, একটি বৃক্ষ ; তার মূলদেশ হতে দু'টি প্রস্রবণ প্রবাহিত হচ্ছে। খোদায়ী নির্দেশক্রমে তারা একটি প্রস্রবণের দিকে অগ্রসর হবে। এ থেকে তারা পান করবে। ফলে, তাদের উদরে যে বেদনা বা দুঃখ-কষ্ট থাকবে, তা বিদুরীত হয়ে যাবে। অতঃপর তারা অপর প্রস্রবণটির নিকট পৌছে পাকী-পবিত্রতা অর্জন করবে। ফলে, তাদের সজীবতা ও লাবণ্য ফুটে উঠবে। এরপর তাদের কেশের আর কোনদিন পরিবর্তন হবে না। মস্তকের কেশ আর কোনদিন অবিন্যস্ত থাকবে না ; বরং সর্বদা তৈলমদিত অবস্থায় থাকবে। অতঃপর তাদেরকে বেহেশতে পৌছানো হবে। বেহেশতের দারোগা বলবে ঃ

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ٥

"তোমাদের প্রতি সালাম, তোমাদের জন্য সুসংবাদ ; তোমরা চিরকাল বেহেশতে বসবাস কর।"

অতঃপর তাদের নিকট অজানা স্থান হতে শিশু-কিশোররা আসবে। এসে তাদের চতুর্পার্শ্বে আনন্দের আতিশয্যে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে—যেমন দুনিয়াতে তারা প্রিয়জনের (মাতা-পিতার) চতুর্পার্শ্বে ঘুরতে থাকে। তারা বলতে থাকবে, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর ; আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই সম্মান ও পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। এই সন্তানদের মধ্য হতে একটি কিশোর কৃষ্ণ নয়নযুগলবিশিষ্টা হূরের নিকট গিয়ে বেহেশতী লোকের (দুনিয়াতে যে নামে ডাকা হতো সেই) নাম নিয়ে বলবে, অমুক ব্যক্তি এসেছে। হূর বলবে, তুমি কি তাকে দেখেছ? সে বলবে, আমি তাকে দেখেছি ; সে আমার পশ্চাতে আসছে। এ কথা শুনে সে আনন্দের আতিশয্যে লাফিয়ে উঠবে এবং তার অপেক্ষায় দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকবে। বেহেশতবাসী তার এই গৃহে প্রবেশ করে প্রাসাদের ভিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখবে যে, তা মোতি-মুক্তার উপর স্থাপন করা হয়েছে ; এর উপর রয়েছে লাল, সবুজ ও হলুদ বর্ণের মহামূল্য রত্ন-পাথর। আবার মস্তক উত্তোলন পূর্বক দেখতে পাবে প্রাসাদের ছাদ বিদ্যুতের ন্যায় (শুভ্র ও প্রচণ্ড চাকচিক্যময়)। যদি আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রতি দৃষ্টিপাত করার ক্ষমতা না দিতেন, তাহলে চোখের দৃষ্টি বিনাশ হয়ে যেতো। অতঃপর সে তার দৃষ্টি নত করে দেখবে—তার স্ত্রীগণ উপবিষ্ট। উঁচু উঁচু আসনসমূহ, নিবেশিত পানপাত্রসমূহ আর সারি সারি তাকিয়াসমূহ রয়েছে। তারপর সে হেলান দিয়ে বসে বলবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ

"একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে এই স্থানে পৌছিয়েছেন। আর আমরা (এখানে) কিছুতেই পৌছুতে পারতাম না, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে না পৌছাতেন।" (আ'রাফ ঃ ৪৩)

অতঃপর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে ঃ

تَحْيَوْنَ فَلاَ تَمُوْتُوْنَ اَبَدًا وَ تُقِيْمُوْنَ فَلاَ تَظْعَنُوْنَ اَبَدًا وَ
تَصِحُّوْنَ فَلاَ تَمْرَضُوْنَ اَبَدًا ـ

"তোমরা চিরকাল জীবিত থাকবে ; মৃত্যু কোনদিন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না। তোমরা চিরকাল বেহেশতে অবস্থান করবে ; কোনদিন বিদায় নিতে হবে না তোমাদের এ থেকে। তোমরা চিরকাল সুস্থ থাকবে ; অসুস্থ হবে না কখনও।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমি কেয়ামতের দিন জান্নাতের দরজার কাছে এসে তা খোলার জন্য বলবো, তখন বেহেশতের প্রহরী বলবে—আপনি কে? আমি বলবো, মুহাম্মদ। সে বলবে, আমাকে হুকুম করা হয়েছে যে, একমাত্র আপনি ভিন্ন আর কারও জন্যে যেন এই দরজা না খুলি।

এবার জান্নাতের বিভিন্ন কক্ষ এবং উচ্চতর মর্যাদাবলীর প্রতি লক্ষ্য কর—বস্তুতঃ আখেরাতের জীবনে যেসব মান-মর্যাদা ও পুরস্কার প্রদত্ত হবে, সেগুলোই আসল ও উচ্চতর মর্যাদা। পার্থিব মর্যাদার এগুলোর সাথে কোন তুলনাই হয় না। দুনিয়াতে যেরূপ ইবাদত-বন্দেগী ও উত্তম স্বভাব-চরিত্রের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে তারতম্য ও ব্যবধান রয়েছে, অনুরূপ আখেরাতে মান-মর্যাদা ও পুরস্কারপ্রাপ্তির ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে তারতম্য ও ব্যবধান থাকবে। প্রকৃতই যদি তুমি পরকালীন জীবনে উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী হতে চাও, তবে প্রচুর মেহনত-পরিশ্রম ও সিদ্ধি-সাধনায় ব্যাপৃত হও ; সর্ববিধ ইবাদত-বন্দেগীতে এরূপ আত্মনিয়োগ কর, যেন প্রতিযোগিতায় কেউ তোমাকে অতিক্রম করতে না পারে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বান্দাদেরকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

سَابِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ

"তোমরা তোমাদের রব্বের ক্ষমার দিকে অগ্রে ধাবিত হও।"

(হাদীদ ঃ ২১)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۝

"আর এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।"

(মুতাফফিফীন ঃ ২৬)

আশ্চর্যের বিষয় যে, দুনিয়ার এই জীবনে তোমার বন্ধু-বান্ধব, সমকালীন লোকজন কিংবা পাড়া-প্রতিবেশীর কেউ যদি টাকা-পয়সায় বা দালান-কোঠায় তোমার চেয়ে আগে বেড়ে যায়, তবে এতে তোমার ভারি কষ্ট অনুভব হয় এবং তোমার মন সংকীর্ণ হয়ে আসে। হিংসার দরুন তোমার জীবনধারণ দুর্বিসহ হয়ে উঠে। অথচ তোমার জন্য সর্বোত্তম পন্থা হলো এই যে, জান্নাতের ভিতর তুমি তোমার স্থায়ী ঠিকানা করে নিবে, যেখানে তুমি ঐসব লোক থেকে নিরাপদ থাকবে এবং গোটা দুনিয়ার বিনিময়ে তারা তোমাকে অতিক্রম করতে পারবে না।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন জান্নাতবাসীগণকে এরূপে দেখা যাবে, যেরূপে তোমরা দুনিয়াতে পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তে নক্ষত্র দেখে থাক। অন্যদের সাথে উচ্চ মর্যাদাশীল বেহেশতবাসীগণের এই তারতম্য হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ তো আম্বিয়ায়ে কেরামদের মর্যাদা ; এ পর্যন্ত তাঁরা ব্যতীত অন্য কেউ পৌঁছুতে পারবে না। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কসম সেই পবিত্র সত্তার, যার হাতে আমার জীবন-এমনও লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতিও ঈমান এনেছে (তাদের এ মর্যাদা লাভ হবে)।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন বেহেশতীগণকে নিম্নস্তরের বেহেশতীগণ এরূপ দেখবে, যেরূপ তোমরা আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখে থাক। তাদের মধ্যে আবূ বকর ও উমর (রাযিঃ)-ও হবেন ; এঁদের জন্য এ ছাড়া আরও বহু পুরস্কার রয়েছে।

হযরত জাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদেরকে বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে

বেহেশতের ঘরের বিবরণ শুনাবো? আমি বললাম, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ– আপনার জন্য আমাদের পিতা-মাতা কুরবান হউন। তিনি বললেন, জান্নাতে মহামূল্যবান রকমারি রত্ন ও জওহরাতে তৈরী বহু কক্ষ রয়েছে। (অনুপম স্বচ্ছতার কারণে) যেগুলোর বাইরে থেকে ভিতরটা এবং ভিতর থেকে বাইরেটা পরিষ্কার দেখা যাবে। এগুলোর মধ্যে এমন সব নেয়ামত, স্বাদের বস্তু ও আনন্দের বিষয়াবলী রয়েছে, যা মানুষ চোখে কোনদিন দেখে নাই, কানে কোনদিন শুনে নাই এবং অন্তরে কোনদিন কল্পনাও করে নাই। আমি আরজ করলাম—ইয়া রাসূলাল্লাহ! এসব ঘর কার জন্য? তিনি বললেন, সেই ব্যক্তির জন্যে যে সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটায়, খানা খাওয়ায়, সর্বদা রোযা রাখে এবং রাত্রিকালে যখন সকলে নিদ্রিত থাকে তখন নামায পড়ে। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এতো হিম্মত কার রয়েছে? তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যেই এ হিম্মত রয়েছে ; শোন বলছি—যে ব্যক্তি মুসলমান ভাইয়ের সাক্ষাতে সালাম দেয় সে সালাম ব্যাপক করলো, যে ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনকে এই পরিমাণ খাদ্য দেয় যে তারা তৃপ্ত হয়ে যায়, সে খানা খাওয়ানোর উপর আমল করলো, যে ব্যক্তি রমযান মাসে এবং প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখে, সে সর্বদা রোযা রাখলো, আর যে ব্যক্তি ইশা এবং ফজরের নামায জামাতের সহিত আদায় করে সে রাত্রিকালে মানুষ নিদ্রাভিভূত থাকা অবস্থায় নামায পড়লো।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআনের এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ

"আর উত্তম গৃহসমূহে দাখিল করবেন, যা সর্বদা অবস্থানের উদ্যানসমূহে হবে।" (ছফ্‌ফ ঃ ১২)

তিনি বলেছেন, এগুলো হচ্ছে মুক্তা নির্মিত মহলসমূহ। প্রতিটি মহলে লাল ইয়াকূত পাথরে নির্মিত সত্তরটি ঘর রয়েছে। প্রতিটি ঘরে সবুজ জমরদ (পান্না) পাথরের সত্তরটি কামরা রয়েছে। প্রতিটি কামরায় একটি করে

পালংক রয়েছে। প্রতিটি পালংকে সর্বপ্রকার রংয়ের সত্তরটি বিছানা রয়েছে। প্রতি বিছানায় একজন করে পরমা সুন্দরী জান্নাতী হূর রয়েছে। প্রত্যেক কামরায় সত্তরটি দস্তরখান রয়েছে। প্রত্যেক দস্তরখানের উপর সত্তর প্রকার খানা রয়েছে। প্রতিটি কামরায় সত্তরজন খাদেম রয়েছে। প্রতিদিন সকালে একজন মুমিনকে এতটুকু শক্তি দেওয়া হবে যে, সে উপরোক্ত সবকিছু করতে পারবে।

অধ্যায় ঃ ৭৩

ছবর, আল্লাহ্‌র বিধান ও ফয়সালায় সন্তুষ্টি ও অল্পে তুষ্টির বয়ান

আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা ও বিধানের উপর প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট থাকার নাম 'রেযা'। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে এই 'রেযা'র ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

"আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট।" (মায়েদাহ্ ঃ ১১৯)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ

"এহ্‌সানের প্রতিদান এহ্‌সান ব্যতীত আর কি হতে পারে? (আর কিছু নয়) (সূরা আর-রাহ্‌মান ঃ ৬০)

আল্লাহ্ তা'আলার বান্দার প্রতি এহ্‌সানের শেষ পর্যায় হলো, তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্ট হওয়া। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র এ সন্তুষ্টি আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা ও বিধানের প্রতি বান্দার প্রসন্নতার সওয়াব ও পুরস্কার।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط

"আর ওয়াদা দিয়েছেন সেই উত্তম বাসস্থানসমূহের যা চিরস্থায়ী উদ্যানসমূহে অবস্থিত হবে, আর আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত।" (তওবাহ ঃ ৭২)

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টিকে 'জান্নাতে আদ্ন'-এর চেয়েও উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যেমন অপর এক আয়াতে দেখা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর যিকিরকে নামাযের উপরে মর্যাদা দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

"নিশ্চয় নামায নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত রাখে ; আর আল্লাহ্র যিকিরই শ্রেষ্ঠতর বস্তু।" (আন্কাবূত ঃ ৪৫)

সুতরাং নামাযের ভিতর যে পবিত্র সত্তার যিকির করা হচ্ছে, তাঁর মুশাহাদা ও প্রত্যক্ষকরণ যেমন নামাযের চেয়েও বড় ও শ্রেষ্ঠতর, তেমনি রব্বে-জান্নাতের সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতাও জান্নাত অপেক্ষা বড় ও শ্রেষ্ঠতর। বরং এটাই জান্নাতবাসীদের চরম-পরম ও সর্বশেষ আশা-আকাংখা ও তৃপ্তি।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের জন্য (জান্নাতে দীদার দেওয়ার উদ্দেশ্যে) জ্যোতিষ্মান হবেন। তিনি বলবেন—হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা আমার কাছে চাও। তারা বলবে, আমরা আপনার সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতা চাই ; সর্বদা আপনি আমাদের প্রতি রাজী-খুশী থাকুন।"

আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভ হওয়ার পরও তাঁর সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতার জন্য আবেদন জানানো এ কথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতা বেহেশ্তের মধ্যে চরম ও পরম পর্যায়ের মহা নেয়ামত।

'আল্লাহ্র ফায়সালা ও বিধানের প্রতি বান্দার সন্তুষ্টি'-এর প্রকৃত স্বরূপ কি? এ সম্পর্কে পরবর্তীতে শীঘ্র আলোচনা হবে। আলোচ্য-ক্ষেত্রে 'বান্দার প্রতি আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতা'-এর হাকীকত ও স্বরূপের বিষয় অনেকটা 'বান্দার প্রতি আল্লাহ্র মহব্বত ও ভালবাসা'র স্বরূপের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। এছাড়া প্রকৃত গভীরতায় যে-তত্ত্ব ও হাকীকত রয়েছে, তা সাধারণ সমক্ষে তুলে ধরা যথার্থ পর্যায়ের যোগ্য বোধ-উপলব্ধির অভাবের দরুন অসমীচীন। আর সেই উচ্চ পর্যায়ের যাঁরা, তাঁরা নিজেরাই এ ব্যাপারে সামর্থবান ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ; তাই উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মোটকথা, 'দীদারে-এলাহী' অপেক্ষা উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর কোন নেয়ামত নাই ; বেহেশ্তীগণ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতার আবেদনও সেই 'দীদারে-এলাহী'র চিরস্থায়িত্বের জন্যেই করবে। যেন চরম প্রাপ্তির পর পরম তৃপ্তির জন্যই তাঁদের এই আরজি। তা-ও খোদ নেয়ামতদাতার নির্দেশক্রমেই তাদের এ আবেদন।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ۝

"আর আমার নিকট আরও অধিক রয়েছে।" (কাফ ঃ ৩৫)

কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, 'আরও অধিক' হচ্ছে এই যে, জান্নাত-বাসীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি পুরস্কারে ভূষিত করবেন ঃ—

এক. এমন একটি নেয়ামত দান করবেন, যা খোদ জান্নাতেও নাই। বিষয়টি এরূপ যেরূপ, আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

"কারও জানা নাই যে, এইরূপ লোকদের জন্য কতকিছু নয়ন জুড়ানো আসবাব যে গায়েবী ভাণ্ডারে মওজুদ রয়েছে।" (সেজদাহ ঃ ১৭)

দুই. স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন তাদেরকে সালাম পেশ করবেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

"তাদেরকে সালাম বলা হবে দয়াময় রব্বের পক্ষ হতে।"

(ইয়াসীন ঃ ৫৮)

তিন. আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিবেন ঃ আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এই তোহ্ফা ও পুরস্কার 'সালামের' তোহ্ফা হতে শ্রেষ্ঠতর হবে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ ۝

"আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত।" (তওবাহ্ ঃ ৭২)

অর্থাৎ বেহেশ্‌তের যাবতীয় নাজ-নেয়ামত, যা দিয়ে আজ তোমরা ধন্য, এসবই তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার রেযা ও সন্তুষ্টির ফল। আর আল্লাহ্‌র বিধান ও ফয়সালার প্রতি তোমাদের রেযা ও সন্তুষ্টির বিনিময়।

হাদীস শরীফে 'রেযা'র ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের এক জামাআতকে জিজ্ঞাসা করেছেন ঃ তোমরা কি? তাঁরা বল্‌লেন ঃ আমরা মুমিন। আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের ঈমানের চিহ্ন কি? তারা উত্তর করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা বিপদে ছবর করি, নেয়ামতে শোকর করি এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিধানে সন্তুষ্ট থাকি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রব্বে-কাবার কসম, বে-শক তোমরা মুমিন।" অন্য রেওয়ায়াতে শেষ অংশটুকু এভাবে বর্ণিত হয়েছে—এই সম্প্রদায়ের লোক হাকীম ও আলেম। পূর্ণ জ্ঞানের কারণে এদের অবস্থা নবীদের অবস্থার নিকটবর্তী।

বর্ণিত আছে—সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যে দ্বীন-ইসলামের প্রতি হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে অতঃপর প্রয়োজন-পরিমাণ রিযিকের উপর সে সন্তুষ্ট রয়েছে।

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ رَضِيَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى بِالْقَلِيْلِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْهُ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الْعَمَلِ۔

"যে ব্যক্তি অল্প রিযিকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট, আল্লাহ্ তা'আলাও তার প্রতি অল্প আমলে সন্তুষ্ট।"

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ تَعَالٰى عَبْدًا اِبْتَلَاهُ فَاِنْ صَبَرَ اِجْتَبَاهُ فَاِنْ رَضِىَ اِصْطَفَاهُ

"আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন তাকে দুঃখ-কষ্টে জড়িত করেন। এতে যদি সে ধৈর্যধারণ করে তবে তাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে নেন, আর যদি সে এ দুঃখ-কষ্টের উপর সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতা প্রকাশ করে তবে তাকে খাছভাবে নির্বাচন করে নেন।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের একদল লোককে আল্লাহ্ তা'আলা পাখীর ন্যায় পাখা ও পালক দান করবেন। এর উপর ভর করে তারা বেহেশ্‌তের মধ্যে উড়ে বেড়াবে। ফেরেশতাগণ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন ঃ আপনাদের পাপ-পুণ্যাদি ও আমলের হিসাব-নিকাশ হয়েছে কি? দাড়ি-পাল্লায় আপনাদের আমল ওজন করা হয়েছে কি? পুলসিরাত পার হয়ে এসেছেন কি? দোযখ দেখেছেন কি? উত্তরে তারা বলবে ঃ আমরা এসব বিষয়ের কোন কিছুই দেখতে পাই নাই। তখন ফেরেশ্‌তাগণ পুনরায় তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন ঃ আপনারা কোন্ নবীর উম্মত? তারা বলবে ঃ আমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। ফেরেশ্‌তাগণ বলবেন ঃ আমরা আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি— বলুন ; দুনিয়াতে আপনারা কি কি নেক আমল করেছেন, যার ফলে আজকে এমন সৌভাগ্য ও মর্যাদা লাভ হয়েছে? তারা বলবেন ঃ আমাদের মধ্যে দু'টি অভ্যাস ছিল— এক. আল্লাহ্র ভয় ও লজ্জায় আমরা নির্জন স্থানেও কোন পাপকার্যে লিপ্ত হতাম না। দুই. আল্লাহ্ তা'আলা যৎসামান্য রিযিক যা কিছু আমাদেরকে দান করতেন, আমরা তাতেই সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকতাম। একথা শুনে ফেরেশ্‌তাগণ বলবেন ঃ অবশ্যই এই সৌভাগ্য ও মর্যাদা আপনাদেরই প্রাপ্য।"

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ اَعْطُوا اللّٰهَ الرِّضَا مِنْ قُلُوبِكُمْ تَظْفَرُوا بِثَوَابِ فَقْرِكُمْ وَاِلَّا فَلَا۔

"হে দরিদ্র ও অভাবী লোক সকল! তোমরা অন্তর থেকে আল্লাহ্র উপর রাজী ও সন্তুষ্ট হয়ে যাও ; তাহলেই তোমরা এই দারিদ্র ও অভাবের বিনিময়ে নেকী পাবে। অন্যথায় বঞ্চিত থাকতে হবে।"

বনী ইসরাঈলের লোকেরা হযরত মূসা (আঃ)–কে বলেছিল ঃ আপনি আল্লাহ্ তা'আলাকে জিজ্ঞাসা করুন, কোন্ আমল করলে তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন? সেই আমলটি আমাদেরকে বলে দিলে আমরা তদনুযায়ী আমল করে আল্লাহ্র সন্তোষ ও প্রসন্নতা লাভ করতে পারি। মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তা'আলাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন, ওহী আসলো ঃ তোমরা আমার বিধানের উপর সন্তুষ্ট থাক, আমিও তোমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকবো।"

ছবর ঃ

ছবরের গুরুত্ব ও ফযীলত কুরআন মজীদে নব্বইয়েরও অধিক স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। ছবরকারী বা ধৈর্যধারণকারী ব্যক্তির জন্য উচ্চ মর্যাদা ও নেকীসমূহের ওয়াদা করা হয়েছে। এদের জন্য এমন এমন নেয়ামত ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, অন্য কারও জন্য এরূপ প্রতিশ্রুতি নাই। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ

"তাদের উপর তাদের রব্বের পক্ষ হতে বিশেষ বিশেষ করুণাসমূহ বর্ষিত হবে, এবং সেইসঙ্গে সাধারণ করুণাও হবে। আর তারাই এমন লোক যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে।" (বাক্বারাহ ঃ ১৫৭)

এ আয়াতে তিনটি নেয়ামতের কথা উল্লেখিত হয়েছে ঃ এক. হেদায়াত, দুই. সাধারণ রহমত, তিন. বিশেষ রহমত। এ সম্পর্কিত কুরআনের সমস্ত

আয়াত পেশ করতে গেলে দীর্ঘসূত্রিতার অবতারণা হবে, তাই আলোচ্য বিষয়ের উপর কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো ঃ

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "ছবর ঈমানের অর্ধেক।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যে সব নেয়ামত দান করেছেন, তন্মধ্যে 'ইয়াক্বীন' ও 'ছবর' অতি অল্প মাত্রায়ই দান করেছেন (অর্থাৎ অতি অল্পসংখ্যক লোককেই তা দিয়েছেন)। আর যাদেরকে এই অমূল্য দুইটি সম্পদ দান করেছেন, তাদের (নফল) রোযা, নামায যা অল্প মাত্রায় হয়েছে, সেজন্যে তাদের ভয় নাই। হে আমার সাহাবীগণ! তোমরা আজ যে অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যদি ছবর করে এই অবস্থার উপর টিকে থাকতে পার, তবে তোমাদের এই অবস্থা আমার নিকট এতো প্রিয় ও ভাল বলে বিবেচিত হবে যে, উক্ত অবস্থা থেকে ফিরে তোমাদের প্রত্যেকে তোমাদের সমষ্টিগতভাবে সকলের ইবাদতের সমান ইবাদত করলেও তা আমার নিকট প্রিয় হবে না। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে, আমার পরে তোমাদের সম্মুখে দুনিয়ার পথ প্রশস্ত হয়ে যাবে, ফলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হবে এবং আসমানবাসীগণ তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। অতএব, যে ব্যক্তি ছবর করবে এবং সওয়াবের আশায় থাকবে সে ব্যক্তি পূর্ণ সওয়াব প্রাপ্ত হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

"যা তোমাদের কাছে আছে, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে, পক্ষান্তরে যাকিছু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আছে তা অনন্তকাল স্থায়ী থাকবে। যারা ছবর করেছে, আমি তাদেরকে তাদের আমল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরস্কারে ভূষিত করবো।" (নাহ্ল ঃ ৯৬)

হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

তা কি? তিনি বলেছেন ঃ ঈমান হচ্ছে, ছবর ও উদারতা।

তিনি আরও বলেছেন ঃ "ছবর বেহেশতের রত্নভাণ্ডারসমূহের মধ্যে একটি রত্নভাণ্ডার।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ঈমান কি? তিনি বলেছেন ঃ "ঈমান হচ্ছে, ছবর করা।" হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসখানি এরূপ, যেরূপ তিনি হজ্জ সম্পর্কে বলেছেন ঃ "হজ্জ হচ্ছে, আরাফায় অবস্থান করা।" অর্থাৎ আরাফায় অবস্থান করা হজ্জের একটি বড় রুক্ন।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ مَا أُكْرِهَتْ عَلَيْهِ النُّفُوسُ۔

"শ্রেষ্ঠতর আমল হচ্ছে, যা আঞ্জাম দিতে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করতে হয় এবং কষ্ট সহ্য করতে হয়।"

বর্ণিত আছে যে, হযরত দাঊদ (আঃ)–এর প্রতি ওহী আসলো ঃ "হে দাঊদ! তুমি আমার (আল্লাহ্‌র) আখলাকের অনুকরণ কর ; আর আমার আখলাকের মধ্যে একটি হলো—আমি 'ছাবূর' অর্থাৎ অত্যন্ত ধৈর্যশীল।

হযরত আতা (রহঃ) হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আনসারী সাহাবায়ে কেরামের কয়েকজন লোককে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

أَمُؤْمِنُونَ أَنْتُمْ؟

অর্থাৎ "তোমরা কি মুমিন।"

এ কথা শুনে তারা সকলেই নিশ্চুপ রইল। হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন ঃ হাঁ—ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র রাসূল পুনরায় তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা যে মুমিন এর প্রমাণ কি? তদুত্তরে তাঁরা আরজ করলেন ঃ

نَشْكُرُ عَلَى الرَّخَاءِ وَنَصْبِرُ عَلَى الْبَلَاءِ وَنَرْضَى بِالْقَضَاءِ ۔

"আমরা আল্লাহ্-প্রদত্ত নেয়ামতের শোকরগুযারী করি, বিপদ-আপদে ছবর করি এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিধান ও ফয়সালার সন্তুষ্টি থাকি।"

এ কথা শুনে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

مُؤْمِنُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ -

"কাবা শরীফের রব্বের কসম, তোমরা পাকা মুমিন।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

فِي الصَّبْرِ عَلٰى مَا تَكْرَهُ خَيْرٌ كَثِيْرٌ

"মনের বিপরীত বিষয়ের উপর ধৈর্যধারণের মধ্যে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে।"

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ

اِنَّكُمْ لَا تُدْرِكُوْنَ مَا تُحِبُّوْنَ اِلَّا بِصَبْرِكُمْ عَلٰى مَا تَكْرَهُوْنَ

"যেসব বিষয়ে ধৈর্যধারণ কষ্টকর, সেসব বিষয়ে তোমরা ধৈর্যধারণ করতে না পারলে তোমাদের কাংক্ষিত ও সুখকর বিষয়েও তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে না।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, "ছবরকে যদি মানুষের আকার দেওয়া হতো, তবে সে অতিশয় দয়ালু হতো। আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।"

ছবর ও ধৈর্য সম্পর্কিত আরও বহু হাদীস ও উক্তি রয়েছে, আলোচনা দীর্ঘায়নের আশংকায় সেগুলো উল্লেখ করা হলো না।

অল্পেতুষ্টি ঃ

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

عَزَّ مَنْ قَنَعَ وَذَلَّ مَنْ طَمَعَ

"অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি মানুষের সম্মান পায়, আর লোভী ব্যক্তি অপদস্ত হয়।"

হাদীসে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لَا يَفْنٰى

'অল্পেতুষ্টি' আল্লাহ্‌র নেয়ামতের এমন ভাণ্ডার যার শেষ নাই।"

এ সম্পর্কিত আলোচনা ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার করা হয়েছে।

অধ্যায় ঃ ৭৪

তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব ও মর্যাদা

[তাওয়াক্কুল ঃ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝

"নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা (তাঁর উপর) তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন।" (আলে-ইমরান ঃ ১৫৯)

আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুলকারীর মর্যাদা অতি উচ্চ। স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে মহব্বত করেন ; ভালবাসেন, তিনি খোদ তাঁর হেফাযতের জিম্মাদারী গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা যার জিম্মাদার, মহব্বতকারী, সর্বাবস্থায় হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণকারী সে নিশ্চয়ই কৃতকার্য—তাঁকে শাস্তি দিবেন না, দূরে রাখবেন না, আড়াল করবেন না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্‌ পাক একদিন আমাকে স্বীয় নিদর্শনসমূহের কতকাংশ দেখালেন। আমি দেখতে পেলাম—পৃথিবীর সমস্ত পাহাড়-পর্বত, মাঠ-প্রান্তর, বন-জঙ্গল ও সমতল ভূমি আমার উম্মতে পরিপূর্ণ রয়েছে। উম্মতের সংখ্যাধিক্য দেখে আমি বিস্মিত ও আনন্দিত হলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ আপনি খুশী হলেন কি? আমি বললাম ঃ হাঁ, খুশী হয়েছি। আমাকে পুনরায় বলা হলোঃ আপনার উম্মতমণ্ডলীর মধ্যে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে কেউ আরজ করলেন ঃ যারা বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে, তারা কারা? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করলেন ঃ যারা মন্ত্র-তন্ত্রের ও শুভাশুভ লগ্নের এবং দেহ চিহ্নিতকরণের কার্যকারিতায় বিশ্বাস করে না এবং যারা আল্লাহ্‌ ছাড়া

অন্য কোন কিছুরই উপর ভরসা করে না। এ কথা শুনে হযরত উক্কাশাহ্ (রাযিঃ) দণ্ডায়মান হয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য দো'আ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাকেও সেই সত্তর হাজার লোকের দলভুক্ত করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই দো'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ্! উক্কাশাহ্‌কে উক্ত সত্তর হাজার লোকের মধ্যে স্থান দান করুন। এ দেখে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে আরেকজন সাহাবী দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্যেও এরূপ দো'আ করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ

"উক্কাশাহ্ এ ব্যাপারে তোমার উপর অগ্রাধিকার নিয়ে গেছে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا-

"তোমরা যদি আল্লাহ্‌র উপর সত্যিকার অর্থে ভরসা কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে পাখীদের ন্যায় (অজানিত স্থান থেকে) রিযিক দিবেন। পাখীরা প্রাতে খালি উদরে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পূর্ণ উদরে ঘরে ফিরে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنِ انْقَطَعَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ كَفَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى كُلَّ مَؤُوْنَةٍ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنِ انْقَطَعَ اِلَى الدُّنْيَا وَكَّلَهُ اللّٰهُ اِلَيْهَا-

"যে ব্যক্তি সবকিছু থেকে পৃথক হয়ে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে, তিনি তার সমস্ত কার্য নির্বাহ করে দেন এবং সর্ববিষয়ে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন, আর এমন স্থান হতে তার রিযিক সরবরাহ করেন যা কোন

সময় তার কল্পনায়ও আসে নাই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার বা দুনিয়ার কোন বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করে, আল্লাহ্ পাক তাকে দুনিয়ারই সোপর্দ করে দেন।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَكُوْنَ اَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا عِنْدَ اللّٰهِ اَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِىْ يَدَيْهِ۔

"যে ব্যক্তি সকল মানুষের অপেক্ষা অধিক স্বয়ংসম্পন্ন হতে চায়, সে যেন নিজ আয়ত্বে যা আছে, তা অপেক্ষা আল্লাহ্র নিকট যা আছে সেগুলোর উপর বেশী নির্ভর করে।"

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যখন তাঁর ঘরে উপবাস দেখা দিতো, তখন তিনি পরিবার-পরিজনকে বলতেন ঃ তোমরা নামাযে দাঁড়িয়ে যাও। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে হুকুম করেছেন ঃ

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا ۔

"আর আপনার সংশ্লিষ্টদেরকে নামাযের আদেশ করতে থাকুন এবং নিজেও এর পাবন্দ থাকুন ; আমি আপনার আপনার রিযিক চাই না।" (তোয়াহা ঃ ১৩২)

হাদীস শরীফে আছে, "যারা মন্ত্র-তন্ত্রের ও দেহ চিহ্নিতকরণের কার্যকারিতায় বিশ্বাস করে, তারা তাওয়াক্কুলকারীদের দলভুক্ত নয়।"

বর্ণিত আছে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে মিন্জানীকের (নিক্ষেপণ-যন্ত্র) সাহায্যে যখন অগ্নিকুণ্ডের দিকে নিক্ষিপ্ত করা হলো, তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) হাজির হয়ে তাঁকে বললেন ঃ আমি আপনাকে সাহায্য করার প্রয়োজন বোধ করেন কি? তিনি উত্তর করলেন ঃ আপনার সাহায্যের আমার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি পূর্বে 'হাসবিয়াল্লাহু ওয়া-নি'মাল-ওয়াকীল' বলে আল্লাহ্র উপর যে ভরসা করেছিলেন, সে কথার সত্যতা রক্ষার জন্যই তিনি এই উত্তর দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম

(আঃ)-এর প্রশংসায় বলেছেন ঃ

وَ اِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى ۝

"আর ইবরাহীম যিনি স্বীয় কথার সত্যতা রক্ষা করেছিলেন।"
(নাজম ঃ ৩৭)

হযরত দাঊদ (আঃ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা ওহী প্রেরণ করে বলেছেনঃ "হে দাঊদ! পৃথিবীর সকল আশ্রয় ত্যাগ করে যে বান্দা আমার আশ্রয় গ্রহণ করবে, আমি তার সমস্ত আপদ-বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট অবশ্যই লাঘব করবো—যদিও আসমান-যমীন প্রবঞ্চনা সহকারে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।"

হযরত সাঈদ ইব্‌নে জুবাইর (রাযিঃ) বলেন, একদা একটি বৃশ্চিক (বিচ্ছু) আমাকে দংশন করার পর আমার মাতা আমাকে কসম দিয়ে বললেন ঃ তুমি দষ্ট হাতটিতে ঐ ব্যক্তির (ওঝা) দ্বারা মন্ত্র পড়িয়ে নাও। আমি আমার সুস্থ হাতখানি তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। (কারণ ঐরূপ করা তাওয়াক্কুলের খেলাফ)

হযরত খাওয়াস (রহঃ) একদা কুরআন পাকের এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ۔

"সেই চিরঞ্জীব মহান সত্তার উপর ভরসা কর, যিনি মৃত্যুবরণ করবেন না।" (ফুরকান ঃ ৫৮)

অতঃপর তিনি বললেন ঃ এই আয়াতের পর বান্দার কিছুতেই সাজে না যে, আল্লাহ্ ছাড়া সে অন্য কারও উপর কোনদিন ভরসা করবে। জনৈক বুযুর্গকে স্বপ্নযোগে বলা হয়েছে ঃ "মনে রেখো, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করেছে, মূলতঃ সে নিজকে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ করেছে।"

এক বুযূর্গের নসীহত হচ্ছে, রিযিকের জামানত গ্রহণ করে এই দায়িত্ব যখন তোমার নিকট থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে, কাজেই এর পিছনে ব্যাপৃত হয়ে আল্লাহ্প্রদত্ত আসল ও অপরিহার্য দায়িত্বাবলী পালনের ব্যাপারে মোটেও গাফেল হয়ো না। অন্যথায় তোমার পরকাল তুমি নিজেই ধ্বংস করলে—

وَلَا تَنَالُ وَلَا تَنَالُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكَ.

আর এই জাগতিক বিষয়-সম্পত্তির মধ্য হতে তুমি কেবল ততটুকু অংশই পাবে, যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্নে মু'আয (রহঃ) বলেন ঃ "এ বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করা যায় যে, তলব ও অন্বেষা ব্যতিরেকেই বান্দা রিযিকপ্রাপ্ত হয় ; এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রিযিকের উপর হুকুম রয়েছে যে, সে যেন স্বয়ং বান্দাকে তালাশ করে।"

হযরত ইবরাহীম ইবেন আদহাম (রহঃ) কোন একজন সাধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ আপনার রিযিক কোথা থেকে আসে? তিনি বলেছেন ঃ আমি জানি না ; আমার প্রতিপালককে জিজ্ঞাসা করুন—তিনি কোথা থেকে আমার রিযিক প্রেরণ করেন।

হযরত হরম ইব্নে হাইয়্যান (রহঃ) একদিন হযরত উয়াইস ক্বরনী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমি কোন দেশে বসবাস করবো? তিনি বললেন ঃ তুমি শাম দেশে বসবাস কর। হযরত হরম পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সেখানে আমার রিযিকের কি ব্যবস্থা হবে? হযরত উয়াইস ক্বরনী (রহঃ) বললেন ঃ

أُفٍّ لِهٰذِهِ الْقُلُوْبِ خَالَطَهَا الشَّكُّ وَلَا يَنْفَعُهَا الْمَوْعِظَةُ.

"ঐসব হৃদয়ের প্রতি আক্ষেপ, যেসবে সংশয়-সন্দেহ বাসা বেঁধে নিয়েছে ; ফলে এখন আর নসীহত কোন কাজ করে না।"

এক বুযুর্গ বলেন ঃ "আমি আল্লাহ্র উপর রাজী হয়ে গেছি ; তিনিই আমার সবকিছুর নিয়ন্তা ; সবই তিনি সম্পাদনকারী— আমি সর্ববিধ কল্যাণের দিশা পেয়ে গেছি।" আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে তওফীক দান করুন।

অধ্যায় ঃ ৭৫

মসজিদের ফযীলত

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

"আল্লাহ্র মসজিদগুলো আবাদ করা তাদেরই কাজ যারা আল্লাহ্র প্রতি এবং কিয়ামত-দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করে।" (তওবাহ্ ঃ ১৮)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللّٰهُ لَهُ قَصْرًا فِى الْجَنَّةِ.

"যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, তা যদি ছোট পাখীর বাসার ন্যায়ও হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য বেহেশতে একটি প্রাসাদ তৈরী করবেন।"

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি মসজিদকে ভালবাসে, আল্লাহ্ পাক তাকে ভালবাসেন।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন বসার পূর্বে দু' রাকআত নামায পড়ে নেয়।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "মসজিদের প্রতিবেশীর (অর্থাৎ মসজিদের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তির) নামায মসজিদ ছাড়া অন্যত্র হয় না।" (অর্থাৎ বিনা উযরে মসজিদে না যাওয়া কঠিন গুনাহ্)

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামাযের স্থানে বসে, তখন ফেরেশতা তার জন্য এই বলে দো'আ করতে থাকে—

"হে আল্লাহ্, তার উপর তোমার বিশেষ রহমত বর্ষণ কর, দয়া কর, তুমি অনুগ্রহ করে তাকে ক্ষমা করে দাও।" যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ব্যক্তি উযূ অবস্থায় থাকে বা মুসাল্লায় (নামাযের স্থানে) অবস্থান করে ফেরেশতার দো'আ অব্যাহত থাকে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, "আখেরী যমানায় কিছু লোক এমন হবে, যারা বৃত্তাকারে মসজিদে বসে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলবে এবং দুনিয়ার প্রতি তারা আকৃষ্ট থাকবে, খবরদার! তোমরা তাদের নিকট বসো না ; তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার কোনরূপ সম্পর্ক নাই।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ ভূপৃষ্ঠে মসজিদসমূহ আমার ঘর, যারা এগুলো আবাদ করে রাখে তারা আমার যিয়ারতকারী। সুতরাং সুসংবাদ তাদের জন্য যারা নিজ গৃহে উযূ করে আমার গৃহে (মসজিদে) প্রবেশ করে এবং আমার যিয়ারত লাভ করে। আর যার যিয়ারত করা হয়, তার কর্তব্য, যিয়ারতকারীর সম্মান করা অর্থাৎ তার প্রতি দয়া করা এবং দো'আ কবূল করা)।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেনঃ "তোমরা যখন দেখ কোন ব্যক্তি মসজিদে উপস্থিত হয় এবং এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তখন তার ঈমানদার হওয়ার ব্যাপারে তোমরা সাক্ষ্য প্রদান করতে পার।"

হযরত সাঈদ ইব্নে মুসাইয়্যাব (রহঃ) বলেন ঃ মসজিদে অবস্থানরত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত ; সুতরাং সে যেন অসুন্দর কোন কথা না বলে।

বর্ণিত আছে,"মসজিদ দুনিয়াবী কথাবার্তা নেক আমলকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেমন চতুষ্পদ জন্তু (চারণভূমির) ঘাস শেষ করে দেয়।"

হযরত ইমাম নাখয়ী (রহঃ) বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের অভিমত ছিল, রাতের অন্ধকারে মসজিদে গমন করা এমন একটি আমল, যা গমনকারী ব্যক্তির জন্য জান্নাত অবশ্যম্ভাবী করে দেয়।"

হযরত আনাস ইব্নে মালেক (রাযিঃ) বলেন, "মসজিদে যে ব্যক্তি বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা করে, তার জন্য ফেরেশতাগণ এবং আল্লাহ্র আরশ

বহনকারীগণ দো'আ করতে থাকে ; যতদিন সেই বাতির আলো বিদ্যমান থাকে, ততদিন এই দো'আ চলতে থাকে।"

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, কোন নেক বান্দার যখন মৃত্যু হয়, তখন পৃথিবীর যে যে স্থানে সে নামায পড়েছিল এবং আসমানের যে যে স্থান দিয়ে তার নেক আমল উপরে উত্থিত হতো, সেই স্থানসমূহ তার জন্য ক্রন্দন করে। অতঃপর হযরত আলী এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ঃ

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ۝

"তাদের জন্য না আসমান ও যমীনের কান্না আসল, আর না তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হলো।" (দুখান ঃ ২৯)

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, পুণ্যবান ব্যক্তির মৃত্যুর পর যমীন তার জন্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত কাঁদতে থাকে।"

হযরত আতা খুরাসানী (রহঃ) বলেন, ভূপৃষ্ঠের যে কোন খণ্ডে কোন বান্দা যদি আল্লাহ্‌র জন্য একটি সেজদাও করে থাকে তবে সেই ভূখণ্ড তার জন্য কিয়ামতের ময়দানে সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং তার মৃত্যুর দিন সে ক্রন্দন করে থাকে।"

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, "যমীনের যে অংশের উপর নামায আদায় করা হয়, সে অংশটি তার আশেপাশের অন্যান্য ভূখণ্ডের উপর গর্ব করে এবং আল্লাহ্‌র যিকর ও ইবাদতের কারণে সে পুলক বোধ করে, এমনকি এই পুলক যমীনের সাত তবক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে আর নামায আদায়কারী ব্যক্তির জন্য যমীন সজ্জিত হয়।"

বর্ণিত আছে, কোন দল যখন কোন এলাকায় অবতরণ করে, তখন সেই এলাকার ভূখণ্ড তাদের নামায ও যিক্‌র-আযকারের দরুন আল্লাহ্‌র কাছে তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের জন্য দো'আ করে, পক্ষান্তরে যদি (ইবাদত-বন্দেগীতে) অবহেলা করা হয়,তবে তাদেরকে অভিশাপ দেয়।"

অধ্যায় ঃ ৭৬

রিয়াযত-মুজাহাদা ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বুযুর্গদের মর্যাদা

স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দার ভালাই ও মঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে স্বীয় দোষ-ত্রুটির উপর দৃষ্টি রাখার তওফীক দান করেন। যার দৃষ্টি প্রকৃতই গভীর, সে কখনও নিজের অন্যায়-অপরাধ ও দোষ-ত্রুটির বিষয়ে অচেতন থাকতে পারে না। বস্তুতঃ স্বীয় নফস ও প্রবৃত্তির এলাজ-প্রতিকার তখনই সম্ভব, যখন সংশ্লিষ্ট রোগ-ব্যাধি সম্পর্কেও সচেতন থাকা হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অধিকাংশ লোকই নিজের আয়ের ও দোষ-ত্রুটির বিষয়ে এমন গাফেল যে, অন্যের চোখের সামান্য একটি কণাও দৃষ্টিগোচর হয় ; কিন্তু নিজের চোখের শাতীর বা বৃক্ষকাণ্ডটিও দেখা যায় না।

যে ব্যক্তি নিজের রোগ-দোষ সম্পর্কে অবগত হওয়ার আগ্রহ রাখে, তার উচিত নিম্নোক্ত চার পদ্ধতির অনুশীলন করা ঃ

এক—কুরআন ও হাদীসের অনুসারী, নফসের রোগ-দোষ ও এতদ-সম্পর্কিত যাবতীয় ও সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে বিজ্ঞ-পরিপক্ক খাঁটী বুযুর্গের সান্নিধ্য অবলম্বন করবে। তিনি নফসের দোষ ও রোগ-ব্যাধি নির্ণয় করতঃ এর যথাযোগ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। সে ব্যক্তির কর্তব্য হবে—পূর্ণ আনুগত্য ও ভক্তি সহকারে আধ্যাত্মিক মুরুব্বীর নির্দেশিত পথে রিয়াযত-মুজাহাদা ও সাধনায় ব্রতী হওয়া। শায়খ ও মুরীদ এবং উস্তায ও শাগরেদের মধ্যে এরূপ সম্পর্কই হওয়া উচিত যে, শায়খ ও উস্তায নফ্সের রোগ ও দোষসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলোর প্রতিকার বিধান করবেন আর মুরীদ ও শাগরেদ মনোযোগ সহকারে সিদ্ধি-সাধনায় ব্যাপৃত হবে। কিন্তু বর্তমান যুগে এসব বিষয়ের অস্তিত্ব একেবারেই নগণ্য।

দুই—নফসের রোগ নির্ণয় করতে হলে কোন মঙ্গলকামী খাঁটী সত্যবাদী অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্রহণ করে নিবে। তাকে নিজের সর্ববিধ অবস্থার উপর কড়া দৃষ্টিসম্পন্ন পর্যপেক্ষক বানিয়ে নিবে। সে তোমার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ যাবতীয় দোষক্রটি সম্পর্কে তোমাকে সতর্ক করবে। জ্ঞানী-গুণী বুযুর্গানে দ্বীনের এটাই ছিল এ সম্পর্কীয় পদ্ধতি।

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে আমার দোষ-ক্রটি আমাকে বলে দেয়। তিনি হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করতেন ঃ আপনার দৃষ্টিতে আমার মধ্যে কি কি দোষ রয়েছে? তিনি বলতেন ঃ কে আপনাকে এরূপ বিষয় বলার সাহস করবে? হযরত উমর বারবার অনুরোধ করার পর তিনি বললেন ঃ আমি জানতে পেরেছি—আপনার দস্তরখানে দুই পদের তরকারী হয়, আপনার দুই জোড়া পোষাক রয়েছে ; এক জোড়া দিবসের আরেক জোড়া রাতের। তিনি পুনরায় অনুরোধ করলেন—আমার আরও কোন দোষ বলুন। হযরত সালমান বললেন ঃ আর জানা নাই। হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন ঃ যে দু'টি বলেছেন সে দু'টিও আমার যথেষ্ট অপরাধ।

তিনি হযরত হুযাইফাহ্ (রাযিঃ)-কে সময় সময় জিজ্ঞাসা করতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার নিকট মুনাফেকদের সম্পর্কে গোপন তথ্য বলতেন ; আমার মধ্যে কি আপনি নেফাকের কোন আলামত লক্ষ্য করুন? এতো প্রতাপশালী ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হযরত উমর (রাযিঃ)-এর মধ্যে আল্লাহ্র ভয় কি পর্যায়ে ছিল যে, নিজের নফসের বিষয়ে মোটেই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বস্তুতঃ জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেনতা যার পরিপূর্ণতা লাভ করে তার মধ্যে কখনও অহংকার ও আত্মম্ভরিতা স্থান পেতে পারে না ; প্রতি মুহূর্তে সে নফসের চুলচেরা হিসাব নিতে থাকে। কিন্তু আজকের যুগে এরূপ লোকের অস্তিত্ব একেবারেই নগণ্য। সেইসঙ্গে এরূপ দোস্ত-আহবাব ও বন্ধু-বান্ধবেরও অভাব যারা দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ খাতির ও শৈথিল্য না করে প্রকৃত হিতাকাংখী হয়ে তোমার দোষ-ক্রটি তোমাকে ব্যক্ত করবে কিংবা অন্ততঃপক্ষে বিদ্বেষমুক্ত মন-মানসিকতা নিয়ে স্বীয় ওয়াজিব দায়িত্বটুকু আদায় করবে। বরং বাস্তবে যা দেখা যায়, তা হচ্ছে—অধিকাংশই আজকাল হিংসা-বিদ্বেষের শিকার

হয়ে রয়েছে। অথবা স্বার্থের মোহান্ধতায় এমন লিপ্ত রয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে যা দোষ নয়, সেটাকে দোষ বলে ব্যক্ত করছে, কিংবা এমন শিথিলতা অবলম্বন করছে যে, যা প্রকৃতই দোষ, সেটাকে দোষ বলে অভিহিত করছে না। এ জন্যেই হযরত দাঊদ তাঈ (রহঃ) লোকজন থেকে পৃথক হয়ে থাকতেন। একদা কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ আপনি জনমনুষ্যের সংশ্রবে থাকেন না কেন? তিনি বলেছেন ঃ

وَمَاذَا اَصْنَعُ بِاَقْوَامٍ يُخْفُوْنَ عَنِّيْ عُيُوْبِيْ

"যারা আমার দোষ-ক্রটি গোপন করে রাখে ; সংশোধনের নিমিত্ত আমার নিকট ব্যক্ত করে না তাদের সংশ্রব দিয়ে আমার কি লাভ?"

বুঝা গেল, আল্লাহ্‌র ওলীগণ মনে-প্রাণে চাইতেন, তাঁদের দোষ-ক্রটি ব্যক্ত করে তাদেরকে যেন সতর্ক করা হয়। কিন্তু আমাদের অবস্থা তো এই যে, যে ব্যক্তি আমাদেরকে সদুপদেশ প্রদান করে ; আমাদের দোষ-ক্রটি ধরিয়ে দেয়, তাকে আমরা শত্রু মনে করি ; সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি বলে সাব্যস্ত করি। চিন্তার বিষয়—আমাদের এহেন দুরবস্থা ঈমানের নিম্নতম পর্যায়কেও অতিক্রম করে একেবারে ধ্বংসন্মুখ না করে। কেননা, মন্দ স্বভাব মূলতঃ ধ্বংসাত্মক সর্প ও বৃশ্চিকের ন্যায় ; যদি কেউ বলে, তোমার পোষাকের ভিতর একটি বৃশ্চিক বা সর্প রয়েছে, তবে এই সতর্কীকরণের জন্য আমরা তার শোকরগুযার হই এবং তৎক্ষণাৎ তা দূর করতে উঠে-পড়ে সচেষ্ট হই ; সেটাকে হত্যা না করা পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলি না। পরিশেষে আনন্দ বোধ করি যে, সর্প বা বিচ্ছু থেকে বেঁচে গেছি। অথচ এই সর্প বা বিচ্ছুর ক্ষতি আমাদের ইহজাগতিক দেহ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ; এক-দু'দিন পর তা নিরাময়ও হয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে, মন্দ স্বভাব ও দুশ্চরিত্রাবলীর ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া মানুষের অন্তঃকরণকেও ধ্বংস করে দেয় এবং প্রবল আশংকা থাকে যে, মৃত্যুর পর তা চিরকাল থেকে যাবে। এতদসত্ত্বেও আমরা আমাদের দোষ-ক্রটি ও দুশ্চরিত্রাবলীর সর্প-বিচ্ছু সম্পর্কে সতর্ককারীদের শোকরগুযার হইনা ; এসব মন্দ স্বভাব দূরীকরণে সচেষ্ট হই না। উপরন্তু হিতাকাংখী উপদেশ দাতার সাথে শত্রুতামূলক আচরণ করে বলি, আপনিও তো অমুক অপরাধ ও অন্যায় কাজ করে থাকেন। এহেন আচরণের অনিবার্য

পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, এরূপ ব্যক্তি পাপাচারে আরও অধিক মাত্রায় বল্গাহীন হয়ে উঠে। বস্তুতঃ এর মূল কারণই হচ্ছে ঈমানের মারাত্মক দুর্বলতা। আয় আল্লাহ্! আমাদেরকে সরল–সোজা পথে কায়েম রাখ, সত্যিকার সঠিক বোধ ও জ্ঞানশক্তি দান কর, নেকী ও পুণ্যের কাজে মশগুল রাখ এবং যারা আমাদের ভুল–ভ্রান্তি ও দোষ–ত্রুটি ধরিয়ে দেয় তাদের শোকরগুযার হয়ে সে অনুযায়ী আমলে তৎপর হওয়ার তওফীক দান কর।

তিন—শত্রুর মুখে তুমি তোমার দোষ–ত্রুটি জেনে নাও। কেননা, অসন্তুষ্টি ও অপছন্দনীয়তার কারণে শত্রুর মুখ থেকে তোমার যে সমালোচনা হবে, তা সেই বন্ধুর তুলনায় বেশী উপকারী হবে যে বন্ধু নির্লিপ্ততা ও দ্বীনের ব্যাপারে শৈথিল্যের কারণে তোমার দোষ–ত্রুটি গোপন রাখে। কিন্তু আফসূস যে, মানুষের স্বভাবই হচ্ছে, সর্বক্ষেত্রে দুশমনকে অবিশ্বাস করা ; ফলে নিজের দোষ–ত্রুটির ব্যাপারেও তাকে অবিশ্বাস করা হয়। মনে করা হয়, হিংসার বশবর্তী হয়েই সে আমার সমালোচনা ও দোষ–ত্রুটি প্রকাশ করছে। অথচ প্রকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি শত্রুর বক্তব্য থেকে আত্মসংশোধনের উপকরণ গ্রহণ করে থাকে।

চার—সাধারণ লোকজনের সাথে মিলেমিশে থাকবে। তাদের যেসব কাজ–কর্ম ও আচার–ব্যবহার তোমার অপছন্দ হয়, সেগুলো দিয়েই তুমি তোমার প্রবৃত্তির বিচার করবে। কারণ, মুমিন মুমিনের জন্য আয়নাস্বরূপ। কাজেই যেসব দোষ–ত্রুটি তোমার দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে ধরা পড়েছে, সেগুলো তোমার মধ্যেও আছে। কেননা, প্রকৃতিগতভাবে মানুষের পরস্পর সামঞ্জস্য রয়েছে এবং তারা একে অপরের কাছাকাছি। সুতরাং সমকালীন লোকদের কারও মধ্যে কোন দোষ থাকলে অপর জনের মধ্যে সেটির মূল উপাদান, কিংবা অধিক পরিমাণ অথবা কিছু না কিছু থাকবে। অতএব, এ দর্পণ–প্রক্রিয়া অবলম্বন করতঃ নিজের নফ্সের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে এবং দোষ–ত্রুটি হতে নিজকে সংশোধন ও পবিত্র করার চেষ্টা করবে। বস্তুতই যদি চরিত্র সংশোধন ও সজ্জিত করার জন্য এ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়, তবে দীক্ষাদাতা ছাড়াই শিষ্টাচার শিক্ষা করা যায়।

জেনে রাখ ; অতি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করে নাও যে, উপরোল্লিখিত বিষয়াবলীর গভীরে তুমি যদি সত্যিকার অর্থে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে চিন্তা

কর, তাহলে তোমার অর্ন্তদৃষ্টি খুলে যাবে এবং ইল্‌ম ও এক্বীনের নূর দ্বারা তোমার অন্তর উদ্ভাসিত হবে। ফলে, নফ্‌সের রোগ-দোষ ও চিকিৎসা-প্রতিকারের সকল পথ ও পন্থা সম্পর্কে তুমি সুস্থ ও সঠিক জ্ঞান লাভ করবে। আর যদি তুমি উক্ত পর্যায়ে পৌছতে সক্ষম না হও, তবে অন্ততঃপক্ষে যোগ্য ও অনুকরণীয় ব্যক্তির আনুগত্য ও অনুসরণের মাধ্যমে ঈমান ও এক্বীনকে আঁকড়ে ধরে রাখ। কারণ, পূর্বোক্ত ইল্‌মের স্থান হচ্ছে, ঈমান ও এক্বীনের পর এবং তা পরেই অর্জিত হওয়ার বস্তু। আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন ঃ

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি করবেন যাদেরকে ইল্‌ম দেওয়া হয়েছে।" (মুজাদালাহ ঃ ১১)

সুতরাং যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে নিলো তথা এ কথার উপর ঈমান আনয়ন করলো যে, নফ্‌স ও প্রবৃত্তির বিরোধিতাই খোদাপ্রাপ্তির একমাত্র পথ, এ বিশ্বাসের পর সে উপরোক্ত তথ্যাবলীর (বিস্তৃত) ইল্‌ম অর্জনে অপারগ রইল, সে ঈমানদারগণের মধ্যেই পরিগণিত। আর যে ব্যক্তি পরবর্তী বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হলো, সে (ঈমানাদর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে) ইল্‌মপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য। আল্লাহ তা'আলা এতদুভয়ের জন্যেই মঙ্গলের ওয়াদা করেছেন।

ঈমানের তাকীদে মুমিনের উপর যেসব করণীয় ও বর্জনীয় কার্যসমূহ অর্পিত হয়, সেইসবের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে অসংখ্য আয়াত উল্লেখিত হয়েছে। এমনিভাবে, বুযুর্গানে দ্বীনের উক্তিসমূহও রয়েছে এ ব্যাপারে প্রচুর।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۙ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ۙ

"যারা আত্মাকে প্রবৃত্তি হতে নিবৃত্ত রেখেছে, নিশ্চয় বেহেশতই তাদের বাসস্থান।" (নাযি'আত ঃ ৪০, ৪১)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى ط

"তারা সেইসমস্ত লোক, যাদের অন্তরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাকওয়া'র জন্য বিশুদ্ধ করেছেন।" (হুজুরাত ঃ ৩)

এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তাদের অন্তর থেকে পার্থিব সাধ-অভিলাষ ও লোভ-লালসার প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করে দেওয়া হয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "মুমিন ব্যক্তি পঞ্চবিধ কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে ঃ এক. অন্যান্য মুমিন তার প্রতি ঈর্ষা করে। দুই. মুনাফিক তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। তিন. কাফের তার সাথে যুদ্ধ করে। চার. শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। পাঁচ. নফ্স তার সাথে ঝগড়া ও মোকাবেলা করে।" নফ্স ও প্রবৃত্তি যে বস্তুতই মুমিনের শত্রু, তা এ হাদীস থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল। কারণ, এই নফ্স তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য সবসময়ই ঝগড়া, মোকাবেলা ও চেষ্টা করতে থাকে। কাজেই নফ্সের বিরুদ্ধে জেহাদ করা এক অপরিহার্য কর্তব্য।

বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট আল্লাহ্ তা'আলা ওহী পাঠিয়েছেন ঃ হে দাউদ! নফ্স ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিজে আত্মরক্ষা কর এবং তোমার সহচরবৃন্দকেও তা থেকে সতর্ক কর। কারণ, যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ ও পার্থিব সাধ-অভিলাষে মত্ত, তাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়, ফলে তারা আমার মা'রেফাত ও পরিচয় থেকে বঞ্চিত থাকে।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, "সুসংবাদ তাদের জন্য, যারা অদৃশ্য-গায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্র ওয়াদাসমূহকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষিত পার্থিব সাধ-অভিলাষ ত্যাগ করেছে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ করে প্রত্যাবর্তনকারী

একটি দলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ "তোমরা ছোট জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে বড় জিহাদের দিকে আসলে। আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বড় জিহাদ কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ বড় জিহাদ হচ্ছে, নিজের নফ্‌সের সঙ্গে জিহাদ করা।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "প্রকৃত মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও হুকুম পালনে স্বীয় নফ্‌সের বিরোধিতা করতে পারে।"

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ "নফসের বিরোধিতার চাইতে কঠিন কিছু আমি অনুভব করি নাই ; কখনও সে আমার উপর বিজয়ী হয়ে যায়, আর কখনও আমি।"

হযরত আবুল আব্বাস মাওসেলী (রহঃ) স্বীয় নফসকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ "তুই রাজপুতদের সাথে মিশে দুনিয়া উপার্জনেও মনোযোগী হস্‌ না কিংবা নেক বান্দাদের সাথে মিশে আখেরাতের কাজেও মনোযোগী হস না ; আমি তোকে নিয়ে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে ঝুলছি; তোর শরম আসা উচিত।"

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেছেন ঃ "নফ্‌সের চেয়ে মারাত্মক অবাধ্য জানোয়ার আমি আর দেখি নাই ; এটাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য শক্ত লাগামের প্রয়োজন।"

হযরত ইয়াহয়া ইব্‌নে মুআয রাযী (রহঃ) বলেন ঃ কৃচ্ছ্র–সাধনার তরবারী দ্বারা নফ্‌সের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাও। এ সাধনা চার রকমে হতে পারে ঃ এক. খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দাও। দুই. নিদ্রা কমিয়ে দাও। তিন. প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কথাই বলো না। চার. মানুষের কষ্টদায়ক আচরণ সহ্য কর। খাদ্য কমিয়ে দিলে লোভ–লালসা ও অভিলাষ–রিপুর মৃত্যু ঘটে। নিদ্রা কমিয়ে দিলে চিন্তা–চেতনা স্বচ্ছ ও পবিত্র হয়। কথা–বার্তা কম করলে বিপদ–আপদ থেকে নিরাপদে থাকা যায়.। মানুষের দুর্ব্যবহার ও কষ্টদায়ক আচরণে ধৈর্য ধারণ করলে নিজের অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। নিষ্ঠুর ও কষ্টদায়ক আচরণে ধৈর্য ধারণ করা বস্তুতই বড় সাধনা।

মানব–প্রবৃত্তি একদিকে যদি স্বেচ্ছাচারে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাপাচারে লিপ্ত হতে উদ্যত হয়, তাহলে অপর দিকে খাদ্যের কমতি তাকে রক্ষা করার জন্য তাহাজ্জুদ নামায অপেক্ষা অধিকতর ধারালো তরবারীর কাজ করে। নিদ্রার

স্বল্পতা ও নিয়ন্ত্রণ মানুষকে নির্জনতা অবলম্বনে অভ্যস্ত করে তোলে। কথা-বার্তা কমিয়ে দিলে মানুষ উৎপীড়ন ও প্রতিশোধ থেকে নিস্কৃতি পায়। ফলে নফস ও প্রবৃত্তির ক্ষতি সাধন থেকেও তুমি বেঁচে থাকবে। পাপাচারের ঘোর অন্ধকারও তোমাকে আচ্ছন্ন করতে পারবে না। এভাবে নফ্সের ধ্বংসাত্মকতা থেকে তুমি রেহাই পেয়ে যাবে। এর শুভ পরিণাম এই হবে যে, তোমার এই নফ্স জ্যোতির্ময়, স্বচ্ছ ও আধ্যাত্মিকতায় প্রভাবিত হবে, নেক আমল ও ইবাদতের পথে চলমান হবে ; যেমন তীব্র গতিসম্পন্ন ঘোড়া ময়দানে দৌড়ায় এবং বাদশাহ বাগানে ভ্রমণ করে।"

ইয়াহ্য়া ইব্নে মুআয রাযী (রহঃ) আরও বলেছেন ঃ "মানুষের শত্রু তিনটি ঃ দুনিয়া, শয়তান ও নফ্স। ঘৃণা ও অনাসক্তির মাধ্যমে দুনিয়া থেকে, বিরোধিতা করে শয়তান থেকে এবং ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনা ও ভোগ-বিলাস পরিহার করে নফ্স থেকে আত্মরক্ষা কর।"

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানীর উক্তি হচ্ছে, "প্রবৃত্তি যার উপর প্রভাব বিস্তার করে, প্রকৃতপক্ষে সে লোভ-লালসা ও সীমাতিরিক্ত কামনা-বাসনার শিকার হয়ে যায়। তার নিজের নিয়ন্ত্রণে তখন আর কিছুই থাকে না ; ভীত অপদস্ত হয়ে সে প্রবৃত্তির হাতে বন্দী হয় ; লাগাম ধরে প্রবৃত্তি তাকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে ঘুরায়। সর্বতোভাবে তার অন্তর নেককার্যসমূহ হতে বঞ্চিত হয়ে যায়।"

হযরত জাফর ইব্নে হুমাইদ (রহঃ) বলেন ঃ সকল জ্ঞানী-গুণী লোকেরা এ ব্যাপারে একমত যে, নেয়ামত পাওয়া যাবে নেয়ামত বর্জনে। এ ছাড়া আর কোন উপায় নাই। অর্থাৎ পার্থিব ভোগ-বিলাস ত্যাগ করলেই আখেরাতের নায-নেয়ামত হাসিল হবে।

হযরত আবূ ইয়াহ্য়া ওয়ার্রাক (রহঃ) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আপন প্রবৃত্তির অনুকূলে অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গাদির খাহেশ মিটিয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজ অন্তরে লজ্জা ও অপমানের বৃক্ষ রোপণ করেছে।"

হযরত ওহাইব ইব্নে ওয়ার্দ (রহঃ) বলেন ঃ "রুটির অতিরিক্ত আর সবই প্রবৃত্তিপরায়ণতা।"

তিনি আরও বলেছেন ঃ "যারা পার্থিব লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে গেছে তারা যেন যিল্লত ও অপমানের জন্য প্রস্তুত থাকে।"

বর্ণিত আছে, হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন খাদ্য-সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োজিত হয়ে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে বার হাজার সর্দারকে সাথে নিয়ে বের হয়েছিলেন, তখন মিসরীয় আযীযের (বাদশাহ) স্ত্রী বলেছিলেন ঃ "পবিত্র সেই মহান সত্তা, যিনি পাপাচারের কারণে বাদশাহদেরকে গোলামে পরিণত করেছেন আর ইবাদত-বন্দেগী ও রিয়াযত-মোজাহাদার ফলশ্রুতিতে গোলামদেরকে বাদশাহ্ বানিয়েছেন। বস্তুতঃই লোভ-লালসা ও প্রবৃত্তি পরায়ণতাই বাদশাহদেরকে গোলামী পর্যন্ত পৌছিয়েছে আর সীমালংঘনকারীদের এটাই সাজা। পক্ষান্তরে ধৈর্য ও খোদাভীতি গোলামদেরকে বাদশাহী পর্যন্ত পৌছিয়েছে। হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেন, যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

"বাস্তবিক যে ব্যক্তি গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে এবং ছবর অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তা'আলা এমন নেক্কার লোকদের কর্মফলকে বিনষ্ট করেন না।" (ইউসুফ ঃ ৯০)

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেছেন ঃ "এক রাতে আমি খুবই বিব্রত বোধ করছিলাম—যিকির-আযকারে মশগুল হলাম ; কিন্তু এতে আমি সেই স্বাদ ও স্বস্তি অনুভব করি নাই যা অন্য সময় হতো। নিদ্রা যাওয়ার ইচ্ছা করে শয্যা গ্রহণ করলাম। কিন্তু তা-ও সম্ভব হলো না। অতঃপর উঠে বসে পড়লাম ; কিন্তু তখন আমার বসার শক্তিও ছিল না। অবশেষে ঘর থেকে বের হয়ে দেখলাম—এক ব্যক্তি গায়ের উপর চুগা (পোষাক বিশেষ) জড়িয়ে পথের মাঝখানে পড়ে রয়েছে। সে আমার আগমন অনুভব করে বললো ঃ হে আবুল কাসেম (হযরত জুনাইদের উপনাম)! তুমি জলদি এদিকে আস। আমি বললাম, হে আমার সর্দার! আপনি কোন প্রতিশ্রুতি ছাড়াই এসে গেলেন? তিনি বললেন, হাঁ, আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করেছিলাম, আমার জন্য তোমার অন্তরকে যেন উদ্বেলিত করেন। আমি বললাম, ঠিক তাই হয়েছে ; এখন বলুন, আপনার প্রয়োজন কি? তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ নফ্সের রোগের চিকিৎসা হয় কখন? আমি বললাম ঃ "যখন নফ্স তার সাধ-অভিলাষ ও বাসনার বিপরীত চলে।" একথা শুনে তিনি

স্বীয় নফ্‌সকে সম্বোধন করে বললেন ঃ ওহে নফ্‌স! শুনে রাখ ; এই একই জওয়াব আমি তোকে সাত বার দিয়েছি ; কিন্তু তুই হযরত জুনাইদ ব্যতীত অন্য কারও জওয়াব শুনতে রাজী নস, এখন তো তুই তার কাছেও সেই জওয়াবই পেলি। এ কথা বলে তিনি চলে গেলেন ; আমি তাকে চিনতে পেলাম না।

হযরত ইয়াযীদ রাক্কাশী (রহঃ) বলেন ঃ

اِلَيْكُمْ عَنِّى الْمَاءَ الْبَارِدَ فِى الدُّنْيَا لَعَلِّى لَا اُحْرِمُهُ فِى الْاٰخِرَةِ

"তোমরা দুনিয়াতে ঠাণ্ডা পানি আমা থেকে দূরে সরিয়ে রাখ, যাতে আখেরাতে আমি এ থেকে বঞ্চিত না হই।"

এক ব্যক্তি হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ)–কে জিজ্ঞাসা করেছিল, কথা বলার সময় কোন্‌টি? তিনি বলেছেন, যখন তোমার চুপ থাকতে মনে (প্রবৃত্তি) চায়। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলো ; চুপ থাকার সময় কোন্‌টি? তিনি বলেছেন ঃ যখন তোমার কথা বলতে মনে চায়।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে চায়, সে যেন দুনিয়াতে প্রবৃত্তির লোভ–লালসা ও আশা–আকাংক্ষা বর্জন করে চলে।"

অধ্যায় ঃ ৭৭

ঈমান ও নেফাকের বর্ণনা

[নেফাক ঃ ঈমানের ছদ্মাবরণে কুফ্‌র]

পরিপূর্ণ ঈমান হচ্ছে— খাঁটী দেলে আল্লাহ্ তা'আলা, তওহীদ ও একত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনয়ন করা দ্বীনের উপর একীন ও তদনুযায়ী আমল করা।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَ
جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

"পূর্ণ মুমিন তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, অতঃপর তাতে কোন সন্দেহ করে নাই, অধিকন্তু স্বীয় ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহ্ পথে (দ্বীনের জন্য) শ্রম স্বীকার করেছে ; তাঁরাই সত্যবাদী।" (হুজুরাত ঃ ১৫)

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَ
الْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۚ

"বরং পুণ্য তো এই যে, কোন্ ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাব এবং নবীগণের প্রতি।" (বাকারাহ্ ঃ ১৭৭)

উক্ত আয়াতে ঈমানের জন্য শর্ত আরোপ করা হয়েছে—যেমন ওয়াদা-অঙ্গীকার পূরণ করা, কষ্ট-ক্লেশে ছবর ও ধৈর্য ধারণ করা ইত্যাদি—এভাবে

মোট কুড়িটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا

"তাঁরাই প্রকৃত সত্যবাদী।" (বাকারাহ্ ঃ ১৭৭)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ط

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তাদেরও যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে।" (মুজাদালাহ্ ঃ ১১)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ط الآية

"যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে (আল্লাহ্র পথে), ব্যয় করেছে এবং জেহাদ করেছে, তাঁরা সমান নয় ; বরং তারা ঐ সমস্ত লোক অপেক্ষা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, যারা মক্কা বিজয়ের পর ব্যয় করেছে এবং জেহাদ করেছে।" (হাদীদ ঃ ১০)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ

"এ সমস্ত লোক মর্যাদায় আল্লাহ্র নিকট বিভিন্ন স্তরের হবে।" (আলি-ইমরান ঃ ১৬৩)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "ঈমান একটি বিবস্ত্র দেহ—যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে তাক্ওয়ার (আল্লাহ্-ভীতি) বস্ত্র পরিধান করানো হবে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ "ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ের শাখা হচ্ছে পথের কাঁটা দূর করা।"

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহে জানা যায় যে, আমলের সাথে ঈমানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এমনিভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর 'নেফাক' ও 'শির্কে খফী' অর্থাৎ গোপন শির্ক (যেমন রিয়া) হতে পবিত্র না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে সত্যিকার ঈমান আছে বলে গণ্য হবে না। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ خَالِصٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

"চারটি দোষ যে ব্যক্তির মধ্যে আছে, সে খাঁটী মুনাফিক ; যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং দাবী করে যে, সে মুমিন। এক. যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে। দুই. যখন ওয়াদা করে, তা খেলাফ (বিপরীত) করে। তিন. যখন তার নিকট আমানত রাখা হয়, খিয়ানত করে। চার. যখন ঝগড়া করে, অশ্লীল বকে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "এ উম্মতের অধিকাংশ মুনাফিকদের অস্তিত্ব ক্বারীদের (কেরাআত পাঠকারী) মধ্যে রয়েছে।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ "আমার উম্মতের মধ্যে শির্ক পাথরের উপর পিপিলিকার পদচারণা অপেক্ষা নিঃশব্দে এবং অধিক সন্তর্পণে বিদ্যমান থাকবে।"

হযরত হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কেউ এমন কোন কথা বলে বসতো যে কারণে সে মুনাফিক হয়ে যেতো এবং এরই উপর তার মৃত্যু হতো। আর আজকের যুগে সে ধরণের কথা আমি তোমাদের মুখে দশ দশ বার উচ্চারিত হতে শুনি।" (অথচ তোমাদের কোন পরোয়াই নাই।)

এক বুযুর্গ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজকে মুনাফেকী থেকে মুক্ত–পবিত্র মনে করে, সে প্রকৃতপক্ষে মুনাফেকীর অতি নিকটবর্তী হয়ে রয়েছে।"

হযরত হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ অপেক্ষা আজকের যুগে মুনাফিকদের সংখ্যা অনেক বেশী। সে যুগে তারা নিজেদের নেফাক গোপন করে রাখতো ; কিন্তু আজকে তারা দিবালোকে প্রকাশ করে বেড়ায়। এ নেফাক সত্যিকারের ঈমানের বিপরীত এবং খুবই সূক্ষ্ম বস্তু। যারা নিজেদের মধ্যে নেফাকের আশংকা বোধ করে, তারা এ থেকে দূরে রয়েছে, পক্ষান্তরে যারা নেফাক–মুক্ততার দাবী করে, তারাই আসলে এতে লিপ্ত।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)–এর নিকট জনৈক ব্যক্তি মন্তব্য করেছিল যে, এ যুগে নেফাকের অস্তিত্ব নাই। তিনি বলেছিলেন ঃ "ওহে! মুনাফিকদের যদি দুনিয়াতেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার রীতি থাকতো, তবে তোমরা আতঙ্কের কারণে ঘর থেকে বের হতে পারতে না।"

হযরত হাসান বসরী অথবা অন্য কোন বুযুর্গ বলেছেন ঃ "মুনাফিকদের যদি (চিহ্নস্বরূপ) লেজ গজানোর নিয়ম থাকতো, তবে আমরা রাস্তায় পা ফেলতে পারতাম না।"

একদা এক ব্যক্তি হাজ্জাজের বিরূপ সমালোচনা করছিল। হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) তা শুনতে পেয়ে বলেছিলেন ঃ দেখ, যদি হাজ্জাজ তোমার এসব মন্তব্য শুনতে থাকতো, তাহলে কি তুমি তা করতে পারতে? লোকটি বললো ঃ না। হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) বললেন ঃ "আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এটাকে মুনাফেকী মনে করতাম।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মানুষের সাথে দ্বিমুখী আচরণ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে (শাস্তিস্বরূপ) দুই জিহ্বাবিশিষ্ট করে উঠাবেন।"

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ সে, যে দ্বিমুখী আচরণ করে—একজনের সাথে সে এক রকম বলে, অপরজনের সাথে সে–কথাটিই অন্য রকম বলে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)–এর নিকট বলা হয়েছিল যে, এক সম্প্রদায়ের লোক মনে করে যে, তাদের মধ্যে কোনরূপ মুনাফেকী নাই। তিনি বলেছেন ঃ "আমি যদি নিশ্চিতভাবে জানতে পারি যে, আমার মধ্যে নেফাক অর্থাৎ মুনাফেকী নাই, তবে এটা সোনায় ভরপুর সারা জাহান অপেক্ষা আমার কাছে প্রিয়।"

হযরত হাসান (রাযিঃ) আরও বলেন ঃ মন–মুখ, প্রকাশ্য–অপ্রকাশ্য এবং ভিতর–বাইর এক না হওয়া মুনাফেকীর লক্ষণ।"

হযরত হুযাইফাহ্ (রাযিঃ)–এর নিকট এক ব্যক্তি বললো ঃ আমার আশংকা হয় যে, আমি মুনাফিক হয়ে গেলাম কিনা। তিনি বললেন ঃ তুমি যদি নিজ সম্পর্কে মুনাফেকীর আশংকা বোধ না করতে, তাহলে সত্যিই তুমি মুনাফিক হতে।

হযরত ইব্নে আবী মুলাইকাহ্ (রহঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একশত ত্রিশ জন কিংবা (অপর বর্ণনায়) একশত পঞ্চাশ জন সাহাবীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই নিজের সম্পর্কে নেফাকের আশংকা করতেন। (এ ছিল তাঁদের খোদা–ভীতি ও অতি উচ্চ পর্যায়ের ঈমানী চেতনা।)

বর্ণিত আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে মজলিসে বসা ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম আলোচনা প্রসঙ্গে একজন লোকের খুবই প্রশংসা করলেন। একটু পরেই সে লোকটিও মজলিসে এসে উপস্থিত হয় ; মাত্রই উযূ করে আসার কারণে তাঁর চেহারা থেকে উযূর পানি গড়িয়ে পড়ছিল, তাঁর হাতে ছিল পাদুকাদ্বয়, দুই চোখের মধ্যমর্তী স্থানে সিজদার চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইনিই সেই লোক, যার আমরা প্রশংসা করেছি। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তো এর মুখমণ্ডলে শয়তানের ছাপ লক্ষ্য করছি। লোকটি সালাম দিয়ে সাহাবায়ে কেরামের সাথে মজলিসে বসে গেল। হুযূর তাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ "আমি তোমাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি সত্য করে বল—তুমি যখন এখানে উপবিষ্ট লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছো, তখন তোমার মনে কি একথা আসে নাই যে, এদের মধ্যে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ

লোক আর কেউ নাই? লোকটি বললো, আল্লাহ্ সাক্ষী, আমি তাই মনে করেছি। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন দো'আয় বলতে লাগলেন ঃ হে আল্লাহ্! আমার জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত সবকিছু থেকে আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনিও ভয় ও আশংকা বোধ করেন? তিনি বললেন ঃ "সব সময়ই সন্ত্রস্ত থাকি—এছাড়া কোন উপায় নাই। কেননা, মানুষের মন সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তা'আলার অনন্ত ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে ; তিনি যখন যেভাবে ইচ্ছা তাতে পরিবর্তন করে দেন। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ○

"আর আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাদের সম্মুখে এমন ব্যাপার উপস্থিত হবে, যার ধারণাও তাদের ছিল না।" (যুমার ঃ ৪৭)

হযরত সির্‌রী সাক্‌তী (রহঃ) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি ফুল-বাগিচায় প্রবেশ করার পর বিভিন্ন রকমের সুন্দর পাখী যদি এক স্বরে তাকে বলতে থাকে—হে আল্লাহ্র ওলী! আপনাকে সালাম, আপনাকে সালাম, এতে যদি সে আত্মপ্রসাদ ও আনন্দ উপভোগ করে, তাহলে বুঝতে হবে—লোকটি তার প্রবৃত্তির হাতে বন্দী।

উপরোক্ত রেওয়ায়াত ও বর্ণনাসমূহের আলোকে বুঝা যায় যে, নেফাক বা ঈমানের ছদ্মাবরণে কুফর কত সূক্ষ্ম এবং গোপনভাবে থাকতে পারে। সুতরাং এ ব্যাপারে অসতর্ক হওয়া মোটেই সমীচীন নয়।

হযরত উমর (রাযিঃ) অনেক সময় হযরত হুযাইফাহ্ (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করতেন—মুনাফিকদের মধ্যে আমাকে তো উল্লেখ করা হয় নাই? অর্থাৎ নিজ সম্পর্কে তিনি নেফাকের আশংকা করতেন এবং উদ্বিগ্ন হয়ে হযরত হুযাইফাহ্ থেকে জানতে চাইতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাম মুনাফিকদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন কিনা।

হযরত আবূ সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন ঃ জনৈক শাসকের মুখে একদা আমি একটি আপত্তিকর উক্তি শুনে তার প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি আশংকা করেছি যে, সে আমাকে হত্যা করার হুকুম দিবে। মৃত্যুর ভয় আমার ছিল না এবং এ জন্যেও আমি প্রতিবাদ

থেকে বিরত থাকি নাই। বরং আমি আশংকা বোধ করেছিলাম যে, হত্যাকালে আমার প্রাণ নির্গত হওয়ার সময় মানুষের নিকট আমার সুনামের দরুণ হয়ত আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করবো ; এ জন্যেই আমি প্রতিবাদ থেকে বিরত রয়ে গেলাম। বস্তুতঃ এটা নেফাকের সেই প্রকার যা মূল ঈমানের বিপরীত নয় ; বরং ঈমানের হাকীকত, সততা, পূর্ণতা ও স্বচ্ছতার পরিপন্থী। তাই নেফাক দুই ভাগে বিভক্ত ঃ এক. যে নেফাকের দরুণ মানুষ দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়, কাফের বলে গণ্য হয় এবং পরিণামে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়। দুই. যে নেফাকের দরুণ দীর্ঘ সময়ের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হয় কিংবা বহুলাংশে মর্যাদা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং সিদ্দীকীন থেকে মর্যাদা বহু নিম্নতর হয়ে যায়।

অধ্যায় ঃ ৭৮

গীবত ও চুগলখোরীর বর্ণনা

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে গীবত ও পরনিন্দার জঘন্যতা বর্ণনা করেছেন এবং গীবতকারীকে আপন ভাইয়ের মৃতদেহের গোশত ভক্ষণকারীর সাথে তুলনা করেছেন ঃ

ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ

"তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা একে ঘৃণাই কর।" (হুজুরাত ঃ ১২)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "এক মুসলমানের সবকিছু অপর মুসলমানের উপর হারাম ; অর্থাৎ রক্ত, সম্পদ, ইয্যত।" আর গীবত মানুষের ইয্যত নষ্ট করে, তাকে অপমান করে, তাই হারাম।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَدَابَرُوا

"তোমরা কারও প্রতি কেউ হিংসা করো না, পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করো না, কারও দোষ-ত্রুটি খুঁজার পিছনে পড়ো না এবং পরস্পর বিচ্ছেদমূলক আচরণ করো না।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে—

"তোমরা গীবত করা থেকে বাঁচ। কেননা গীবত ব্যভিচারের চাইতেও জঘন্য।" এই জঘন্যতার কারণ হচ্ছে—ব্যভিচারী আল্লাহ্‌র কাছে সনিষ্ঠ তওবা করলে তিনি তা কবুল করবেন এবং তাকে ক্ষমা করবেন ; কিন্তু গীবতকৃত বান্দা যে পর্যন্ত গীবতকারীকে ক্ষমা না করবে, আল্লাহ্‌ তাআলাও তাকে ক্ষমা করবেন না।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَرَرْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ عَلٰى اَقْوَامٍ يَخْمَشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ بِاَظَافِيْرِهِمْ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هٰؤُلَاءِ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَغْتَابُوْنَ النَّاسَ وَيَقَعُوْنَ فِىْ اَعْرَاضِهِمْ ـ

"মিরাজ-রাত্রিতে আমি এমন কিছু লোকের পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম, যারা বিরাটকায় ধারালো নখের দ্বারা নিজেদের মুখমণ্ডল মারাত্মক ভাবে কাটতে ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—হে জিব্‌রাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন ঃ এরা দুনিয়াতে মানুষের গীবত ও নিন্দাবাদ করতো আর মানুষের ইয্‌যত-সম্মান নষ্ট করার জন্য পিছনে লেগে থাকতো।"

হযরত সুলাইমান ইব্‌নে জাবের (রাযিঃ) বলেন, আমি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেছি—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কিছু নেক আমল বলে দিন, যা দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। তিনি বল্‌লেন ঃ

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَصُبَّ مِنْ دَلْوِكَ فِىْ اِنَاءِ الْمُسْتَقِىْ وَاَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِبِشْرٍ حَسَنٍ وَاِنْ اَدْبَرَ فَلَا تَغْتَبْهُ ـ

"নেক আমল ছোট হোক আর বড়—কোনটাকেই তুমি তুচ্ছ মনে করবে না। এমনকি তোমার বালতি থেকে অপরের বালতিতে পানি ভরে দিবে কিংবা প্রসন্ন চেহারায় তোমার কোন ভাইকে সাক্ষাৎ দিবে ; সে বিদায়

নেওয়ার পর তার কোন নিন্দাবাদ করবে না (—এসব আমল প্রকৃতপক্ষে তুচ্ছ নয়)।

হযরত বারা' ইব্নে আযেব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা (বয়ান) দিলেন। এমনকি গৃহে অবস্থানরতা মহিলাদেরকেও তা শুনালেন ঃ "ওহে! তোমরা যারা মুখে মুসলমান হয়েছো অথচ অন্তরে বিশ্বাস কর নাই, তারা মুসলমানদের নিন্দাবাদ করো না, তাদের দোষ খুঁজো না। কারণ যে তার ভাইয়ের দোষ খুঁজবে, আল্লাহ্ তার দোষ খুঁজবেন। আর যার দোষ খুঁজবেন তিনি তাকে অপমানিত করবেন—যদিও সে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকে।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, "গীবত এমন এক জঘন্য অভ্যাস, যদি কেউ এ থেকে তওবা করেও মারা যায়, তবুও সে সকলের পরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি গীবতের গুনাহে লিপ্ত থেকে মারা যায় তা'হলে সে জাহান্নামে সর্বপ্রথম প্রবেশকারীরে মধ্যে হবে।"

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে রোযা রাখতে বললেন এবং আরও বললেন যে, আমি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা কেউ রোযা ভঙ্গ করো না। লোকেরা সকলেই রোযা রাখলো। সন্ধ্যার সময় এক একজন এসে বলতে লাগলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি রোযা রেখেছি ; আপনি অনুমতি দিলে ইফ্তার করে নেই। তিনি অনুমতি দিতেন—এভাবে লোকেরা ইফতার করে নেয়। এদের মধ্যে একজন লোক এসে আরজ করলো, ইয়া রাসূল্লাল্লাহ্! আমার ঘরে দুইজন স্ত্রীলোক রোযা রেখেছে ; তারা আপনার খেদমতে উপস্থিত হতে লজ্জা পায় ; তাদের রোযা ভঙ্গের অনুমতি প্রদান করলে তারা ইফতার করে নিতো। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি পুনরায় কথাটি আরজ করলো। তিনি আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে আবার আরজ করলো। তখন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

তারা রোযা রাখে নাই ; যারা দিনভর মানুষের গোশ্ত খেয়েছে তাদের রোযা কেমন করে হয়? তাদেরকে গিয়ে বলো—যদি রোযাদার হয়ে থাকে

তাহলে যেন তারা বমন করে। লোকটি গিয়ে তাদেরকে জানালে পর তারা বমন করলো। এতে তাদের ভিতর থেকে জমাট রক্ত বের হলো। লোকটি পুনরায় এসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবস্থা জানালো। তিনি বললেন ঃ কসম সেই পবিত্র সত্তার, যার হাতে আমার জান, এসব পদার্থ যদি তাদের পেটের ভিতর থেকে যেতো, তবে আগুন তাদের খেতো। অন্য বর্ণনায় ঘটনাটির শেষাংশ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নিলে সম্মুখ দিক থেকে এসে লোকটি বলতে লাগলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! স্ত্রীলোক দু'জন মরণাপন্ন অবস্থায় আছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে উপস্থিত করতে বল্লেন। উপস্থিত করা হলে দু'জনের একজনকে একটি পাত্রে বমন করতে বললেন। সে বমন করলো। ফলে, পাত্রটি রক্ত এবং পূঁজে ভরে গেল। অতঃপর অপর স্ত্রীলোকটিকে বমন করতে বল্লেন। সে বমন করলো। এতেও একটি পাত্র রক্ত ও পূঁজে ভরে গেল। অতঃপর হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ এরা রোযা রেখে আল্লাহ্ তাআলার হালাল খাদ্য আহার করা থেকে বিরত রয়েছে ; কিন্তু আল্লাহ্ কর্তৃক হারামকৃত বস্তু (মৃত) ভক্ষণ করেছে। অর্থাৎ তারা একত্র বসে পরস্পর গীবত ও পরনিন্দায় লিপ্ত হয়ে মৃতদের গোশত্ খেয়েছি।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সম্মুখে সূদ ও সূদের জঘন্যতা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, সূদের একটি মাত্র দিরহামও ছত্রিশ বার যেনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট পাপ ; আর সবচেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক সূদ হচ্ছে, কোন মুসলমানকে হেয় করা।

চুগলখোরী

চুগলখোরী করা অত্যন্ত জঘন্য ও নিন্দনীয় দোষ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ○

"অপবাদ কারী ও চুগলখোর ব্যক্তি।" (ক্বলম ঃ ১১)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ○

"রুক্ষ স্বভাবসম্পন্ন, তদুপরি অবৈধজাত (ও) হয়। " (ক্বলম ঃ ১৩)

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুবারক (রহঃ) বলেন ঃ

"যানীম' ঃ অবৈধজাত এবং যে কথা গোপন রাখে না।" হযরত ইব্‌নে মুবারক (রহঃ) উপরোক্ত আয়াত থেকে মর্ম আহরণ করে ইঙ্গিত আকারে এ কথা প্রমাণিত করছেন যে, যে কোন ব্যক্তি যদি কথা গোপন রাখতে না জানে এবং চুগলখোরী করে বেড়ায়—এ অভ্যাস সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবৈধজাত হওয়া বুঝায়। কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ○

"মহা দুর্ভোগ রয়েছে প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য ঃ যে কারও নিন্দা করে এবং সাক্ষাতে ধিক্কার দেয়। " (হুমাযাহ্ ঃ ১)

এক ব্যাখা অনুযায়ী 'হুমাযাহ্' দ্বারা চুগলখোর ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আবূ লাহাবের স্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন ঃ

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ○

"সে কাষ্ঠ বহন করে আনে" (লাহাব ঃ ৪)

বর্ণিত আছে স্ত্রীলোকটি ছিল চুগলখোর ; একের কথা বহন করে (ক্ষতির উদ্দেশ্যে) অপরের কাছে পৌঁছিয়ে দিতো।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا

"তারা উভয়েই সেই বান্দাদ্বয়ের খিয়ানত (হক নষ্ট) করেছে, সুতরাং সে দু'জন সৎ বান্দা আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় তাদের কিছুমাত্র কাজে আসতে পারে নাই।" (তাহ্‌রীম ঃ ১০)

বস্তুতঃ সে দুজন মহিলার মধ্যে হযরত লূত (আঃ)-এর স্ত্রীর অভ্যাস

ছিল, লোকদেরকে নবীর মেহ্‌মানদের আগমন–সংবাদ জানিয়ে দিতো (অতঃপর তারা এসে এদের সাথে জঘন্য দুর্ব্যবহার করতো। আর হযরত নূহ (আঃ)–এর স্ত্রী লোকদের কাছে তাঁকে পাগল বলে বেড়াতো।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "চুগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

"অন্য এক হাদীসে আছে ঃ কাত্তাত জান্নাতে যাবে না।" আর কাত্তাত' অর্থ হচ্ছে, চুগলখোর।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্‌ (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় তারা, যাদের আখলাক–চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।—যারা বিনম্র স্বভাবের অধিকারী, সহানুভূতিশীল ও লোকদের সাথে ভালবাসা ও সদাচরণে অভ্যস্ত। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় তারা যারা চুগলখোরী করে ভাইদের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। এবং সৎ ও নির্দোষ লোকদের ত্রুটি–বিচ্যুতি খুঁজে বেড়ায়।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে বলবো—সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক কারা? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, অবশ্যই বলুন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বল্‌লেন ঃ যারা চুগলখোরী করে এবং ভাল মানুষের দোষ–ত্রুটি তালাশ করে।"

হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ اَشَاعَ عَلٰى مُسْلِمٍ كَلِمَةً لِيَشِيْنَهُ بِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ شَانَهُ اللّٰهُ بِهَا فِى النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে বদনাম করার জন্য কোন কথা প্রচার করে, ক্বিয়ামতের দিন সে কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে হেয় করবেন।"

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَيُّمَا رَجُلٍ اَشَاعَ عَلٰى رَجُلٍ كَلِمَةً وَهُوَ بَرِئٌ لِيَشِيْنَه بِهَا فِى الدُّنْيَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَشِيْنَه بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى النَّارِ ـ

"যদি কেউ অন্য যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুনিয়াতে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কোন অপপ্রচার করে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে অবশ্যই দোযখে নিক্ষেপ করে হেয় করবেন।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)–সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ شَهِدَ عَلٰى مُسْلِمٍ بِشَهَادَةٍ لَيْسَ لَهَا بِاَهْلٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَه مِنَ النَّارِ ـ

"যে ব্যক্তি (স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে) সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য না হয়ে কোন মুসলমানের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।"

কথিত আছে যে, কবরের এক তৃতীয়াংশ আযাব চুগলখোরীর কারণে হয়ে থাকে।

হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত সৃষ্টি করে তাকে হুকুম করেছেন ঃ ওহে! কথা বল্। তখন সে বলেছে ঃ "সৌভাগ্যবান ঐসব লোক যারা আমাতে প্রবেশ লাভ করবে।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ আমার ইয্‌যত ও প্রতাপের কসম, আট শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না ঃ ১. মদ্যপানে অভস্ত। ২. যেনা–ব্যভিচারে অভ্যস্ত। ৩. চুগলখোর। ৪. দায়ূস (অর্থাৎ যার স্ত্রী, মা, বোন যেনাকারীতে লিপ্ত ; কিন্তু সে তাদেরকে বিরত রাখে না)। ৫. অত্যাচারী প্রহরী–পুলিশ। ৬. নপুংসক (অর্থাৎ যে স্বেচ্ছায় স্ত্রীলোকের ভাব–ভঙ্গি অবলম্বন করে ও গান–বাজনায় মত্ত হয়)।

৭. আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদনকারী। ৮. যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে এ কথা বলে যে, আমি যদি অমুক কাজটি না করি তাহলে আল্লাহ্র কাছে দায়ী থাকবো ; অতঃপর সে কাজটি সম্পাদন করলো না।

হযরত কাব আহবার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত—একদা বনী ইস্‌রাঈলের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে হযরত মূসা (আঃ) বারবার বৃষ্টির জন্য দো'আ করা সত্ত্বেও বৃষ্টি হলো না। আল্লাহ্ পাক ওহী পাঠালেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সাথে কোন চুগলখোর ব্যক্তি শরীক থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কারও দো'আ কবূল করা হবে না। হযরত মূসা (আঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনি বলে দিন—আমাদের মধ্যে চুগলখোর ব্যক্তি কে? আমরা তাকে আমাদের থেকে পৃথক করে দেই। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ হে মূসা! আমি নিজেই চুগলখোরী হারাম করেছি ; আবার তা বলে দিয়ে আমি তাতে লিপ্ত হবো? অতঃপর তারা সকলেই আল্লাহ্র দরবারে তওবা করলো। পরে বৃষ্টিও হলো।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি সাতটি কথা জানার জন্য সাতশত ফর্‌সখ (প্রায় তিন মাইলে এক ফরসখ হয়) সফর করে এক হাকীম-তত্ত্বজ্ঞানী খেদমতে উপস্থিত হয়েছিল। সে আরজ করলো—আল্লাহ্ পাক আপনাকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা থেকে কিছু আহরণ করার জন্য আমি এসেছি। আপনি বলুন—১. আসমানের ওজন কি পরিমাণ এবং আসমানের চেয়ে বেশী ওজনী কোন্ জিনিসটি? ২. জমীনের ওজন কি এবং এর চেয়ে ভারী কোন্ বস্তুটি? ৩. পাথর সম্পর্কে বলুন যে, এর চেয়েও শক্ত ও কঠিন বস্তু কোন্‌টি? ৪. আগুন সম্পর্কে বলুন যে, এর চেয়েও উত্তপ্ত কোন্ জিনিসটি? ৫. যাম্‌হারীর (সীমাহীন ঠাণ্ডা, দোযখেরও একটি নাম) সম্পর্কে বলুন যে, এরচেয়ে অধিক ঠাণ্ডা কোন্‌টি? ৬. সাগর সম্পর্কে বলুন যে, এরচেয়ে বেশী প্রশস্ত কি? ৭. এতীম সম্পর্কে বলুন যে, এরচেয়ে হেয়-লাঞ্ছিত কে?

জ্ঞানী লোকটি জবাব দিল ঃ ১. নিষ্পাপ-নির্দোষ লোকের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা আসমান অপেক্ষা-ভারী গুনাহ। ২. হক কথা যমীনের চেয়েও বেশী ওজনী। ৩. কাফেরের মন পাথরের চেয়েও বেশী শক্ত ও কঠিন। ৪. লোভ ও হিংসা আগুণের চেয়েও বেশী উত্তপ্ত। ৫. নিকটজন ও আত্মীয়ের কাছে কোন অভাব ও প্রয়োজন পেশ করার পর তা পূরণ

না হওয়া যাম্হারীর অপেক্ষা অধিক ঠাণ্ডা। ৬. অল্পেতুষ্ট ব্যক্তির অন্তর সাগর অপেক্ষাও বেশী প্রশস্ত। ৭. চুগলখোরের অপকর্ম যখন প্রকাশ পেয়ে যায়, তখন সে এতীম-অনাথের চেয়েও বেশী হেয়-অপদস্থ।

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি চমৎকার নসীহত করেছেন ঃ "লোকদের মধ্যে চুগলখোরীতে যে ব্যক্তি অভ্যস্ত তার এ দুশ্চরিত্রের বৃশ্চিক ও সর্প থেকে তার বন্ধুরাও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। যেমন রাতের অন্ধকারের বন্যাস্রোত; কেউ বলতে পারে না কোনদিক থেকে এসে কোনদিকে গেল।"

অপর একজন নসীহত করেছেন ঃ "অপরের বিরুদ্ধে যে তোমার কাছে চুগলখোরী করে, সে তোমার বিরুদ্ধেও অপরের কাছে নির্দ্বিধায় চুগলখোরী করবে। কাজেই তুমি এহেন লোকদের সংশ্রব থেকে পূর্ণ সতর্ক থেকো।"

অধ্যায় ঃ ৭৯

শয়তানের শত্রুতা

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ মানুষের অন্তরে দুই প্রকারের খেয়াল ও চিন্তা-কল্পনার উদ্রেক হয় ঃ এক. ফেরেশ্‌তার পক্ষ থেকে। এ খেয়াল মানুষকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ এবং হক ও সত্যের দিকে ধাবিত করে। যাদের অন্তরে এরূপ খেয়াল ও ধ্যান-কল্পনা উদিত হয়, তাদের বিশ্বাস করা উচিত যে, এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি অনুগ্রহ। সুতরাং এ জন্য তার আল্লাহ্ পাকের দরবারে শোকর ও প্রশংসা আদায় করা উচিত। দ্বিতীয় প্রকারের খেয়াল ও চিন্তা-কল্পনার উদ্রেক ঘটে শয়তানের পক্ষ থেকে। এতে মানুষের মন অসৎ ও অন্যায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, হক ও সত্যকে অস্বীকার করে এবং সৎ ও কল্যাণকর কার্যসমূহ পরিহার করে চলে। যে ব্যক্তি তার অন্তরে এহেন অবস্থা অনুভব করবে সে যেন 'আঊযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম' পাঠ করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ

"শয়তান তোমাদেরকে অভাবগ্রস্ত হওয়ার ভয় দেখায় এবং অসৎ কাজের পরামর্শ দেয়।" (বাক্বারাহ ঃ ২৬৮)

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন ঃ "দ্বিবিধ চিন্তা-কল্পনা মানুষের অন্তরে আনাগুনা করে। এক. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আর দ্বিতীয়টি শত্রুর (শয়তান) পক্ষ থেকে। আল্লাহ্ পাক রহম করুন সেই বান্দার প্রতি যে উভয়বিধ চিন্তা ও খেয়াল মাত্রই হুঁশিয়ার হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত খেয়াল ও চিন্তা-কল্পনা অনুযায়ী তাঁর আনুগত্য ও হুকুম-আহ্‌কাম পালনে ব্যাপৃত হয়ে যায়। আর শত্রুর পক্ষ থেকে আগত কল্পনার বিরুদ্ধে মোকাবিলা ও

সাধনায় রত হয়ে যায়।

জাবের ইব্‌নে উবাইদাহ্ আদাভী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী ইব্‌নে যিয়াদ (রাহঃ)–এর নিকট আরজ করেছি যে, আমার অন্তরে কখনও ওয়াস্‌ওয়াসহ বা কুমন্ত্রনা আসে না। তিনি বল্‌লেন ঃ "অন্তর হচ্ছে গৃহের ন্যায় ; এতে চোর প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকে ; যদি ঘরে কিছু থাকে তাহলে চোর চুরি করতে পারে কিংবা ডাকাত হামলা করতে পারে। কিন্তু চোর বা ডাকাতের জন্য যদি ঘরে কিছুই না থাকে, তাহালে তাদের হামলার প্রশ্ন থাকে না। অর্থাৎ অন্তর যদি কাম–প্রবৃত্তি থেকে পবিত্র থাকে, তবে, শয়তান তাতে প্রবেশ করে না।" এ জন্যেই আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

"বাস্তবিক আমার বান্দাদের উপর তোমার কিছুমাত্র ক্ষমতা চলবে না।" (হিজর ঃ ৪২) কাজেই যে ব্যক্তি নফস ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো, সে প্রকৃতপক্ষ নফ্‌সেরই গোলাম ও দাস হলো ; আল্লাহ্‌র গোলাম সে নয়। এজন্যেই এহেন প্রবৃত্তিপূজারীদের উপর শয়তানকে নিযুক্ত করে দেওয়া হয়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ

"আপনি কি সেই ব্যক্তির অবস্থা দেখেছেন, যে নিজের প্রবৃত্তিকে আপন মাবূদ সাব্যস্ত করেছে?" (জাসিয়াহ্ ঃ ২৩)

এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রবৃত্তিই তার খোদা ও মাবূদ, অতত্রব সে প্রবৃত্তির বান্দা হলো ; আল্লাহ্‌র বান্দা নয়।

হযরত আমর ইব্‌নে আস (রাযিঃ) একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! শয়তান আমার নামায ও ক্বিরাআতে বাধা সৃষ্টি করে।" হুযূর বল্‌লেন ঃ এ শয়তনের নাম 'খুন্‌যুব'। যখনই তুমি এটা অনুভব কর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর (অর্থাৎ আউযু বিল্লাহি মিনাশ্‌শায়তানির রাজীম পড়) এবং বাম দিকে তিন বার থুথু কর। হযরত অমর ইব্‌নে আস (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূরের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করেছি। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তা সম্পূর্ণ

দূর করে দিয়েছেন।

বর্ণিত আছে, উযূর সময় একটি শয়তান হামলা করে থাকে এটার নাম 'ওয়ালাহান'। তোমরা এটা থেকেও আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। সর্বোপরি অন্তর থেকে শয়তানী ওয়াসওয়াসাহ্ প্রকৃতপক্ষে একমাত্র আল্লাহ্‌র যিকির ও স্মরণই দূর করতে পারে। কেননা, আল্লাহ্‌র যিকির ও স্মরণ থাকলে অন্তর যেহেতু এটাতে ব্যাপৃত থাকবে, সুতরাং কোন শূন্যতা না থাকার কারণে অন্য কোন ধ্যান–খেয়াল ও কুমন্ত্রণা অন্তরে স্থান পাবে না। এ ছাড়া শয়তানের গমনাগমন ও উপস্থিতির জায়গা হচ্ছে অশ্লীল–অহেতুক ও বেহুদা গল্প–গোজারির স্থানসমূহ ; আল্লাহ্‌র যিকিরের স্থানসমূহ শয়তানের উপস্থিতি–স্থল নয়। সুতরাং যে অন্তরে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও যিকির রয়েছে, তাতে শয়তানী কুমন্ত্রণার উদ্রেক হয় না। এছাড়া আরও কারণ হচ্ছে, যে কোন ব্যাধির চিকিৎসা হয় রোগের বিপরীত প্রক্রিয়া অবলম্বনের মাধ্যমে। আর সর্ববিধ শয়তানী কুমন্ত্রণার বিপরীত হলো 'আল্লাহ্‌র যিকির' 'আঊযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম' এবং 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্'। তাই এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে শয়তানী ওয়াসওয়াসাহ্ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। তবে এটা এমন সব পরহেযগার ও মুত্তাকী লোকদের কাজ যাদের জীবনে আল্লাহ্‌র যিকির প্রকৃতই প্রাধান্য পেয়েছে। আর শয়তানও ঠিক এমন লোকদের প্ররোচিত করার সুযোগের সন্ধানে থাকে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا
فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ۝

"নিশচয় যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে, যখন তাদের প্রতি শয়তানের পক্ষ হতে কোন আশংকা দেখা দেয়, তখন তারা আল্লাহ্‌র স্মরণে লিপ্ত হয়ে যায়, ফলে অমনি তাদের চক্ষু খুলে যায়।" (আ'রাফ ঃ ২০১)

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন ঃ "পবিত্র কুরআনের আয়াত রয়েছেঃ

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝

"কুমন্ত্রনা প্রদানকারী পশ্চাদাপসরণকারীর (অর্থাৎ শয়তানের) অপকারিতা হতে।" (নাস ঃ ৪)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, শয়তান সর্বদা মানবের অন্তরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে ; যখন দেখে অন্তর আল্লাহ্‌র যিকিরে মগ্ন, তখন সে মূর্ছে পড়ে, আর যখন দেখে আল্লাহ্‌র যিকির থেকে সে গাফেল–অন্যমনস্ক তখন শয়তান অন্তরের উপর ছেয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ্‌র যিকির ও শয়তানী কুমন্ত্রণার মধ্যখানে আবর্তিত হওয়ার এ অবস্থাকে আলো এবং অন্ধকার কিংবা দিবস ও রাতের মাঝে আবর্তিত হওয়ার সাথে তুলনা করা চলে। আল্লাহ্‌র যিকির ও শয়তানের কুমন্ত্রণার পরস্পর বৈপরিত্যের বিষয় পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ط

"শয়তান তাদের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে নিয়েছে, ফলে সে তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকির ভুলিয়ে দিয়েছে।" (মুজাদালাহ্ ঃ ১৯)

হযরত আনাস (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِعٌ خُرْطُوْمَهُ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَاِنْ هُوَ ذَكَرَ اللّٰهَ تَعَالٰى خَنَسَ وَاِنْ نَسِيَ اللّٰهَ تَعَالٰى اِلْتَقَمَ قَلْبَهُ

"শয়তান আদম সন্তানের হৃদয়ে শুঁড় লাগিয়ে বসে আছে; যদি সে আল্লাহ্‌র যিকিরে মগ্ন থাকে, তবে সে পিছু হটে যায়। আর যদি আল্লাহ্‌র যিকির থেকে গাফেল হয়, তবে তাঁকে লুকমা বানিয়ে (গলধঃকরণ করে)নেয়।"

ইব্‌নে ওয়াযযাহ্ (রহঃ) তৎবর্ণিত এক হাদীসে বলেছেন ঃ মানুষ চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পরও যদি তওবা না করে, তাহলে শয়তান তার মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে বলে যে, এটা ঐ চেহারা যেটা আখেরাতে নাজাত পাবে না। আর খাহেশ ও কাম–প্রবৃত্তি যেমন মানুষেড় রক্ত–মাংসে সংমিশ্রিত থাকে, অনুরূপভাবে শয়তানের আধিপত্যও মানুষের রক্ত–মাংসে প্রবিষ্ট এবং সর্বদিক থেকে তার অন্তরে পরিব্যাপ্ত রয়েছে। এজন্যেই হুযূর

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "শয়তান আদম সন্তানের মধ্যে রক্তের চলাচলের ন্যায় বিরাজ করে। অতত্রব তোমরা অল্পাহার ও ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য-সাধনার দ্বারা শয়তানের প্রবেশদ্বার বন্ধ কর।" বস্তুতঃ এরই মাধ্যমে খাহেশ ও কাম-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ নিস্তেজ ও স্তিমিত হয়ে আসবে, ফলে শয়তানের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হবে।

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইবলীস শয়তানের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন ঃ

لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ

"আমি তাদের (ক্ষতির) জন্য আপনার সরল পথে বসবো, অতঃপর তাদের উপর আক্রমণ চালাবো তাদের সম্মুখ দিক হতেও এবং তাদের পশ্চাদ্দিক হতেও এবং তাদের ডান দিক হতেও এবং তাদের বাম দিক হতেও।" (আ'রাফ ঃ ১৬, ১৭)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ শয়তান আদম-সন্তানকে বিপথগামী করার জন্য বিভিন্ন পথে আস্তানা গেড়েছে। ইসলামের পথে বসে সে বনী আদমকে বলে, কিহে! তুমি ইসলাম গ্রহণ করতে মনস্থ করেছো? অথচ তোমার বাপ-দাদার ধর্ম তা ছিল না। কিন্তু মানুষ ইবলীসের অবাধ্যতা করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারপর সে তার হিজরতের পথে বসে বলে, কিহে! তুমি হিজরতের ইচ্ছা করেছো? আপন মাতৃভূমি আপন পরিবেশ ছেড়ে যাচ্ছ? কিন্তু সে তার-অবাধ্যতা করে হিজরত করেছে। অতঃপর সে তার জিহাদের পথে বসে বলে, কিহে! জিহাদের ইচ্ছা করছো? অথচ এতে তোমার জান মাল সম্পদ ধ্বংস হবে, তুমি নিজে নিহত হবে, তোমার স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বসবে, তোমার ত্যাজ্য সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যাবে। এরপরেও আদমের সন্তান ইবলীসের বিরোধিতা করে জিহাদ করেছে। (হুযূর বলেন ঃ) এসব কিছুর পর সে যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তখন তাকে জান্নাত দান করা আল্লাহ্ তা'আলার কর্তব্য হয়ে যায়।"

অধ্যায় ঃ ৮০

আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত ও নফ্‌সের হিসাব-নিকাশ

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেছেন ঃ "মহব্বত বস্তুতঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা ও অনুসরণের নাম।" অপর এক বুযুর্গ বলেছেন ঃ "সর্বদা যিকিরে মত্ত থাকার নাম মহব্বত" আরেক বুযুর্গ বলেন ঃ "প্রিয়কে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়ার নাম মহাব্বত।" এক বুযুর্গ বলেন ঃ "দুনিয়ায় অবস্থান করাকে অপছন্দ করার নাম মহব্বত।" বস্তুতঃ এ সবকিছু মহব্বতের অনিবার্য ফলশ্রুতির বিবরণ মাত্র ; মহব্বতের প্রকৃত স্বরূপ কেউ বর্ণনা করেন নাই।

এক বুযুর্গের উক্তি মতে—"মহব্বত আসলে স্বীয় প্রিয়পাত্রের প্রতি এমন এক আকর্ষণ, যা বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর উপলব্ধি করে থাকে ; কিন্তু তা ভাষায় ব্যক্ত করতে সে অক্ষম।"

হযরত জুনাইদ বাগাদাদী (রহঃ) বলেন ঃ "পার্থিব মোহে পতিত লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা মহব্বত থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন। কোন প্রাপ্তি বা বিনিময়ের লক্ষে উৎসারিত মহব্বতের অবস্থা হচ্ছে, যখনই সেই বিনিময় বা স্বার্থ অনুপস্থিত হয়, তখনই সেই মহব্বতও খতম হয়ে যায়।"

হযরত যুন্নূন (রহঃ) বলেন ঃ "আল্লাহ্‌র মহব্বতের দাবীদার ব্যক্তিকে বল—আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও সম্মুখে নত হওয়া থেকে বাঁচ।"

হযরত শিব্‌লী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—আল্লাহ্‌র পরিচয়প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্‌কে মহব্বতকারী—এ দুয়ের পরিচয় কি? তিনি বলেছেন ঃ "আরেফ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পরিচয়প্রাপ্ত যদি কথা বলে, তবে ধ্বংসে পতিত হয়, আর মহব্বতকারী যদি নিশ্চুপ থাকে, তবে ধ্বংসে পতিত হয়।

হযরত শিবলী (রহঃ) নিম্নের এই পংক্তিগুলো পাঠ করেছেন ঃ

يَا اَيُّهَا السَّيِّدُ الْكَرِيْمُ   حُبُّكَ بَيْنَ الْحَشَا مُقِيْمُ

"হে মহান দয়ালু মনিব! আপনার মহব্বত আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে গেছে।"

يَا رَافِعَ النَّوْمِ عَنْ جُفُوْنِيْ   اَنْتَ بِمَا مَرَّ بِيْ عَلِيْمُ

"হে আমার নয়নযুগল থেকে নিদ্রা হরণকারী! আমি যে কিরূপ ব্যাকুল ও অস্থির অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করছি, তা আপনি অতি উত্তমরূপে অবহিত রয়েছেন।"

হযরত রাবেয়া আদাভিয়া (রহঃ) বলেছেন ঃ আমার প্রিয়তমের খোঁজ আমাকে কে দিবে? তাঁর খাদেমা জবাব দিয়েছে, আমাদের প্রিয়তম আমাদের সাথেই রয়েছে, কিন্তু দুনিয়া আমাদেরকে তার থেকে পৃথক করে রেখেছে।

ইব্‌নে জালা' (রহঃ) বলেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ) এর নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, আমি যখন আমার বান্দার অভ্যন্তর দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতি মহব্বত ও আকর্ষণশূন্য পাই, তখন তার অন্তরকে আমার ভালবাসা ও মহব্বত দিয়ে ভরপূর করে দেই এবং তাকে আমার খাস হেফাযতে নিয়ে নেই।"

বর্ণিত আছে যে, হযরত সাম্‌নূন (রহঃ) একদা মহব্বত ও ভালবাসা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন এমন সময় একটি পাখী উড়ে এসে সামনে পড়ে গেল এবং আপন ঠোঁট দিয়ে মাটি খুঁদতে (এবং কি যেন তালাশ করতে) লাগলো। এমনকি এ অবস্থায়ই সে মারা গেল।

হযরত ইব্‌রাহীম আদহাম (রহঃ) বলেছেন ঃ হে মহান আল্লাহ্! আপনি জানেন—আপনি আমাকে মহব্বত-ভালবাসা দান করেছেন, আপনার স্মরণ ও যিকিরের দ্বারা আমাকে সৌভাগ্যবান করেছেন, আপনার কুদরত মহিমা ও মহানত্বের চিন্তা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এসব নেয়ামতের তুলনায় জান্নাত আমার কাছে মশার ডানা পরিমাণ মূল্যও রাখে না।"

হযরত সিররী সাক্‌তী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্কে যে ভালবাসে ; তার

মহব্বত যার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে, সে-ই প্রকৃত জীবন পেয়েছে, আর যে দুনিয়ার মোহে পতিত হয়েছে, সে বঞ্চিত হয়েছে। নির্বোধ লোক সকাল-সন্ধা কেবল কিছুই নাই; অভাবের আর্তনাদ ও প্রাচুর্যের অন্বেষায় লেগে থাকে আর বুদ্ধিমান নিজের দোষ-ত্রুটির অন্বেষা ও সংশোধনে ব্যাপৃত থাকে।"

নফ্‌সের মোহাসাবা বা হিসাব-নিকাশ

স্বীয় প্রবৃত্তি ও নফসের মোহাসাবার বিষয়ে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে নিদেশ দিয়েছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

"হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ; এবং প্রত্যেকের উচিত—আগামী (কিয়ামত) দিবসে সে কি (আমল) প্রেরণ করছে, (বা এর জন্য কি প্রস্তুতি নিচ্ছে,) সে বিষয়ে চিন্তা করা।" (হাশর ঃ ১৮)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক অতীত আমলসমূহের মোহাসাবাহ্ অর্থাৎ স্বীয় সর্ববিধ কার্যকলাপের হিসাব-নিকাশের হুকুম করেছেন। এজন্যেই হযরত উমর (রাযিঃ) বলেছেন ঃ

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَزِنُوهَا قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا

"(কেয়ামতের দিন) তোমাদের হিসাব-নিকাশ লওয়ার পূর্বেই (দুনিয়াতে) নিজেদের হিসাব নিজেরা করে নাও এবং তোমাদের (আমল) ওজন হওয়ার পূর্বেই নিজেরা ওজন করে লও।"

বর্ণিত আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরজ করলো ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে নসীহত করুন। তিনি বললেন, তুমি কি প্রকৃতই নসীহত কামনা কর? লোকটি বল্‌লো, জ্বি হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হুযূর বললেন ঃ তাহলে, শুনো- যে কোন কাজ করবে শেষ পরিণতি চিন্তা করে নিবে ; যদি সঠিক ও কল্যাণকর হয় তবে করবে। আর যদি ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট কাজ হয় তবে তা থেকে বিরত থাক।"

আরও বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধিমান লোকের উচিত যে, সে যেন তার সময়কে চার ভাগে ভাগ করে এবং তন্মধ্যে একটি সময় নফ্সের মোহাসাবা ও হিসাব-নিকাশের জন্য নিধারিত করে নেয়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহ্র কাছে তওবা কর, যাতে তোমরা কৃতকার্য হতে পার।" (নূর ঃ ৩১)

প্রকৃত তওবা হচ্ছে, মানুষ তার ভ্রান্ত ও অন্যায় কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমি দিনভর আল্লাহ্ তা'আলার কাছে একশত বার তওবা ও এস্তেগ্ফার করি।"

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۝

"যারা আল্লাহ্কে ভয় করে, যখন তাদের প্রতি শয়তানের পক্ষ হতে কোন আশংকা দেখা দেয় তখন তারা আল্লাহ্র যিকিরে লিপ্ত হয়ে যায়, ফলে অমনি তাদের চক্ষু খুলে যায়।" (আরাফ ঃ ২০১)

হযরত উমর (রাযিঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, যখন রাত হতো, তখন তিনি নিজ পায়ের উপর বেত্রাঘাত করতেন আর বলতেন—কিহে! আজকের দিন তুই কি কাজ করেছিস?

হযরত মায়মূন ইব্নে মেহ্রান (রহঃ) বলেন, "বান্দা প্রকৃত মুত্তাকী তখনই হতে পারে, যখন সে যৌথ ব্যবসায় আপন অংশীদারের চেয়ে নিজ আমল-আখলাকের হিসাব ও খোঁজ-খবর নেয় বেশী।"

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) মৃত্যুর সময় আমার নিকট বলেছেন, আমার কাছে হযরত

উমরের চেয়ে বেশী মাহ্বূব' (প্রিয়) কেউ নাই। অতঃপর আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি কি বলেছি? আমি পুনরাবৃত্তি করলে তিনি শব্দ পরিবর্তন করে বল্‌লেন, আমার কাছে হযরত উমরের চেয়ে বেশী 'আযীয' (মাহ্বূব শব্দের কাছাকাছি অর্থবহ) কেউ নাই।" এখানে লক্ষনীয় যে, শব্দটি মুখে উচ্চারণ করার পরেও পুনর্বার তাতে চিন্তা করে সেটিকে পরিবর্তন করে উচ্চারণ করলেন। বস্তুতঃ এ ছিল তাঁর মোহাসাবা এবং পূর্ণ সতর্ক হিসাব-নিকাশ।

হযরত আবূ তাল্‌হা (রাযিঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নামাযে মগ্ন ছিলেন, এমন সময় একটি পাখী তাঁর বাগানে উড়ে এসে বসলো।পাখীটি তাঁর বাগানের প্রচুর ও ঘন বৃক্ষ-লতা ও পত্র-পল্লবের কারণে সেখান থেকে বের হতে পারছিল না। এ দেখে হযরত আবূ তাল্‌হা নামাযের মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তার এই অম্যমনস্কতার কারণ যেহেতু এ বাগানটিই হয়েছে, তাই তিনি গোটা বাগানটিই আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দিলেন এবং এ অন্যমনস্কতার ক্ষতিপূরণের আশা করলেন। এ-ই ছিল তাঁদের মোহাসাবা ও হিসাব-নিকাশের সামান্যতম নমুনা।

হযরত ইব্‌নে সালাম (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, লাক্‌ড়ির একটি বোঝা তিনি নিজ মাথায় বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, হে আবূ ইউসুফ (তাঁর উপনাম)! আপনার গোলাম-খাদেম থাকা সত্ত্বেও আপনি নিজে এ কষ্ট করছেন কেন? তিনি বললেন ঃ ওহে! আমি চেয়েছি—আমার নফ্‌স ও প্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, নাকি সে এ বোঝা বহন করতে অস্বীকার করে?

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন ঃ "আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী প্রকৃত মুমিন আপন প্রবৃত্তির প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখে এবং যাবতীয় কর্ম-কীর্তির বিষয়ে সর্বদা হিসাব গ্রহণ করে। বস্তুতঃ যারা দুনিয়াতেই প্রত্যেকটি কাজ চিন্তা-ভাবনা ও চুলচেরা হিসাবের সাথে আঞ্জাম দিয়েছে, আখেরাতে তাদের হিসাব সহজ হয়ে যাবে।" অতঃপর তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ " উদাহরণতঃ মুমিনের সম্মুখে এমন কোন বস্তু এসে গেল, যা তার কাছে খুবই পছন্দনীয়

এবং তার বিশেষ প্রয়োজনেরও বটে ; কিন্তু এর পরেও সে এটাকে শুধু এজন্যে পরিত্যাগ করে যে, তা আল্লাহ্‌র মর্জীর খেলাফ। আমলের পূর্বে নফ্‌সের মোহাসাবা এরই নাম। আর যদি কখনও মুমিনের পক্ষ থেকে কার্যতঃ কোন ত্রুটি বা স্খলন হয়ে যায়, তবে সে তৎক্ষণাৎ শোধ্‌রে যায় এবং নফ্‌সকে সম্বোধন করে বলে যে, এ কাজে তুই মোটেই অপারগ নস্‌ ; পুনরায় এ কাজ আর করবো না ইন্‌শাআল্লাহ্‌।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা আমি হযরত উমর (রাযিঃ)–এর সঙ্গে ছিলাম। মদীনার অদূরে তিনি পরিদর্শনে ঘুরা–ফেরা করছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে আমরা বাগানে প্রবেশ করলাম। আমাদের মাঝখানে শুধু একটি দেওয়াল ছিল। হযরত উমর (রাযিঃ) তখন বলছিলেন, বাহ্‌ বাহ্‌ হে উমর আমীরুল মুমেনীন, দম্ভ–অহমিকার শিকার হয়ো না ; আল্লাহ্‌র কসম অবশ্যই তোমাকে আল্লাহ্‌র সম্মুখে একদিন জবাবদিহির জন্য দাঁড়াতে হবে, সে দিনকে ভয় কর, সাবধান হও। তা না হলে কঠিন শাস্তি ভোগতে হবে।"

আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

"আর এমন আত্মার কসম করছি, যে নিজকে তিরস্কার করে।"

(কিয়ামাহ ঃ ২)

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন ঃ সত্যিকার মুমিন ব্যক্তি প্রতিটি কাজে আত্ম–সমালোচনা করে নিজের চুলচেরা হিসাব নিতে থাকে—অমুক কথাটি বলেছো ; কি উদ্দেশ্যে বলেছো? এই যে খাদ্য খেলে কেন খেলে, কি ফায়দা তোমার সম্মুখে রয়েছে? এই যে পানীয় পান করলে ; এতে তোমার কি মাক্‌সাদ? এভাবে সে তার প্রতিটি পদক্ষেপে হুঁশিয়ারী অবলম্বন করে থাকে। পক্ষান্তরে, গাফেল ও খোদাবিমুখ যারা, তারা অবলীলায় দুনিয়ার যিন্দেগী অতিবাহিত করে ; কোনই চিন্তা–ফিকির বা হিসাব–নিকাশের প্রশ্ন তাদের জীবনে নাই।

হযরত মালেক ইব্‌নে দীনার (রহঃ) বলেন ঃ "আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই বান্দার প্রতি রহম করুন যে নিজকে সম্বোধন করে বলে যে, ওহে! তুই

কি অমুক অন্যায় কাজ করিস্ নাই? তুই কি অমুক অপরাধ করিস্ নাই? এভাবে সে নিজকে অহরহ তিরস্কার করতে থাকে। অতঃপর সে স্বীয় নফ্সকে লাগামবদ্ধ করে নেয়, আল্লাহ্র কিতাবের অনুসারী করে গড়ে তোলে এবং একমাত্র আল্লাহ্র কিতাবকেই সে আদর্শরূপে গ্রহণ করে নেয়। এ হচ্ছে নফ্সের প্রতি তিরস্কার ও সজাগ দৃষ্টি নিক্ষেপের তরীকা।"

হযরত মায়মূন ইব্নে মেহ্রান (রহঃ) বলেন ঃ "প্রকৃত খোদাভীরু ও মুত্তাকী যারা, তারা নফ্সের চুলচেরা হিসাব অত্যাচারী বাদশাহ্ এবং কৃপণ অংশীদার ব্যবসায়ীর চেয়েও বেশী নিয়ে থাকে।"

হযরত ইব্রাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন ঃ "আমি আমাকে ধ্যান ও কল্পনাজগতে ফেলে দেখেছি—জান্নাতে প্রবেশ করেছি, সেখানে বেহেশ্তী খাদ্য ও ফলমূল আহার করছি, জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ থেকে বিভিন্ন পানীয় পান করছি, বেহেশ্তী হূরদের সাথে গলাগলি করছি। তারপরেই ধ্যান করেছি— আমাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হয়েছে, ভয়ানক কাঁটাযুক্ত যাক্কুমবৃক্ষ আমাকে খাওয়ানো হচ্ছে, পচা দুর্গন্ধময় পূঁজ আমাকে পান করানো হচ্ছে, জাহান্নামের বেড়ী ও জিঞ্জির দিয়ে আমাকে বাঁধা হয়েছে। সেখানেই আমি আমার নফ্সকে জিজ্ঞাসা করলাম—ওহে! এখন বল, তুমি কি চাও। সে বললো, আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক ; আমি সৎভাবে চলবো। আমি বললাম ঃ নাও, তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ হয়েছে ; তুমি দুনিয়াতেই আছ, খবরদার! খুব সতর্ক হয়ে চলবে।"

হযরত মালেক ইব্নে দীনার (রহঃ) বলেন ঃ আমি হাজ্জাজকে খুতবা দিতে শুনেছি, সে বলছিল ঃ "আল্লাহ্ পাক সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে অন্যের খোঁজ-খবর ও হিসাব নেওয়ার পূর্বে নিজের খবর নেয় ; অন্যের জন্যে মাথা ঘামানোর আগে নিজের হিসাব চুকায়। আল্লাহ্ পাক রহম করুন সেই ব্যক্তির উপর, যে নিজের নফ্সকে লাগাম দিয়ে আবদ্ধ করে নিয়েছে, অতঃপর সে যাচাই করে যে, তার সর্ববিধ কাজে নিয়ত ও উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ্ পাক রহম করুন সেই ব্যক্তির উপর, যে এ কথার চিন্তা করে যে, আমার আমলনামার ওজন ও পরিমাপ কতটুকু হয়েছে। এ ধরনের আরও বহু কথা সে তাঁর বক্তব্যে একাধারে বলে যাচ্ছিল ; অবশেষে সে ভীষণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে।

হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি জ্বলন্ত প্রদীপে আগুনের অতি সন্নিকটে নিজের অঙ্গুলি রাখতেন। যখন আগুনের উত্তাপ অনুভব করতেন, তখন নফ্সকে সম্বোধন করে বলতেন, ওহে মুসলিম দাবীদার! আজকে তুই অমুক অন্যায় কাজটি কেন করেছিস? অমুক দিন অমুক অপরাধটি কেন করেছিলে?

অধ্যায় ঃ ৮১

সৎকাজ ও পাপকার্যের সংমিশ্রন

হযরত মাক্বিল ইব্‌নে ইয়াসার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "মানুষের উপর এমন সময় আসবে, যখন পবিত্র কুরআন তাদের অন্তরে পুরাতন বলে অনুভূত হবে—যেরূপ শরীরে কাপড় পুরাতন অনুভূত হয়। সে সময়ের লোকদের প্রত্যেকটি কাজ লোভ ও স্বার্থের সাথে জড়িত হবে ; আল্লাহর ভয় কিছুমাত্রও থাকবে না। তাদের মধ্যে যদি কেউ নেক আমল করে, তবে সে নিজেই বলে যে, আল্লাহ্ কবূল করে নিবেন। আর কোন গুনাহের কাজ করলে বলে যে, আল্লাহ্ মাফ করবেন।"

বস্তুতঃ কুরআনুল করীমের ভীতিপ্রদ ও সতর্ককারী আয়াতসমূহ সম্পর্কে এসব লোকের কোনই জ্ঞান নাই, এজন্যেই তারা ভয় ও শাস্তির চিন্তা না করে লোভ ও স্বার্থের বশবর্তী হচ্ছে। পবিত্র কুরআনে নাসারাদের সম্পর্কে অনুরূপ খবর দেওয়া হয়েছে, যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ

"তাদের পর এমন লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো, যারা তাদের নিকট থেকে (কিন্তু তারা কিতাবের বিনিময়ে) এই তুচ্ছ দুনিয়ার ধন-সম্পদ গ্রহণ করে এবং বলে যে, "নিশ্চয়ই আমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবো।" (আ'রাফ ঃ ১৬৯)

অর্থাৎ উত্তরাধিকারে তারা কিতাবী বিদ্যা প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু তাদের অবস্থা এই যে, দুনিয়ার মায়া-মোহে তারা লিপ্ত হয়ে রয়েছে; হালাল-হারামের কোন বাছ-বিচার না করে প্রবৃত্তির অনুসরণে দুনিয়া-উপার্জনে লিপ্ত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

"যারা আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয় ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান।" (রাহ্‌মান ঃ ৪৬)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۝

"এ তাদের প্রত্যেকের জন্য, যারা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে এবং আমার শাস্তিকে ভয় করে।" (ইব্‌রাহীম ঃ ১৪)

কুরআনুল-করীমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবই সতর্কীকরণ ও ভয়-প্রদর্শন। যে কেউ মনোযোগ ও চিন্তা সহকারে কুরআনে করীম অধ্যয়ন করবে, অবশ্যই তার জীবনে এর প্রভাব পড়বে এবং আখেরাতের ফিকির ও আল্লাহ্‌র ভয় তার অন্তরে জাগরুক হবে ; যদি সে মুমিন হয়ে থাকে। কিন্তু আজকালকার অবস্থা এই যে, মানুষ কেবল কুরআনের বাহ্যিক উচ্চারণ ও শব্দাবলীর পেছনেই পড়ে রয়েছে ; এমনকি এসব বাহ্যিকতার জন্য পরস্পর বিতর্ক ও বাহাস-মোনাযারায় পর্যন্ত মগ্ন হচ্ছে, আর তিলাওয়াতের প্রশ্নে যে ভাব ও সুর অবলম্বন করা হয়, তাতে মনে হয় যেন আরবী কবিতা ও পংক্তি আবৃত্তি করা হচ্ছে। মোটকথা, তাদের কুরআনের আসল অর্থ, উদ্দেশ্য এবং সে অনুযায়ী বাস্তব আমলের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ নাই। আফ্‌সূস! এর চেয়ে বড় বঞ্চনা ও ধোকাগ্রস্ততা দুনিয়াতে আর কি আছে? এর কাছাকাছি আফ্‌সূসজনক অবস্থা হচ্ছে তাদের যাদের আমল মিশ্রিত; কিছু ভাল আর কিছু মন্দ, কিন্তু মন্দের পরিমাণই বেশী। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা (তওবা ব্যতীতই) আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা রাখে ; তারা এই ধারণায় মত্ত রয়েছে যে, তাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে। বস্তুতঃ এরাও পূর্বোক্তদের ন্যায় ধোকা ও প্রতারণার শিকার হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা অনেক বড় জাহালত ও মূর্খতা বৈ কিছু নয়। ধোকা ও প্রতারণার শিকার এ উভয়বিধ লোকদেরকে তুমি দেখবে—একদিকে তারা হালাল-হারামে মিশ্রিত যৎসামান্য সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় সদ্‌কা করে, কিন্তু অপরদিকে মুসলমানদের প্রচুর পরিমাণ মাল-সম্পদ আত্মসাৎ করছে এবং অন্যান্য হারাম উপায়ে সম্পদ উপার্জনে মত্ত রয়েছে। আর এহেন হারাম থেকেই সদকা-খয়রাত করে মুক্তি ও নেকীর

আশা করে রয়েছে। তারা মনে করে নিয়েছে যে, হারাম উপায়ে অর্জিত কিংবা হালাল উপায়েই হোক, তা থেকে দশ দিরহাম সদ্‌কা করে দিলে হারামের হাজার দিরহাম তাদের জন্য হালাল হয়ে যাবে। ধিক্‌ তাদের মানসিকতার উপর। বস্তুতঃ এটা এমন হলো যে, দাঁড়ির এক পাল্লায় দশ দিরহাম অপর পাল্লায় হাজার দিরহাম রেখে দশের পাল্লার ওজন হাজারের পাল্লা অপেক্ষা ভারী হওয়ার প্রত্যাশা করলো। আফ্‌সূস! অজ্ঞতারও তো কোন অবধি থাকা চাই।

আবার এদের মধ্যে অনেকেই এমন এয়েছে, যারা ধারণা করে যে, তাদের নেক আমলের পরিমাণ মন্দ আমল অপেক্ষা বেশী। কাজেই নফ্‌স ও প্রবৃত্তির হিসাব-মোহাসাবা ও নিয়ন্ত্রণের প্রতি মোটেই আগ্রহী হয় না এবং মন্দ ও গুনাহের কার্যাবলী মিটাতে এতটুকু চেষ্টারত হয় না। বরং সামান্য কিছু ইবাদত ও নেক আমল করে ফেললে সেটা হিসাব কষে স্মরণশক্তির মণিকোঠায় সংরক্ষিত করে রাখে। যেমন কেবল মুখে 'আস্তাগফিরুল্লাহ্‌' উচ্চারণ করে কিংবা দিনে একশত বার 'সুব্‌হানাল্লাহ্‌' পড়ে অবশিষ্ট সম্পূর্ণ সময় মুসলমানদের কুৎসাবাদ, নিন্দা-গীবত, ইয্‌যত-সম্মান বিনষ্টকরণ ও আল্লাহ্‌র মর্জীর খেলাফ অজস্র-অগণিত অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত রইল আর মনে মনে প্রত্যাশা করলো যে, 'সুব্‌হানাল্লাহ্‌' 'আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ্‌' পড়ে রেখেছি ; এর বিনিময়ে নেকী লাভ করবো। অথচ সারাদিনব্যাপী যেসব অন্যায় ও অহেতুক কথায় লিপ্ত রয়েছে তাতে যে পরিমাণ গুনাহ্‌ হলো, তা পূর্বোক্ত একশত বার তসবীহ্‌ বরং হাজার বার অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী এবং ফেরেশ্‌তাগণ তা লিপিবদ্ধও করে নিয়েছেন—সেদিকে মোটেও খেয়াল করলো না। এদিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা মানবের প্রতিটি কথার হিসাব-নিকাশের বিষয় পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করে রেখেছেন, ইরশাদ হয়েছেঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ○

"সে (মানুষ) যে কোন কথা মুখ হতে বের করা মাত্র তার নিকটেই একজন নেগাহ্‌গান (ফেরেশ্‌তা) প্রস্তুত রয়েছে (সে লিপিবদ্ধ করে নেয়)" (ক্বাফ ঃ ১৮)

অথচ এসব লোক সব সময়ই কেবল তাদের তসবীহ্‌, তাহ্‌লীল ও

সওয়াব গণনার মধ্যেই থেকে যায় ; ওদিকে গীবত, মিথ্যা, চুগলখোরী ও মুনাফেকী প্রভৃতি পাপে লিপ্ত লোকদের জন্য যে কি মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে, সেদিকে মোটেও দৃষ্টিপাত করে না। বস্তুতঃ এ সবকিছু ধোকা ও প্রতারণার শিকার হওয়ার জঘন্যতম পরিণতি ছাড়া কিছু নয়। অবস্থা এই যে, তাদের 'সুব্হানাল্লাহ্' পাঠে যতটুকু নেকী হয়েছিল, অন্যায় ও বেহুদা কথার একাংশ দ্বারাই তা শেষ হয়ে গেছে ; এর অতিরিক্ত অন্যায় ও বেহুদা কথা লিপিবদ্ধ করার বিনিময়ে ফেরেশ্তাগণ যদি তাদের নিকট পারিশ্রমিক দাবী করে তবে অবশ্যই তারা নিজেদের জিহ্বাকে সংযত করে নিবে এবং অন্যায় বা বেহুদা কথা বলা থেকে অবশ্যই বিরত হবে ; এমনকি জরুরী ও আবশ্যকীয় কথা বলাও বন্ধ করে দিবে। আর কড়া হিসাব করে রাখবে, যাতে তসবীহের সংখ্যা অপেক্ষা বেহুদা বাক্যালাপের সংখ্যা বেড়ে না যায় ; যার ফলে পারিশ্রমিক প্রদানের অর্থদণ্ডে পতিত হতে না হয়।

অতীব আক্ষেপ ও পরিতাপের সাথে আশ্চর্যান্বিত হতে হয় এদের অবস্থা দৃষ্টে যে, দুনিয়ার সামান্যতম সম্পদের জন্য কড়া অংক কষে হিসাব-নিকাশে কোন ত্রুটি করে না, বরং সর্বদা শংকিত সাবধানতা অবলম্বন করে থাকে, যাতে পার্থিব সামান্যতম অংশও বরবাদ না হয়। অথচ অতি উচ্চতর মর্যাদার স্থান জান্নাতুল-ফেরদাউস ও তন্মধ্যস্থ নেয়ামতরাজির বর্বাদি ও বঞ্চনার জন্য তাদের মোটেও কোন চিন্তা ও সতর্কতা নাই। এহেন দুরবস্থা বস্তুতই দুঃখজনক ও বড়ই মারাত্মক। এ সবের অনিবার্য ফলশ্রুতিতে আমরা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছি যে, এসব তথ্যের বিষয়ে যদি মনে সন্দেহ পোষণ করি, তবে সত্যকে অস্বীকারকারী কাফেরে পরিণত হই, আর যদি বিশ্বাস করি, তবে ধোকাগ্রস্ত বোকা ও আহমকে পরিগণিত হই। চিন্তা করলে বাস্তবিকই এ কথা সাব্যস্ত হয় যে, আমাদের আমল-আখলাক সেরূপ নয়, যেরূপ কুরআন মজীদের অনুসারীদের হওয়া উচিত ছিল— আমরা আল্লাহ্র কাছে কুফ্রীর দিকে ধাবিত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। অতি মহান ও পবিত্র সত্তা আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন। এতোসব বর্ণনার পরও যদি কেউ গাফলত ও উদাসীনতার দরুন সতর্ক-সাবধান হওয়া এবং একীন ও ঈমানী বিশ্বাসে দীপ্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে, তবে সেটা তারই কসূর; তারই অপরাধ।

অধ্যায় ঃ ৮২

জামা'আতে নামায পড়ার ফযীলত

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً ـ

"জামা'আতে নামায আদায় করা একা নামায পড়া অপেক্ষা সাতাইশ গুণ অধিক মর্যাদা রাখে।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত—একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে জামা'আতে উপস্থিত পান নাই। তখন তিনি বলেছেন ঃ "আমি ইচ্ছা করেছি কাউকে (আমার স্থলে) ইমামতি করার হুকুম দিয়ে যারা জামা'আতে হাজির হয় নাই তাদের বাড়ী যাবো ; অতঃপর তাদের সহ তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিবো। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, যারা জামা'আতে হাজির হয় নাই, তাদের নিকট যাবো এবং কিছু লাকড়ি একত্র করা হবে অতঃপর এতে আগুন ধরিয়ে তাদেরকে জ্বালিয়ে ফেলা হবে। অথচ তাদের কেউ যদি একটা গোশত মিশ্রিত হাড়ের অথবা দু'টি ভালো ক্ষুরের খবর পেতো, তবে নিশ্চয় এই জামা'আতে অর্থাৎ ইশার জামা'আতে হাজির হতো।"

হযরত উসমান (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ

مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ وَمَنْ شَهِدَ الصُّبْحَ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً

"যে ব্যক্তি ইশার নামায জামা'আতের সাথে আদায় করলো, সে যেন অর্ধেক রাত নামাযে কাটালো, আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাযও জামা'আতে

আদায় করলো, সে যেন সারা রাত্র নামাযে অতিবাহিত করলো।”

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, “যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে নামায আদায় করলো, সে যেন এক সাগর পরিমাণ ইবাদত করলো।”

হযরত সাঈদ ইব্‌নে মুসাইয়্যাব (রহঃ) বলেন ঃ “বিশ বৎসর যাবৎ আমার অভ্যাস এই যে, মুআয্‌যিন যখন আযান দেয়, তখন আমি (পূর্ব থেকেই) মসজিদে উপস্থিত থাকি।”

হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে ওয়াসে' (রহঃ) বলেন, “দুনিয়াতে কেবল এই তিনটা জিনিসের আমার বড়ই সাধ— এক. আমার হিতাকাংখী এমন একজন ভাই, যিনি আমার ভুল সংশোধন করবেন এবং বক্র পথে চলা থেকে বারণ করবেন। দুই. অল্প খোরাক, যেটির বিষয়ে আল্লাহ্‌র কাছে হিসাব দিতে না হয়। তিন. আলস্যমুক্ত বা-জামা'আত নামায, যার সওয়াব আমার আমলনামায় লিখিত হবে।”

বর্ণিত আছে, হযরত আবূ উবাইদাহ্ ইব্‌নে জার্‌রাহ্ (রাযিঃ) একদা কিছু লোকের ইমামতি করেছিলেন, অতঃপর তিনি বলেছিলেন, শয়তান পূর্ব থেকেই আমার পিছনে লেগে রয়েছে—এর প্রতারণার ফলে অন্যের উপর আমার গুরুত্বের অনুভব হচ্ছে, সুতরাং ভবিষ্যতে আমি আর কখনও ইমামতি করবো না।”

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন, “যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের মজলিসে উপস্থিত হয় না, এমন ব্যক্তির ইমামতিতে তোমরা নামায পড়ো না।”

ইমাম নখ্‌য়ী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইল্‌ম ছাড়া নামাযে ইমামতি করে, তার উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সমুদ্রের পানির পরিমাপ করতে লাগলো; অথচ এর কম-বেশী হওয়া সম্পর্কে সে কিছুই জানে না।”

হযরত হাতেম আসাম্ম (রহঃ) বলেন, “আমার নামাযের জামা'আত ছুটে গেছে সংবাদ পেয়ে একমাত্র আবূ ইসহাক বুখারীই আমাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছেন ; অথচ আমার পুত্র মারা গেলে দশ হাজারের অধিক লোক আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য হাজির হতো— আফ্‌সূস! মানুষের দৃষ্টিতে দুনিয়াবী মুসীবতের চেয়ে দ্বীনি মুসীবত অধিক সহজ (সহনীয়) হয়ে গেছে।”

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনার পরও

তা' কবূল করলো না (অর্থাৎ নামাযের জন্য মসজিদে হাজির হলো না), মূলতঃ সে নিজেই নিজের মঙ্গল কামনা করে না সুতরাং অন্য কেউ তার মঙ্গল কামনা করতে পারে না।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ "আদম সন্তানের কান যদি গলিত সিসা দ্বারা ভরে দেওয়া হয়, তবুও সেটা আযান শুনে মসজিদে না আসার চেয়ে কম মারাত্মক।"

একদা হযরত মাইমূন ইব্‌নে মিহ্‌রান (রহঃ) জামা'আতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে উপস্থিত হলেন, কেউ তাঁকে জানালো, জামা'আত শেষ হয়ে গেছে, লোকেরা সব চলে গেছে, তখন তিনি বললেন ঃ "ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন—জামা'আতের সাথে নামায পড়া আমার নিকট (তদানীন্তন) ইরাকের 'বাদশাহীর' চেয়েও অধিক মূল্যবান।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি তকবীরে উলা সহকারে চল্লিশ দিন জামা'আতের সাথে নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য দুই বিষয়ে মুক্তির সনদ লিখে দিবেন ঃ এক. মুনাফেকী থেকে। দুই. জাহান্নাম থেকে।"

বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন এমন কিছু লোক হবেন, যাদের চেহারা উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় চমকাতে থাকবে। ফেরেশ্‌তাগণ জিজ্ঞাসা করবেন, দুনিয়াতে আপনারা কি আমল করতেন? উত্তরে তাঁরা বলবেন ঃ আমরা আযান শুনার সাথে সাথে অন্য সমস্ত কাজ ত্যাগান্তে উযূ করে নামাযের জন্য প্রস্তুত হতাম। অতঃপর আরও একদল লোক আসবেন, যাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। জিজ্ঞাসা করার পর তাঁরা বলবেন ঃ 'আমরা ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই উযূ করে নিতাম। অতঃপর আরও একদল আসবেন, যাদের চেহারা সূর্যের ন্যায় চমকাতে থাকবে, তাঁরা বলবেন ঃ আমরা মসজিদে বসেই আযান শুনতাম।"

বর্ণিত আছে, বুযুর্গানে দ্বীনের তরীকা ছিল, যদি কোনসময় তাদের তকবীরে উলা ফউত হয়ে যেতো, তবে তারা তিন দিন পর্যন্ত আফ্‌সূস করতেন আর যদি জামা'আত ফউত হয়ে যেতো, তবে সাত দিন পর্যন্ত আফ্‌সূস করতেন।

অধ্যায় ঃ ৮৩

তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলত

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ

"আপনার রব্ব অবগত আছেন যে, আপনি ও আপনার সঙ্গীগণের মধ্যে কতিপয় লোক কখনও রাত্রির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এবং অর্ধেক রাত্রি আবার রাত্রির এক তৃতীয়াংশ দণ্ডায়মান থাকেন।" (মুয্যাম্মিল ঃ ২০)

আরও বলেন ঃ

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝

"নিঃসন্দেহে রাত্রিকালে উঠা অন্তর ও শব্দের সংযমের পক্ষে বিশেষ ক্রিয়াশীল এবং শব্দ খুব ঠিক ঠিক উচ্চারিত হয়।" (মুয্যাম্মিল ঃ ৬)

আরও ইরশাদ করেন ঃ

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

"তাদের পাঁজরসমূহ শয্যা হতে পৃথক থাকে।" (সিজদাহ্ ঃ ১৬)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ

"যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায় ইবাদত করতে

থাকে, পরকালকে ভয় করে এবং স্বীয় রব্বের রহমতের প্রত্যাশা করে” (যুমার ঃ ৯)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ۝

“আর যারা রাত্রিকালে নিজ রব্বের সম্মুখে সেজদা ও কিয়াম অবস্থায় (নামাযে) মশগুল থাকে।” (ফুরকান ঃ ৬৪)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ

“ধৈর্য ও নামায দ্বারা সাহায্য লও।” (বাকারা ঃ ৪৫)

এক অভিমত অনুযায়ী এক্ষেত্রে উল্লিখিত নামাযের দ্বারা গভীর রাতের তাহাজ্জুদের নামাযকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ ধৈর্যের মাধ্যমে তোমরা ইবাদত ও সাধনার জন্য সাহায্য লাভ কর।

হাদীস শরীফে আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ “কোন ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়লে শয়তান তার ঘাড়ের পিছন দিকে তিনটা গিরা লাগিয়ে দেয়, প্রতিটি গিরা লাগানোর সময় সে বলে থাকে ঃ “রাত্রি অনেক লম্বা ; এখনও প্রচুর সময় বাকি আছে, তুমি ঘুমিয়ে থাক।” জাগ্রত হওয়ার পর যদি সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ (যিক্‌র) করে, তবে তার একটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর যদি উযূ করে, তবে আরেকটি গিরা খুলে যায়। তার পর যদি নামায পড়ে, তবে তৃতীয় গিরাটিও খুলে যায়। এভাবে সে স্বচ্ছ-পবিত্র মন নিয়ে সকাল করে। অন্যথায় তার সকাল হয় ক্লেদ ও আলস্যের মধ্য দিয়ে।”

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলো—সে সারা রাত্র সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল্‌লেন ; “সে এমন ব্যক্তি, যার কানে শয়তান প্রস্রাব করে দিয়েছে।”

বর্ণিত আছে শয়তানের নিকট নস্য, চাটনি এবং এক প্রকার ছিটিয়ে দেওয়ার মত পদার্থ আছে। যে ব্যক্তি শয়তানের নস্য ব্যবহার করে সে

দুষ্টরিত্র হয়ে যায়, যে তার চাটনি আস্বাদন করে তার যবানে অকথ্য ভাষার প্রয়োগ তীব্র রূপ ধারণ করে এবং যে ব্যক্তির উপর শয়তান তার 'ছিটিয়ে দেওয়ার পদার্থ' প্রয়োগ করে সে সারা রাত্র ঘুমাতে থাকে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا الْعَبْدُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ خَيْرٌ لَّهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِي لَفَرَضْتُهُمَا عَلَيْهِمْ

"বান্দার রাত্রির মধ্যভাগের দুই রাকআত নামায সমগ্র দুনিয়া এবং দুনিয়ার সবকিছু হতে উত্তম। আমার উম্মতের জন্য কষ্ট হবে যদি মনে না করতাম তবে আমি এই নামায তাদের উপর ফরয করে দিতাম।"

হযরত জাবের (রাযিঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে—"রাত্রিতে এমন একটি সময় আছে, কোন বান্দা সে সময়টিতে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যে কোন নেক দো'আ করে তিনি তা কবূল করেন।" অন্য এক সূত্রে জানা যায় সে বিশেষ সময়টি সারা রাত্র বিদ্যমান থাকে।

হযরত মুগীরা ইব্‌নে শু'বাহ্ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামাযে এতো দীর্ঘ সময় কিয়াম করতেন যে, তাঁর দুই পা মুবারক ফেঁটে যেতো। একদা আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সকল গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন ; তবুও আপনি কেন এতো কষ্ট করেন? তিনি জওয়াব দিয়েছেন, "তবে কি আমি আল্লাহ্র শোকর গুযার বান্দা হবো না?" অর্থাৎ এভাবে কষ্ট-সাধনার মাধ্যমে আমি আমার প্রভুর কৃতজ্ঞতা আদায় করে থাকি"—ফলে, আল্লাহ্র দরবারে তাঁর মর্যাদা অধিকতর বৃদ্ধি পায়। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ

"যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি তোমাদেরকে অধিক দান করবো।" (ইব্‌রাহীম ঃ ৭)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "হে আবূ হুরাইরাহ্! তুমি যদি আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহ তোমার সমগ্র জীবনে, মৃত্যুর মুহূর্তে, মৃত্যুর পর কবরে, হাশরের ময়দানে পেতে চাও—এ আকাংখা যদি তোমার অন্তরে থাকে, তবে তুমি গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড় ; এতে তোমার উদ্দেশ্য থাকা চাই একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করা। হে আবূ হুরাইরাহ্! তুমি তোমার গৃহাভ্যন্তরে কোণে কোণে নামায আদায় কর, তাহলে তোমার ঘর আসমানবাসীদের দৃষ্টিতে এমনভাবে চমৎকৃত হবে যেমন দুনিয়াবাসীদের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল নক্ষত্র চমকাতে থাকে।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, "তাহাজ্জুদ নামায পড়া তোমরা জরূরী করে নাও ; কেননা এ ছিল তোমাদের পূর্ববর্তী নেক বান্দাদের অভ্যাস।" এ নামাযের ওসীলায় আল্লাহ্র পরম নৈকট্য লাভ হয়, গুনাহ্ মাফ হয়, যাবতীয় দৈহিক রোগ নিরাময় হয়, পাপাচার থেকে আত্মরক্ষার উপায়ও হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি রাত্রের নামাযে অভ্যস্ত হয়, কোন সময় ঘুমের প্রাবল্যে যদি সে নামায পড়তে না পারে, আল্লাহ্ তা'আলা তার আমলনামায় তার সওয়াব লিখে দেন ; আর ঘুম হয় তার জন্য সদকাস্বরূপ।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ যর গিফারী (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ তুমি যখন কোন সফরের পরিকল্পনা কর, তখন অবশ্যই কোন পাথেয়ের ব্যবস্থা করে থাক ; তাহলে আখিরাতের সফরের জন্য তুমি কি সম্বল করেছ, আমি কি তোমার পরপারের সেই সম্বলের কথা বলে দিবো? হযরত আবূ যর আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর আমার মা-বাপ কুরবান হোন অবশ্যই আপনি তা আমাকে বলে দিন। ইরশাদ করলেন ঃ কঠিন গ্রীষ্মের দিনে রোযা রাখ হাশরের ময়দানে নিরাপদ থাকবে। রাতের অন্ধকারে (তাহাজ্জুদ) নামায পড় কবরের বিভীষিকা দূর হবে। আর বড় বড় বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য হজ্জ কর। আর গরীব-মিসকীনকে সাহায্য কর—তাদের পক্ষে কোন হক কথা বলে অথবা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হতে বিরত থেকে হলেও।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক সাহাবীর অভ্যাস ছিল রাত্রিকালে লোকেরা যখন শুয়ে যেতো এবং গভীর ঘুমে বিভোর থাকতো, তখন তিনি নামাযে মগ্ন হয়ে যেতেন, কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে এই বলে দো'আ করতেন ঃ "হে রব্ব! আমাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা কর।" হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিষয় জানতে পেরে বললেন, যে সময় সে দো'আ করতে থাকে, তখন তোমরা আমাকে জানিও। এভাবে একদা তিনি তাঁর দো'আ শুনে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "ওহে! তুমি আল্লাহ্‌র কাছে বেহেশত চাওনা কেন?" তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সেই উপযুক্ত নই, আমার আমল সেই মর্যাদায় পৌছতে সক্ষম নয়।" এর কিছুক্ষণ পর হযরত জিব্রীল আলাইহিস সালাম এসে হুযূরকে জানালেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাঁকে জানিয়ে দিন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য দোযখ হারাম করে দিয়েছেন এবং তাকে বেহেশ্‌তে দাখিল করে নিয়েছেন (অর্থাৎ ফয়সালা হয়ে গেছে)।"

বর্ণিত আছে, একদা হযরত জিব্রীল আলাইহিস সালাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বলেছেন ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) কতই না ভালো লোক যদি তিনি রাতে নামায পড়েন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এ কথা জানানোর পর তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন।"

হযরত নাফে' (রাযিঃ) বলেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামায পড়তে থাকতেন ; তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, হে নাফে'! সুব্‌হে সাদিক হয়ে গেছে? আমি (পূর্বাকাশ দেখে) বলতাম, না, তখন পুনরায় তিনি নামায আরম্ভ করতেন। অনুরূপভাবে আবার জিজ্ঞাসা করলে আমি (পূর্বাকাশ দেখে) বলতাম, হাঁ সুব্‌হে সাদিক হয়ে গেছে, তখন তিনি বসে এস্তেগফারে রত হয়ে যেতেন, এভাবে ফজর পর্যন্ত তিনি আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাত প্রার্থনা করতে থাকতেন।

হযরত আলী ইব্‌নে আবী তালিব (রাযিঃ) বলেন ঃ এক রাত্রিতে হযরত ইয়াহ্‌য়া আলাইহিস সালাম তৃপ্ত হয়ে যবের রুটি আহার করেছিলেন। ফলে, সেই রাত্রিতে তিনি যিকর–আযকার না করেই শুয়ে পড়েছিলেন এবং এভাবে সকাল হয়ে যায়। পরদিন আল্লাহ্ তা'আলা ওহী পাঠালেন ঃ হে ইয়াহ্‌য়া!

তুমি কি আমার বেহেশ্‌তের চেয়েও উত্তম কোন আবাসস্থল পেয়ে গেছ? আমার সান্নিধ্যের চেয়েও উত্তম কোন সাহচর্য তুমি পেয়েছ? কেন তোমার এই অবসাদ? আমার ইয্‌যত ও প্রতাপের কসম, তুমি যদি আমার তৈরী বেহেশ্‌তের প্রতি একবার নজর কর, তবে অবশ্যই আশা–আকাংখা ও আগ্রহের আতিশয্যে তোমার চর্বি বিগলিত হয়ে যাবে এবং তোমার প্রাণ নির্গত হয়ে যাবে। আর দোযখের প্রতি যদি এক পলক তাকাও, তবে ভয়ের আধিক্যে তোমার চর্বি গলে যাবে, পূঁজের অশ্রুধারায় ক্রন্দন করবে এবং নরম পোষাক পরিহার করে চামড়ার পোষাক পরিধান করবে।"

একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করা হলো, জনৈক ব্যক্তি রাতে নামায পড়ে কিন্তু ভোরে ঘুম থেকে উঠে চুরি করে। তিনি বললেন, শীঘ্রই নামায তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা রহম করুন সেই ব্যক্তির উপর, যে রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায় আর যদি স্ত্রী উঠতে অস্বীকার করে তবে তার মুখে পানির ছিটা দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা সেই মহিলার উপর রহম করুন, যে রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে এবং নিজের স্বামীকেও জাগায় আর স্বামী উঠতে অস্বীকার করলে তার মুখে পানির ছিটা দেয়।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "যখন কোন ব্যক্তি রাতে তার স্ত্রীকে জাগায় এবং তারা দু'জনে দু'রাকাত (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ে, তাদের দু'জনের নাম অধিক যিকরকারী ও যিকরকারিনীদের মধ্যে লিখে নেওয়া হয়।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ "ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায।"

হযরত উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজের নির্ধারিত ওযীফা বা রাতের কোন আমল (নামায ইত্যাদি) না করে ঘুমিয়ে পড়ে, অতঃপর সে তা ফজর ও যোহরের মাঝখানে পড়ে নেয়, তার জন্য এমন সওয়াব লিখিত

হয় যেন সে রাতেই তা আমল করেছে।”

বর্ণিত আছে, ইমাম বুখারী (রহঃ) নিম্নের এ দু'টি পংক্তির নমুনা ছিলেন ঃ

اِغْتَنِمْ فِي الْفَرَاغِ فَضْلَ رُكُوْعٍ
فَعَسٰى اَنْ يَكُوْنَ مَوْتُكَ بَغْتَةً

“অবসর পেলেই কিছু (দু' রাকআত) নফল নামায পড়ে নাও—এ তোমার জন্য মহাসম্পদ। অসম্ভব কিছু নয়—অকস্মাৎ তোমার মৃত্যু এসে যেতে পারে।”

كَمْ صَحِيْحٍ رَأَيْتُ مِنْ غَيْرِ سُقْمٍ
خَرَجَتْ نَفْسُهُ الصَّحِيْحَةُ فَلْتَةً

“বহুবার তুমি দেখে থাকবে দিব্যি সুস্থ লোক যার কোন রোগ নাই, হঠাৎ তার মৃত্যু হয়ে গেছে।”

অধ্যায় ঃ ৮৪

উলামায়ে ছূ বা অসৎ আলেম

দুনিয়াদার ও অসৎ আলেম যারা, তারাই উলামায়ে ছূ। ইল্‌ম হাসিলের দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য থাকে, কেবল দুনিয়াবী নেয়ামত ও জাগতিক যাবতীয় দ্রব্য-সম্ভার জমা করা এবং উচ্চপদস্থ বড় বড় লোকদের কাছে মান-সম্মান ও মর্যাদা হাসিল করা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "কেয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কঠিন আযাব হবে সেই আলেমের যে নিজের ইল্‌ম দ্বারা উপকৃত হয় নাই।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا يَكُوْنُ الْمَرْءُ عَالِمًا حَتّٰى يَكُوْنَ بِعِلْمِهٖ عَامِلًا .

"যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আলেম হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের ইল্‌ম অনুযায়ী আমল না করবে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেনঃ ইল্‌ম দুই প্রকার ঃ এক প্রকার ইল্‌ম যা শুধু মুখের কথা ও ভাষায় ব্যক্ত করা পর্যন্ত সীমিত থাকে ; বস্তুতঃ এ ইল্‌ম অর্জনকারীর বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সাক্ষ্য ও প্রমাণস্বরূপ। দ্বিতীয় প্রকার ইল্‌ম হচ্ছে, অন্তর ও অভ্যন্তরের ইল্‌ম। বস্তুতঃ এটাই প্রকৃত ইল্‌ম ; এবং অর্জনকারীর জন্য এ ইল্‌মই নাফে' ও উপকারী।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

لَا تَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوْا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَتُمَارُوْا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلِتَصْرِفُوْا بِهٖ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْكُمْ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ

"তোমরা এ উদ্দেশ্যে ইল্‌ম অর্জন করো না যে, সমকালীন আলেমদের সাথে গর্ব করবে ; তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, নির্বোধ লোকদের সাথে বাক-বিতণ্ডা ও ঝগড়া করবে এবং মানুষকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করবে। কেননা, যে ব্যক্তি এহেন উদ্দেশ্যে ইল্‌ম হাসিল করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "কোন ব্যক্তিকে তার জানা বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে যদি সে তা গোপন করে তবে কেয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "আমি তোমাদের ব্যাপারে কতিপয় ব্যক্তিকে দাজ্জালের চেয়েও বেশী ভয়ঙ্কর মনে করি। কেউ জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা কারা? তিনি বললেন ঃ ভ্রষ্ট পথে পরিচালনাকারী সমাজ ও জাতির নেতারা।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি কেবল অধিক বিদ্যাই অর্জন করে গেল ; অথচ হেদায়াতের পথে আসলো না—এরূপ বিদ্যার্জন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ থেকে ক্রমবর্ধমান দূরত্বেরই কারণ হয়।"

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ "ওহে ! আর কতদিন অন্ধকার রাতের পথচারীদের জন্য পথ পরিস্কার করবে আর দিশাহারা লক্ষ্যচ্যুত লোকদের সহবাস গ্রহণ করে থাকবে!"

উপরোল্লিখিত রেওয়ায়াতসমূহ এবং আরও অন্যান্য রেওয়ায়াতে ইল্‌মের অপরিসীম গুরুত্ব বুঝা যায় এবং সেই সঙ্গে এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, ইল্‌ম হাসিল করার পর সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালন না করা খুবই ক্ষতিকর ও মারাত্মক অপরাধ। তাই, আলেম ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে তার সার্বিক দায়িত্ব পালন করে যেমন চির সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে, অপরদিকে এর বিপরীত করে সে চির ধ্বংসও হতে পারে। সুতরাং সে যদি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ইল্‌মের হক ও দায়িত্ব আদায় না করে, তাহলে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হবে।

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন ঃ এই উম্মতের মধ্যে আমি ইল্‌মধারী

মুনাফিকের বিষয়টিকে বড় ভয়ঙ্কর ও আশংকাজনক বোধ করি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে আমীরুল মুমেনীন! আলেম মুনাফেক হয় কি করে? তিনি বললেন ঃ মুখের ভাষায় ও কথনে সে বড় বিদ্বান ও আলেম, কিন্তু অন্তর এবং আমল এ উভয় দিক থেকেই সে জাহেল–মূর্খ।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেছেন ঃ "খবরদার! তুমি ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা বড় বড় বিদ্বান লোকের বিদ্যা এবং বড় বড় তত্ত্বজ্ঞানীদের প্রজ্ঞা একত্রিত করে নিয়েছে ; কিন্তু আমলের প্রশ্নে একেবারে শূন্য ; নির্বোধ ও অজ্ঞ লোকদের পথ ধরেছে।"

এক ব্যক্তি হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)–এর নিকট আরজ করলোঃ আমার ইল্‌ম হাসিল করতে ইচ্ছা হয় ; কিন্তু আশংকা বোধ করি যে, হয়তঃ আমি ইল্‌মের হক আদায় করতে পারবো না ; বরং আরো বরবাদ করবো। হযরত আবূ হুরাইরাহ্ বললেন ঃ "ইল্‌ম হাসিল না করাও মূলতঃ ইল্‌মকে বরবাদ করার অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌নে উয়াইনাহ্ (রহঃ)–কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলঃ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লজ্জিত হয় কে? তিনি বলেছেন ঃ দুনিয়াতে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী লজ্জিত হয়, যে অকৃতজ্ঞ লোকের প্রতি এহ্‌সান ও অনুগ্রহ করে। আর আখেরাতে সবচেয়ে বেশী লজ্জিত হবে অসৎ আলেম।"

হযরত খলীল ইব্‌নে আহ্‌মদ (রহঃ) বলেন ঃ

اَلرِّجَالُ اَرْبَعَةٌ رَجُلٌ يَدْرِىْ وَيَدْرِىْ اَنَّهٗ يَدْرِىْ فَذٰلِكَ عَالِمٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَرَجُلٌ يَدْرِىْ وَلَا يَدْرِىْ اَنَّهٗ يَدْرِىْ فَذٰلِكَ نَائِمٌ فَاَيْقِظُوْهُ وَرَجُلٌ لَا يَدْرِىْ وَيَدْرِىْ اَنَّهٗ لَا يَدْرِىْ فَذٰلِكَ مُسْتَرْشِدٌ فَاَرْشِدُوْهُ وَرَجُلٌ لَا يَدْرِىْ وَلَا يَدْرِىْ اَنَّهٗ لَا يَدْرِىْ فَذٰلِكَ جَاهِلٌ فَارْفُضُوْهُ

"লোকেরা সাধারণতঃ চার প্রকারের হয়ে থাকে ঃ

এক. যে জানে (অর্থাৎ ইল্‌ম শিক্ষা করেছে) এবং এ কথাও জানে (অর্থাৎ অনুভূতি রাখে) যে, সে জানে (অর্থাৎ নিজের ইল্‌মের দায়িত্বজ্ঞান আছে), এরূপ ব্যক্তি সত্যিকার আলেম ; তোমরা তার অনুসরণ কর।

দুই. যে জানে এবং একথা জানে না যে, সে জানে—এরূপ লোক ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে ; তাকে তোমরা জাগ্রত কর।

তিন. যে জানে না (অর্থাৎ নিরক্ষর) এবং এ কথা জানে (অর্থাৎ অনুভূতি আছে) যে, সে জানে না— এরূপ ব্যক্তি সত্যপথের অনুসন্ধানী ; তাকে তোমরা সত্য ও হেদায়াতের পথ দেখিয়ে দাও।

চার. যে জানে না (অর্থাৎ অজ্ঞ-মূর্খ) এবং এ কথাও জানে না যে, সে জানে না— এ ব্যক্তি জাহেল, দাম্ভিক ; তাকে তোমরা পরিহার কর এবং এ থেকে বেঁচে চল।"

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ

يَهْتِفُ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ اَجَابَهُ وَاِلَّا ارْتَحَلَ ـ

"ইল্‌ম চিৎকার করে আমলের দাবী জানায়, যদি তার দাবী ও আহ্বানে সাড়া দেওয়া হয় অর্থাৎ আলেম ব্যক্তি তার ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে, তবে সেই ইল্‌ম তার কাছে থাকে, অন্যথায় সে বিদায় নিয়ে নেয়।"

হযরত ইব্‌নে মুবারক (রহঃ) বলেন ঃ

لَا يَزَالُ الْمَرْءُ عَالِمًا مَا طَلَبَ الْعِلْمَ فَإِذَا ظَنَّ اَنَّهُ قَدْ عَلِمَ فَقَدْ جَهِلَ ـ

"একজন লোক সত্যিকার আলেম বা জ্ঞানী হতে হলে সর্বদা (নিজকে মুখাপেক্ষী জ্ঞান করে) জ্ঞান-অন্বেষায় মগ্ন থাকতে হবে। আর যদি সে নিজকে আলেম বা জ্ঞানী ভেবে নেয়, তাহলে সে প্রকৃত আলেম বা জ্ঞানী নয় ; জাহেল মূর্খ।"

হযরত ফুযাইল ইব্‌নে ইয়ায (রহঃ) বলেন ঃ তিন শ্রেণীর লোকের উপর আমার বড় করুণা আসে ঃ এক. সমাজের শীর্ষস্থানীয় মান-গণ্য ব্যক্তি

যদি অপমানিত হয়। দুই. সমাজের বিত্তশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি যদি দরিদ্র ও অভাবী হয়ে যায়। তিন. যে আলেম মানুষের শ্রদ্ধা-সম্মান হারিয়ে ফেলেছে ; লোকেরা যাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সাথে হেয় দৃষ্টিতে দেখে।"

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ

عُقُوبَةُ الْعُلَمَاءِ مَوْتُ الْقَلْبِ وَمَوْتُ الْقَلْبِ طَلَبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْاٰخِرَةِ ـ

"আলেমের শাস্তি হচ্ছে, তার অন্তর মরে যাওয়া, আর অন্তর মরে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, দ্বীন ও আখেরাতের কাজ করে দুনিয়া তলব করা।"

এ প্রসঙ্গে জনৈক আরবী কবি কতই না চমৎকার বলেছেন ঃ

عَجِبْتُ لِمُبْتَاعِ الضَّلَالَةِ بِالْهُدٰى
وَمَنْ يَشْتَرِى دُنْيَاهُ بِالدِّيْنِ اَعْجَبُ

"আমি বিস্মিত হই সে ব্যক্তির উপর, যে হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে, আর যে ব্যক্তি দ্বীন বিক্রি করে দুনিয়া খরিদ করে তার অবস্থা আরও অধিক বিস্ময়কর।"

وَاَعْجَبُ مِنْ هٰذَيْنِ مَنْ بَاعَ دِيْنَهُ
بِدُنْيَا سِوَاءً فَهُوَ مِنْ ذَيْنِ اَعْجَبُ

"এ দুয়ের মধ্যে অধিকতর বিস্ময়কর হলো তার অবস্থা যে সমান দামে দ্বীন বিক্রি করে দুনিয়া নিয়ে নেয়।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "(অসৎ) আলেমকে এমন কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে যে, দোযখবাসীরা তার আশে-পাশে জমা হয়ে যাবে।"

হযরত উসামাহ্ ইব্নে যায়েদ (রাযিঃ) বলেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন (অসৎ) আলেমকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে ; তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে আসবে এবং এমনভাবে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা চাকীর চতুর্পার্শ্বে ঘুরতে থাকে। দোযখীরা তার আশে-পাশে জমা হয়ে জিজ্ঞাসা করবে—তোমার এ শাস্তি কি জন্যে হচ্ছে? সে বলবে, আমি মানুষকে সৎকাজের উপদেশ দিয়েছি; কিন্তু নিজে সে অনুযায়ী আমল করি নাই, লোকদেরকে আমি মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য নসীহত করেছি ; কিন্তু নিজে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকি নাই।" আলেমের শাস্তি এতো অধিক হওয়ার কারণ হচ্ছে, সে জেনেশুনে আল্লাহ্‌র না-ফরমানী করেছে। এ জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

"নিশ্চয় মুনাফিকরা দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে হবে।" (নিসা ঃ ১৪৫)

মুনাফিকদের শাস্তির কঠোরতার কারণ— তারা সত্য বিষয় জানার পরেও অস্বীকার করেছে।

এমনিভাবে, নাসরাদের তুলনায় ইহূদীদেরকে অধিকতর অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে ; অথচ এরা নাসারাদের মত আল্লাহ্‌র জন্য পুত্রের কথা এবং ত্রিত্ববাদের কথা বলে নাই ; এর কারণ হচ্ছে, এই ইহূদীরা জেনে-বুঝে এবং ভালভাবে পরিচয়লাভের পরও অস্বীকার করেছে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ

"তারা তাঁকে এরূপ চিনে, যেরূপ তারা আপন পুত্রকে চিনে থাকে" (বাকারাহ্ ঃ ১৪৬)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ○

"অতঃপর যখন তাদের নিকট আসলো সেই পরিচিত কিতাব, তখন

তারা একে অস্বীকার করে বসলো ; সুতরাং আল্লাহ্‌র লা'নত হোক এরূপ কাফেরদের উপর।" (বাকারাহ্ ঃ ৮৯)

অনুরূপ, বাল্‌আম বাউরের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝

"আর তাদেরকে সেই ব্যক্তির অবস্থা পাঠ করে শুনিয়ে দিন, যাকে আমি আমার আয়াতগুলো প্রদান করেছিলাম, অতঃপর সে তা হতে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে পড়লো, অতএব শয়তান তার পিছনে লেগে গেল, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।" (আ'রাফ ঃ ১৭৫)

উক্ত প্রসঙ্গের শেষ পর্যায়ে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث

"ফলতঃ তার অবস্থা কুকুরের মত হয়ে গেল— তুমি যদি এটাকে আক্রমণ কর তবুও হাঁপাতে থাকে, অথবা যদি এটাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাতে থাকে।"

অনুরূপ, অসৎ আলেমেরও ঠিক একই পরিণাম। কেননা, বাল্‌আম বাউরকেও আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কিতাবের ইল্‌ম দান করেছিলেন ; কিন্তু সে কাম-প্রবৃত্তির অনুসরণে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। এ জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ, সে জ্ঞান-বিদ্যার কোনই পরোয়া করে নাই; ইল্‌ম আছে বা নাই—এ প্রশ্নই তার থাকে নাই; খাহেশাত ও কুপ্রবৃত্তির বাসনা চরিতার্থকরণে সে নিমজ্জিত হয়ে গেছে

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ "অসৎ আলেমের উদাহরণ সেই পাথরের ন্যায়, যেটি প্রবাহিত ঝর্ণার বহির্মুখে পতিত হয়ে পানির প্রবাহ বন্ধ করে দেয়; সে নিজেও পানি পান করে না এবং শস্যক্ষেত্রেও পানি যেতে দেয় না।"

অধ্যায় ঃ ৮৫

সচ্চরিত্রের গুরুত্ব ও ফযীলত

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ○

"নিঃসন্দেহে আপনি চরিত্রের উচ্চতম স্তরে আছেন।" (কলম ঃ ৪)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বলেন ঃ

خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ

"আল-কুরআনই ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক-চরিত্র।"

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুন্দর ও উন্নত চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে। জওয়াবে তিনি এ আয়াতখানি তিলাওয়াত করেছেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ○

"আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ-জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাক।"

অতঃপর তিনি বল্লেন ঃ

هُوَ اَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِىَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُوْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

"সুন্দর চরিত্র হচ্ছে, যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার

সাথে মিশ এবং সম্পর্ক স্থায়ী রাখ, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান কর, আর যে তোমার উপর জুলুম করে তুমি তাকে ক্ষমা কর।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

"আমি সুমহান নৈতিক চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে ভারী জিনিস যা মীযান-পাল্লায় রাখা হবে তা হবে—আল্লাহ্‌র ভয় এবং সদ্ব্যবহার ও উন্নত চরিত্র।"

এক ব্যক্তি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দ্বীন কি? তিনি বললেন ঃ সুন্দর চরিত্র। লোকটি ডান দিক থেকে এসে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো ; হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দ্বীন কি? তিনি বল্লেন ঃ সুন্দর চরিত্র। লোকটি পুনরায় বাম দিক থেকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দ্বীন কি? তিনি বললেন ঃ সুন্দর চরিত্র। লোকটি আবার পশ্চাদ্দিক থেকে এসে জিজ্ঞাসা করলো ; ইয়া রাসূলাল্লাহ! দ্বীন কি? তিনি লোকটির প্রতি মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ তুমি কি বুঝ না দ্বীন কি? দ্বীন হচ্ছে—তুমি কখনও ক্রোধান্বিত হবে না।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! দূর্ভাগ্য ও অকল্যাণ কিসে? তিনি বললেন ঃ অসৎ চরিত্রে।"

একদা এক ব্যক্তি হুযূর আলাইহিস সালামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্‌কে ভয় কর। সে বললো ঃ আরও উপদেশ দিন। হুযূর বললেন ঃ কোন অন্যায় বা পাপকাজ হয়ে গেলে, পরক্ষণেই কোন নেক আমল করে নাও ; এ নেক আমল তোমার পাপকে মিটিয়ে দিবে।" লোকটি বললো ঃ আরও নসীহত

করুন। হুযূর বললেন ঃ মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার ও উন্নত চরিত্রের আচরণ কর।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছে, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমল কোন্‌টি? তিনি জাওয়াবে বলেছেন ঃ সদ্ব্যবহার ও সুন্দর চরিত্র।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা যার আকৃতি ও (প্রকৃতি অর্থাৎ) নৈতিক চরিত্র সুন্দর করেছেন, তাকে আগুন স্পর্শ করবে না।"

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করা হয়েছিল ঃ অমুক স্ত্রীলোক দিনে রোযা রাখে রাত জেগে নামায পড়ে ; কিন্তু লোকদের সঙ্গে তার ব্যবহার খারাব; কথায় ও আচরণে মানুষকে সে কষ্ট দেয়। আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন ঃ "এই স্ত্রীলোকটির মধ্যে ভালাই ও কল্যাণের কোন অংশ নাই ; সে দোযখীদের একজন।"

হযরত আবূ দার্‌দা (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—"মীযান–পাল্লায় সর্বপ্রথম সদ্ব্যবহার ও মহৎ চরিত্রকে রাখা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা যখন ঈমানকে সৃষ্টি করলেন, তখন সে বলেছে, ইয়া আল্লাহ্! আমাকে শক্তিশালী করে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সদ্ব্যবহার ও মহৎ চরিত্রের দ্বারা শক্তিশালী করে দিলেন। আর যখন আল্লাহ্ তা'আলা কুফরকে সৃষ্টি করলেন, তখন সে বলেছে, ইয়া আল্লাহ্! আমাকে শক্তিশালী করে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কৃপণতা ও অসদ্ব্যবহার দ্বারা শক্তিশালী করে দিলেন।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র এ দ্বীন (ইসলাম)–কেই পছন্দ করেছেন ; এ দ্বীনের জন্য মহান চরিত্র ও সদ্ব্যবহারই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ ; কাজেই তোমরা তোমাদের দ্বীনকে এ দু'য়ের দ্বারা সুন্দর–সজ্জিত কর।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেনঃ "সুন্দর চরিত্র আল্লাহ্ তা'আলার মহানতার গুণ।"

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করা হয়েছিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! শ্রেষ্ঠ মুমিন কে? তিনি বলেছেন, "যার চরিত্র সবচেয়ে উন্নত।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা লোকদেরকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করো না বরং তোমাদের সদ্ব্যবহার ও উন্নত চরিত্র দ্বারা বশীভূত কর।"

তিনি আরও বলেছেন ঃ "সির্কা যেমন মধুকে নষ্ট করে দেয়, নিকৃষ্ট চরিত্রও তেমনি আমলকে বরবাদ করে দেয়।"

হযরত জরীর ইব্নে আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা সুন্দর আকৃতি দান করেছেন, অতএব তুমি তোমার চরিত্রকেও সুন্দর কর।"

হযরত বারা' ইব্নে আযেব (রাযিঃ) বলেন, রাসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দো'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي

"হে আল্লাহ্ ! আপনি আমার আকৃতিকে যেমন সুন্দর করেছেন, আমার চরিত্রকেও তেমনি সুন্দর করে দিন।"

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় এ দো'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعَافِيَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে স্বাস্থ্য, শান্তি এবং উন্নত চরিত্র প্রার্থনা করি।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

كَرَمُ الْمُؤْمِنِ دِيْنُهُ وَحَسَبُهُ حُسْنُ الْخُلُقِ وَمُرُوْءَتُهُ عَقْلُهُ

"মুমিনের মর্যাদা হচ্ছে তার দ্বীন, আভিজাত্য হচ্ছে তার উন্নত চরিত্র, আর মনুষত্ব হচ্ছে তার বুদ্ধি–বিবেক।"

হযরত উসামাহ্ ইব্নে শারীক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ঃ একদা আমি লক্ষ্য করেছি যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন মরুচারী বেদুঈন লোক জিজ্ঞাসা করছে ঃ শ্রেষ্ঠতম নেক গুণ যা বান্দাকে দেওয়া হয়েছে তা কোন্‌টি? তিনি বলেছেন ঃ "সুন্দর চরিত্র।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا

"কিয়ামতের দিন আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং সর্বাপেক্ষা নিকটতর আসনের অধিকারী হবে ঐসব লোক যাদের চরিত্র সুন্দর।"

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَلَا تَعْتَدُّوا بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ تَقْوَى تَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللهِ وَحِلْمٌ يَكُفُّ بِهِ السَّفِيهَ أَوْ خُلُقٌ يَعِيشُ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ۔

"তিনটি গুণ যার মধ্যে নাই অথবা (অন্ততঃ পক্ষে) একটি গুণও নাই তার আমলের কোনই মূল্য নাই ঃ এক. আল্লাহ্‌ভীতি, যা তাকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা হতে বিরত রাখবে। দুই. ধৈর্য ও পরিণামদর্শিতা, যা তাকে জাহালত ও মূর্খতাসুলভ আচরণ থেকে বিরত রাখবে। তিন. সদ্ব্যবহার ও উন্নত চরিত্র, যা দিয়ে সে লোকদের মধ্যে বসবাস করবে।"

বর্ণিত আছে, নামায আরম্ভ করার সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় এ দো'আ পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ۔

"আয় আল্লাহ্! আমাকে সুন্দর চরিত্রের পথ প্রদর্শন করুন, সেদিকে আপনি ছাড়া আর কেউ পথ-প্রদর্শন করতে পারে না। আয় আল্লাহ্! নিকৃষ্ট চরিত্র আমা থেকে দূরীভূত করে দিন, আপনি ছাড়া আর কেউ তা দূরীভূত করতে পারে না।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ কিসে সৌন্দর্য লাভ হয়? তিনি বলেছেন, নম্র কথনে, মুক্তমন ও সহাস্য আচরণে। যে ব্যক্তি মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, সুন্দর আখলাক ও উন্নত চরিত্রের আচরণ করবে, পরিচিত-অপরিচিত সকলেই তার প্রতি আকৃষ্ট হবে ; তাকে ভালবাসবে ও প্রশংসা করবে।

জনৈক জ্ঞান-বৃদ্ধের উপদেশ হচ্ছে ঃ "সৎগুণাবলী ও উন্নত চরিত্রের যাবতীয় দিক যদি তোমার ভিতর-বাইরে সন্নিবেশিত করতে পার ; সর্বশ্রেণীর লোকের সাথে তোমার আচার-আচরণ যদি সুন্দর হয়, তাহলে আরশের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে প্রভুত কল্যাণ দান করবেন, সেই সঙ্গে দুনিয়ার মানুষও তোমার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করবে।

অধ্যায় ঃ ৮৬

হাস্য, ক্রন্দন, পোষাক

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ ۝

"তবে কি তোমরা এই কথায় বিস্মিত হচ্ছো এবং হাসছো, আর কাঁদছো না, আর তোমরা অহংকার করছো? (নাজম ঃ ৫৯, ৬০, ৬১)

অর্থাৎ তোমরা এই কুরআনের উপর বিস্ময় প্রকাশ করছো এবং একে অবিশ্বাস করছো, অথচ এ পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত। তোমরা কুরআন পাকের বিষয় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছো, এতে যেসব সত্য ও বাস্তব সতর্কবাণী রয়েছে সেগুলো পাঠ করে তোমরা ক্রন্দন করছো না ; তোমাদের প্রতি কুরআনের যে দাবী, তা থেকে তোমরা একেবারেই গাফেল, অন্যমনস্ক।

বর্ণিত আছে, উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও হাসতেন না। অবশ্য কখনও মুচকি হাসতেন।

এক রেওয়ায়াতে এমনও বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুখভরে হাসতে কিংবা মুচকি হাসতেও দেখা যায় নাই ; এবং এ অবস্থার উপর থেকেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

হযরত ইব্নে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ থেকে বের হয়ে দেখলেন—লোকেরা কথা বলছে আর মুখভরে হাসছে। এ অবস্থা দেখে তিনি সেখানে দাঁড়ালেন এবং

তাদেরকে সালাম দিয়ে বললেন ঃ তোমরা দুনিয়ার সাধ–অভিলাষ বিধ্বংসী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর।

অনুরূপ, আরও একবার লোকেরা হাস্যরত ছিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

أَمَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْراً۔

"ওহে! তোমরা শুনে রাখ, আমি ঐ পবিত্র সত্তার কসম করে বলছি, যার আয়ত্বাধীনে আমার প্রাণ—আমি যা কিছু জেনেছি, তোমরাও যদি তা'সব জানতে, তবে অবশ্যই তোমরা হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী।

হযরত খিজির (আঃ) যখন মূসা (আঃ) থেকে পৃথক হতে ইচ্ছা করলেন, তখন হযরত মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ আমাকে কিছু নসীহত করুন। হযরত খিজির (আঃ) নসীহত করেছেন ঃ "হে মূসা! ঝগড়ার মনোবৃত্তি কখনও রেখো না ; এটা বর্জন করে চল। তীব্র প্রয়োজন ব্যতিরেকে কখনও সফর করো না। অত্যাশ্চর্যকর কিছু না ঘটলে হেসো না। পাপী লোকদেরকে তাদের পাপাচারে কখনও লজ্জা দিও না এবং নিজের ভুল–চুকের জন্য কাঁদ।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

كَثْرَةُ الضِّحْكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ۔

"অধিক হাসি অন্তরকে নিষ্প্রাণ করে দেয়।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ ضَحِكَ لِشَبَابِهٖ بَكٰى لِهَرَمِهٖ وَمَنْ ضَحِكَ لِغِنَاهُ بَكٰى لِفَقْرِهٖ وَمَنْ ضَحِكَ لِحَيَاتِهٖ بَكٰى لِمَوْتِهٖ۔

"যে ব্যক্তি স্বীয় যৌবনকালে হাস্য–উল্লাস করেছে, বার্ধক্যে তাকে কাঁদতে হবে। যে নিজের সম্পদ–সুখে হাস্য–স্ফূর্তি করেছে, অভাবে তাকে কাঁদতে হবে। যে ব্যক্তি স্বীয় জীবনানন্দে হেসেছে মৃত্যুতে তাকে কাঁদতে হবে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِقْرَأُوْا الْقُرْاٰنَ وَابْكُوْا فَاِنْ لَّمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكَوْا ـ

"তোমরা কুরআন পড়, আর কাঁদ ; যদি কাঁদতে না পার, তবে কাঁদার ভান কর।"

হযরত হাসান (রাযিঃ) কুরআনের এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ج جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

"অতএব তারা অল্প কয়েক দিন হেসে (খেলে) নিক, আর (আখেরাতে) বহুদিন (অর্থাৎ অনন্তকাল) কাঁদতে থাকুক, সেই সকল কার্যের বিনিময়ে যা তারা অর্জন করছিল।" (তওবাহ্ ঃ ৮২)

"আয়াতের মর্ম হচ্ছে, তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে কম হাস এবং আখেরাতের ব্যাপারে বেশী বেশী কাঁদ।"

হযরত হাসান আরও বলেছেন ঃ

يَا عَجَبًا مِنْ ضَاحِكٍ وَمِنْ وَرَائِهِ النَّارُ وَمِنْ مَسْرُوْرٍ وَمِنْ وَرَائِهِ الْمَوْتُ

"আশ্চর্য! ঐ ব্যক্তির অবস্থার উপর, যে হাস্য-উল্লাসে মত্ত ; অথচ তার পশ্চাতেই রয়েছে আগুন, আশ্চর্য! ঐ ব্যক্তির উপর যে আনন্দ-স্ফূর্তিতে মেতে উঠছে ; অথচ তার পশ্চাতেই রয়েছে মৃত্যু।"

একবার হযরত হাসান (রাযিঃ) এক যুবকের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন, যুবকটি আনন্দ-উল্লাসে হাস্যরত ছিল। তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

يَا بُنَيَّ هَلْ جُزْتَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَبَيَّنَ لَكَ اَنَّكَ تَصِيْرُ اِلَى الْجَنَّةِ قَالَ لَا قَالَ فَفِيْمَ الضِّحْكُ فَمَا رُوِيَ الشَّابُّ ضَاحِكًا بَعْدَ ذٰلِكَ ـ

"বৎস! তুমি কি পুলসিরাত অতিক্রম করে ফেলেছ? সে বললো, না। তুমি জান্নাতেই প্রবেশ করবে—এ কথার নিশ্চয়তা কি পেয়ে গেছ? সে বললো, না। তিনি বললেন ঃ তবে তোমার এ হাসি ও আনন্দ-উল্লাস কিসের উপর?" এরপর সেই যুবককে আর কোনদিন হাসতে দেখা যায় নাই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ

مَنْ اَذْنَبَ ذَنْبًا وَهُوَ يَضْحَكُ دَخَلَ النَّارَ وَهُوَ يَبْكِيْ ـ

"যে ব্যক্তি নিশ্চিন্তে হাসতে হাসতে পাপাচারে লিপ্ত হয়, সে কাঁদতে কাঁদতে জাহান্নামে যাবে।"

আল্লাহ্‌র জন্য রোদনকারী ব্যক্তিদের খোদ আল্লাহ্ তা'আলা প্রশংসা করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ

"তারা চিবুকের উপর পতিত হয় কাঁদতে কাঁদতে।"

(বনী ইসরাঈল ঃ ১০৯)

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصَاهَا ج

"এ কি আশ্চর্য আমলনামা! লিপিবদ্ধ না করে কোন ক্ষুদ্র পাপও ছাড়ে নাই, আর না কোন বড় পাপ।" (কাহ্ফ ঃ ৪৯)

ইমাম আওযায়ী (রহঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 'সগীরাহ্' অর্থাৎ ক্ষুদ্র পাপ দ্বারা মুচকি হাসিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর 'কাবীরাহ্' অর্থাৎ বড় পাপ দ্বারা সরব (অট্ট) হাসিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا ثَلَاثًا عَيْنًا بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنًا غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ وَعَيْنًا سَهِرَتْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

"কেয়ামতের দিন সকল চোখেরই কাঁদতে হবে, তবে এই তিন প্রকার চক্ষু ব্যতীত ঃ এক. আল্লাহ্‌র ভয়ে যে চোখ দুনিয়াতে কেঁদেছে। দুই. যে চোখ আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত রয়েছে। তিন. যে চোখ আল্লাহ্‌র পথে মেহনত–মোজাহাদা ও প্রহরায় জাগ্রত রয়েছে।"

জ্ঞানতাপসগণের উক্তি হচ্ছে, তিনটি অভ্যাস মানুষের হৃদয়কে শক্ত–পাষাণ করে দেয় ঃ ১. আশ্চর্যকর কিছু না দেখেই হাসা। ২. ক্ষুধা ব্যতীত আহার করা। ৩. বিনা প্রয়োজনে কথা বলা।

পোষাক

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিধেয় পোষাকের বিষয়টি ছিল খুবই সাদাসিধা ; সহজেই হাতের কাছে যে পোষাক পেতেন, তা তিনি পরে নিতেন। যেমন, লুঙ্গি, চাদর, কামিজ, জুব্বা বা লম্বা জামা। সবুজ রঙের পোষাক তাঁর কাছে খুবই ভাল লাগতো। বেশীর ভাগ তিনি সাদা পোষাক পরিধান করতেন। তিনি বলতেন ঃ তোমাদের জীবিত ব্যক্তিদের সাদা পোষাক পরিধান করাও এবং মৃতদেরকে এ দ্বারা কাফন দাও।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (সুন্দুস) মিহীন সবুজ রঙের কাবা (পোষাক বিশেষ) ছিল। তাঁর উজ্জ্বল শুভ্র দেহে তা শোভা পেলে খুবই চমৎকার দেখাতো।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় টাখনুর উপরে পোষাক পরিধান করতেন। তাঁর লুঙ্গি অর্ধেক গোছা পর্যন্ত হতো।

তাঁর একটি কালো বর্ণের কম্বল ছিল। তিনি সেটি অন্যকে হেবা (দান) করে দিয়েছিলেন। হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাযিঃ) আরজ করেছেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উপর আমার মা–বাপ কুরবান হোন—সেই কালো বর্ণের কম্বলটি কি হয়েছে? আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি সেটি পরিধান করেছি। হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাযিঃ) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার পবিত্র দেহের উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণের উপর সেই কালো বর্ণের চাদরটি এতোই চমৎকার ও মানানসই ছিল যে,

ইতিপূর্বে এরূপ আমি আর কখনও দেখি নাই।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান দিক থেকে পোষাক পরিধান করতেন এবং এ দো'আ পড়তেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِى النَّاسِ۔

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে পোষাক পরিয়েছেন, যদ্দ্বারা আমি ছতর আবৃত করি এবং সজ্জা ও সৌন্দর্য লাভ করি।"

পোষাক অপসারণের সময় তিনি প্রথমে বাম দিক থেকে খুলতেন। নূতন কাপড় পরিধান করলে পুরাতন পোষাকটি কোন দরিদ্রকে দান করে দিতেন। তিনি বলেছেন ঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَكْسُوْ مُسْلِمًا مِنْ سَمَلِ ثِيَابِهٖ لَا يَكْسُوْهُ اِلَّا لِلّٰهِ اِلَّا كَانَ فِىْ ضِمَانِ اللّٰهِ وَحِرْزِهٖ وَخَيْرُهٗ مَا وَارَاهُ حَيًّا وَمَيِّتًا۔

"কোন মুসলমান অপর গরীব–নিঃস্ব মুসলমানকে যদি নিজের পুরাতন পোষাক (দান করে) পরিধান করায় ; আর এতে তার উদ্দেশ্য হয় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও রেযা, তবে যতদিন পর্যন্ত সে মুসলমান জীবিত কি মৃত (কাফন) অবস্থায় সেই পোষাক পরিধান করবে, ততদিন পর্যন্ত দাতা ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ তত্ত্বাবধান ও খাছ হেফাযতে স্থান পাবে এবং সে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কল্যাণ পেতে থাকবে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি চুগা (পোষাক বিশেষ) ছিল ; তিনি যেখানেই যেতেন বিছানা স্বরূপ সেটি বিছিয়ে দেওয়া হতো এবং সেটাকে দুই ভাঁজ করে নেওয়া হতো।

তিনি খালি চাটাইর উপরও শুয়ে যেতেন, এর নীচে আর কোন কিছুই হতো না।

অধ্যায় ঃ ৮৭

কুরআন মজীদ, ইলম ও আলেমের গুরুত্ব ও ফযীলত

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ رَاٰى اَنَّ اَحَدًا اُوْتِىَ اَفْضَلَ مِمَّا اُوْتِىَ فَقَدِ اسْتَصْغَرَ مِنْ عَظْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

"যে ব্যক্তি কুরআন (অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গম করে) পড়লো, অতঃপর ধারণা রাখে যে, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকর জ্ঞান (কুরআন ছাড়া অন্যকিছু অধ্যয়ন করে) অন্য কেউ অর্জন করেছে, সে আল্লাহ্ তা'আলার বড়ত্ব ও মহানত্বকে ছোট নজরে দেখলো।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কুরআন মজীদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোন সুপারিশকারী নাই।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারা, যারা ইল্‌ম শিখে এবং শিক্ষা দেয়।"

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "লোহায় যেমন মরিচা ধরে আত্মাও তেমনি মরিচাপ্রাপ্ত হয়। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে এ (আত্মা) কিসে উজ্জ্বল হবে? তিনি বললেন ঃ মনোযোগ সহকারে কুরআন মজীদ পাঠ করা এবং বেশী করে মৃত্যুর কথা স্মরণ করার দ্বারা।"

হযরত ফুযাইল ইব্‌নে ইয়ায (রহঃ) বলেন ঃ "কুরআনের (জ্ঞানের) ধারক–বাহক যারা, তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের পতাকাবাহী ; সাধারণ লোক তাদের সাথে খেল–তামাশা বা অবহেলার আচরণ করলেও এদের সাথে

অনুরূপ আচরণ তাদের উচিত নয়, সাধারণ লোকজন অহেতুক কথা ও কার্যকলাপে লিপ্ত হলেও আলেমের তাতে লিপ্ত হওয়া কিছুতেই উচিত নয় ; এটাই কুরআনের আদব ও সম্মান রক্ষার প্রয়াস-পরিচয়।"

তিনি আরও বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি সকালে সূরা হাশরের শেষ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেছে, সে যদি ঐ দিবসে মৃত্যুবরণ করে, তবে তাকে শহীদগণের সাথে সিল-মোহরযুক্ত করে দেওয়া হবে। অনুরূপ, যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় উক্ত আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেছে, সে যদি ঐ রাতে মৃত্যুবরণ করে, তবে তাকেও শহীদগণের সাথে সিল-মোহরযুক্ত করে দেওয়া হবে।"

ইল্‌ম ও আলেমের গুরুত্ব, ফযীলত ও কল্যাণ সম্পর্কিত প্রচুরসংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَيُلْهِمْهُ رُشْدَهٗ ـ

"আল্লাহ্ তা'আলা যে ব্যক্তির খায়র ও কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন এবং প্রকৃত দিশা ও হিদায়াতের বিষয় তার হৃদয়ে উদিত করে দেন।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ ـ

"আলেমগণ আম্বিয়ায়ে কিরামের ওয়ারিস।"

আর এ কথা বিদিত যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের মর্যাদা অপেক্ষা উচ্চতর মর্যাদা আর নাই ; সুতরাং বুঝা গেল, তাঁদের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারের উপরে আর কোন মর্যাদা ও সম্মান হতে পারে না।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ "মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সেই মুমিন ব্যক্তি যে আলেম ; লোকদের প্রয়োজনে সে তাদের উপকৃত করে, আর সে নিজে তো উপকৃত হবেই।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "সমগ্র মানবের মধ্যে আম্বিয়ায়ে কিরামের নিকটতর মর্যাদার অধিকারী আলেম ও মুজাহিদ। আলেম এ জন্যে যে, সে আম্বিয়ায়ে কেরাম কর্তৃক আনীত আদর্শ ও বিষয়াবলীর প্রতি পথ-প্রদর্শন করে, আর মুজাহিদ এ জন্যে যে, সে একই আদর্শ ও বিষয়ের জন্য যুদ্ধ-জিহাদ করে।"

আরও ইরশাদ করেন ঃ "গোটা গোত্রের মউত একজন আলেমের মৃত্যু অপেক্ষা সহজ-সহনীয়।"

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

يُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ -

"কিয়ামতের দিন আলেমগণের কলমের কালি শহীদগণের রক্তের সাথে মাপা (ওজন করা) হবে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

لَا يَشْبَعُ عَالِمٌ مِنْ عِلْمٍ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ -

"আলেম ব্যক্তি তার চূড়ান্ত লক্ষ্য জান্নাত অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় ইলম ও জ্ঞান-গবেষণায় তৃপ্ত হতে পারে না।"

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

هَلَاكُ أُمَّتِي فِي شَيْئَيْنِ تَرْكُ الْعِلْمِ وَجَمْعُ الْمَالِ -

"দু'টি বিষয়ের মধ্যে আমার উম্মতের ধ্বংস রয়েছে ঃ এক. ইল্মে দ্বীন পরিহার করা। দুই. সম্পদ জমা করা।"

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ

"আলেম হও অথবা আলেমের শিক্ষার্থী হও কিংবা শ্রোতা হও কিংবা আলেমের প্রতি ভালবাসা রাখ, এ ছাড়া পঞ্চম শ্রেণীর (অর্থাৎ আলেম-

বিদ্বেষী) অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

آفَةُ الْعِلْمِ الْخُيَلاَءُ

"দম্ভ–অহংকার আলেমের জন্য আপদ টেনে আনে।"

পরিপক্ক জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান মনীষীদের উক্তি হচ্ছে, "ক্ষমতা লাভের জন্য যারা ইল্‌ম শিক্ষা করে, তারা ইল্‌ম এবং ক্ষমতা উভয় থেকেই বঞ্চিত হয়।" আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيَاتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

"আমি এমন লোকদেরকে আমার নিদর্শনাবলী হতে বিমুখই করে রাখবো, যারা পৃথিবীতে বড়াই–অহংকার করে যা করার অধিকার তাদের নাই।" (আ'রাফ ঃ ১৪৬)

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ "যে কুরআন শিক্ষা করলো তার মূল্য বৃদ্ধি পেল, যে ফেকাহ্ শিখলো তার সম্মান বাড়লো, যে হাদীস শিক্ষা করলো তার প্রমাণ বলিষ্ঠ হলো, যে হিসাব শিখলো তার নির্ভুল অভিমত ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জ্ঞান হলো, যে দুর্লভ বিষয় (অভিধান–শব্দসম্ভার ইত্যাদি) আহরণ করলো তার প্রতিভা তীক্ষ্ণ হলো, আর যে নিজকে মূল্যায়ণ করতে ও মর্যাদা দিতে জানলো না ইল্‌ম দ্বারা সে উপকৃত হতে পারলো না।"

হযরত হাসান ইব্‌নে আলী (রাযিঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আলেমদের মজলিস ও সাহচর্যে অধিক সময় অতিবাহন করে, তার জিহ্বার আড়ষ্টতা দূর হয়ে যায়, তার বুদ্ধি–বিবেক চিন্তাধারার অনেক জটিলতার নিরসন হয়, লব্ধ জ্ঞানের উপর তার নিয়ন্ত্রণ আসে এবং অন্যকে নিজের জ্ঞানের দ্বারা সে উপকৃত করতে পারে।"

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اِذَا رَدَّ اللّٰهُ عَبْدًا حَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمَ ـ

"আল্লাহ্ পাক যখন কোন বান্দাহ্‌কে বিমুখ করে‧ তখন ইল্‌ম থেকে তাকে বঞ্চিত করে দেন।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

لَا فَقْرَ اَشَدُّ مِنَ الْجَهْلِ ـ

"মূর্খতা অপেক্ষা দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা আর নাই।"

অধ্যায় ঃ ৮৮

নামায ও যাকাতের গুরুত্ব

যাকাত ইসলামের মূল ভিত্তিসমূহের অন্যতম। নামাযের পরেই আল্লাহ্ তা'আলা যাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

"তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর।"

(বাকারা ঃ ৪৩)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর নির্মিত ঃ এক. আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবূদ নাই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল-- এই সাক্ষ্য দেওয়া, দুই. নামায কায়েম করা, তিন. যাকাত দেওয়া, চার. রোযা রাখা এবং পাঁচ. হজ্জ করা।

নামায ও যাকাতের ব্যাপারে যারা অবহেলা করে তাদের প্রতি পবিত্র কুরআনে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝

"অতএব বড় সর্বনাশ ঐ সকল নামাযীর জন্য, যারা স্বীয় নামাযকে ভুলে থাকে।" (মাউন ঃ ৪, ৫)

পূর্বে এ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

"আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেনা, আপনি তাদেরকে অতি যন্ত্রণাময় শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন। (তওবাহ্ ঃ ৩৪) 'আল্লাহ্র পথে খরচ করা'র অর্থ যাকাত দেওয়া।

উত্তম হলো, এমন মিসকীন, ফকীর ও অভাবী লোকদেরকে দান-খয়রাত করা যারা পরহেযগার, দুনিয়াত্যাগী এবং দ্বীন ও আখেরাতের কাজে আত্মনিয়োগকারী। বস্তুতঃ এমন লোকদেরকেই দান-খয়রাত করলে সম্পদ-বৃদ্ধি লাভ করে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

لَا تَأْكُلْ اِلَّا طَعَامَ تَقِيٍّ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِيٌّ ـ

"তোমরা পরহেযগার লোক ছাড়া অন্য কারও খাদ্য খেয়ো না এবং তোমাদের খাদ্যও যেন পরহেযগার ছাড়া কেউ না খায়।"

এর কারণ হচ্ছে, পরহেযগার লোক এ খাদ্যের দ্বারা ইবাদতের জন্য শক্তি যোগাবে এবং এভাবে খাদ্যের ব্যবস্থাকারী ব্যক্তিও নেক কাজ ও ইবাদত-বন্দেগীতে সওয়াবের অংশীদার হয়ে গেল।

এক বুযুর্গের অভ্যাস ছিল, তিনি দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে দ্বীনদার আল্লাহ্ ওয়ালা অভাবীদেরকে প্রাধান্য দিতেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বলেছিলেন ঃ এঁরা সব সময় আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে মগ্ন থাকেন, ক্ষুধায় কষ্ট পেলে তাদের ধ্যানের বিচ্যুতি ঘটবে, তাদেরকে দান করে যদি আমি একজনকেও আল্লাহ্র ধ্যানমগ্নতায় সাহায্য করতে পারি, তবে এটা আমার জন্য এক হাজার অন্যমনস্ক ফকীরকে দান করা অপেক্ষা উত্তম। এই বুযুর্গের কথা হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)-এর নিকট আলোচনা করা হলে তিনি বলেছেন, "দানের ব্যাপারে এতো সুন্দর কথা আমি আর শুনি নাই ; বাস্তবিকই তিনি একজন বুযুর্গ।" তারপর এই বুযুর্গের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আরও বললেন, এই ধনী ব্যক্তি প্রথমে তরকারি ও শাক-সব্জীর ব্যবসা করতেন। ফকীর লোকেরা তার দোকানে কোন দ্রব্য খরিদ করতে গেলে তিনি বিনা মূল্যে দিয়ে দিতেন। এই জন্য তিনি ক্রমে ক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত ও নিঃস্ব হয়ে পড়েন। অবশেষে তার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) জানতে পেরে তাকে কিছু মূলধন দিয়ে

পুনরায় ব্যবসায় লাগিয়ে দেন এবং বলেন, এ দিয়ে তুমি ব্যবসা করতে থাক, তোমার মত মানুষের জন্য ব্যবসা ক্ষতিকর নয়।

হযরত ইব্‌নে মুবারক (রহঃ) প্রধানতঃ জ্ঞানপিপাসু তালেবে-ইল্‌মদেরকে দান করতেন। তাঁকে বলা হয়েছিল, আপনি সকলকে সমভাবে দান করলে ভালো হতো। তিনি বলেছেন, "নবীগণের পর উলামায়ে কেরাম অপেক্ষা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন লোক আমি দেখি না ; তাঁদের অন্তরে যদি কোনরূপ চিন্তা-পেরেশানী থাকে, তবে জ্ঞান-চর্চায় ব্যাঘাত ঘটবে এবং নিশ্চিন্ত মনে তাঁরা দ্বীনী খেদমতে মনোনিবেশ করতে পারবেন না। সুতরাং তাদেরকে সাহায্য করে নিশ্চিন্ত রাখা আমি শ্রেষ্ঠ ইবাদত মনে করি।"

বিশেষভাবে নিঃস্ব বিপন্ন লোকদেরকেও সাহায্য করা চাই। আত্মীয়-স্বজনের প্রতিও বিশেষ নজর রাখা চাই। কেননা, আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করলে একদিকে যেমন দানের সওয়াব লাভ হবে, অপরদিকে আত্মীয়তার হকও আদায় হবে। আর আত্মীয়তার হক আদায়কারী ব্যক্তি প্রচুর সওয়াবের অধিকারী হয়ে থাকে। দান-খয়রাত গোপনে করা অধিকতর উত্তম ; এতে একদিকে যেমন রিয়া তথা লোক দেখানো মনোবৃত্তি হতে আত্মরক্ষা হয়, অপরদিকে গ্রহিতা ব্যক্তিও লোকসমক্ষে লজ্জা ও সংকোচবোধ হতে রক্ষা পায়।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "গোপন দান আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ নিবারণ করে।"

হাদীস শরীফে আছে—সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ তা'আলা হাশরের ময়দানে স্বীয় আরশের নীচে স্থান দিবেন, যেদিন এ ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক তারা যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় এমনভাবে গোপনে দান-খয়রাত করে যে, দাতা ডান হাতে কি দান করেছে, তার বাম হাতেও তা টের করতে পারে না।" তবে প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে যদি কোনরূপ ফায়দা থাকে যেমন, দাতার অনুকরণে অন্যান্য লোকজনও দানকার্যে উদ্বুদ্ধ হবে, তাহলে এরূপ করলে কোনরূপ দোষ নাই। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই রিয়ামুক্ততা জরুরী এবং দানের পর তা প্রচার করা বা খুটা দেওয়া অবশ্য পরিত্যাজ্য । যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ‎

"তোমরা কৃপা প্রকাশ করে অথবা ক্লেশ প্রদান করে তোমাদের দান-খয়রাতকে বিনাশ করো না।" (বাকারাহ্ ঃ ২৬৪)

বস্তুতঃ দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করা এমন এক অপরাধ, যা দানের সওয়াবকে ধ্বংস করে দেয়। সুতরাং দান করার পর তা গোপন রাখা এবং ভুলে যাওয়া উচিত। পক্ষান্তরে, যাকে দান করা হয়, তার উচিত—এ কথা ব্যক্ত করা, প্রকাশ করা এবং দাতার কৃতজ্ঞতা আদায় করা। কেননা, হাদীস শরীফে আছে ঃ "যে ব্যক্তি মানুষের শোকরিয়া আদায় করলো না, সে আল্লাহ্ পাকেরও শোকর আদায় করলো না।" এক আরবী কবি কতই না সুন্দর বলেছেন (সারমর্ম) ঃ "কৃতজ্ঞ বা অকৃতজ্ঞ যে ক্ষেত্রেই তুমি দান কর না কেন, পুন্য তোমার আছেই। কৃতজ্ঞ অন্তর আল্লাহ্র কাছে পুরস্কৃত হবে আর অকৃতজ্ঞ সাজা-প্রাপ্ত হবে ; কিন্তু তুমি সর্বাবস্থায় পুরস্কৃত।"

অধ্যায় ঃ ৮৯

পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও সন্তানের হক

এ কথা স্পষ্ট যে, পারস্পরিক সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তার হক আদায় করা অপরিহার্য। এতদপ্রেক্ষিতে পিতা-মাতা — যাদের সাথে জন্মের সম্পর্ক ও পরম ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত, তাদের হক আদায় করার বিষয় অনেক বেশী গুরুত্ব ও দাবী রাখে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "পিতা যদি কারও কাছে কৃতদাসরূপে আবদ্ধ থাকে, তবে সন্তান সেই পিতাকে খরিদ করে মুক্ত না করা পর্যন্ত হক আদায় হবে না।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

بِرُّ الْوَالِدَيْنِ اَفْضَلُ مِنَ الصَّلٰوةِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ۔

"পিতামাতার প্রতি সশ্রদ্ধ ও ভক্তিপূর্ণ সদ্ব্যবহার নামায, দান-খয়রাত, রোযা, হজ্জ, উমরাহ্ এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমল।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় রাত পোহালো যে, তার পিতা-মাতা তার প্রতি সন্তুষ্ট, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সকাল বেলায় জান্নাতের দিকে দুটি দরজা খুলে দেন। এমনিভাবে পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট রেখে যদি সন্ধ্যা করে, তবে তখনও তার জন্য জান্নাতের দিকে দুটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। আর যদি সে যেকোন একজনকে সন্তুষ্ট রাখে, তবে তার জন্য একটি দরজা খুলা হয় (আরেকটি বন্ধ রাখা হয়)। পিতামাতার সন্তোষের সাথে সন্তানের

বেহেশ্‌তের এ সম্পর্ক বলবৎ—যদিও তারা (সন্তানের উপর) জুলুম করে, যদিও তারা জুলুম করে, যদিও তারা জুলুম করে। পক্ষান্তরে, যদি সন্তান পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করে রাত পোহায়, তবে সকালে তার জন্য দোযখের দিকে দুটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। এমনিভাবে তাদেরকে অসন্তুষ্ট রেখে যদি সন্ধ্যা করে তবে তখনও তার জন্য দোযখের দিকে দুটি দরজা খোলা হয় ; আর যদি সে যে কোন একজনকে অসন্তুষ্ট করে তবে তার জন্য একটি দরজা খোলা হয়—যদিও তারা (সন্তানের উপর) জুলুম করে, যদিও তারা জুলুম করে, যদিও তারা জুলুম করে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "জান্নাতের খোশ্‌বু পাঁচশত মাইল দূর থেকে পাওয়া যায় ; কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং আত্মীয়তা-সম্পর্কচ্ছেদনকারী ব্যক্তি তা পাবে না।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

بِرَّ اُمَّكَ وَاَبَاكَ وَاُخْتَكَ وَاَخَاكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ فَاَدْنَاكَ ـ

"পিতা-মাতা, বোন ও ভাইয়ের সাথে সদ্ব্যবহার কর, অতঃপর পর্যায়ক্রমে নিকটতম আত্মীয়দের সাথে সদাচার কর।"

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ "সন্তান যখন কোনরূপ সদকা বা দান-খয়রাতের ইচ্ছা করে, তখন তার উচিত, পিতা-মাতার জন্য নিয়ত করা— যদি তারা মুসলমান হয়। এর সওয়াব পিতা-মাতার জন্যে হবে এবং তাদের দু'জনের সমপরিমান সওয়াব হবে সন্তানের ; অথচ পিতা-মাতার সওয়াবে কোন ঘাটতি হবে না।"

হযরত মালেক ইব্‌নে রবীয়াহ্‌ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় বনী সালিমার এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! মাতাপিতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের পর আরও কিছু বাকী থাকে কি যা আমি তাদের মৃত্যুর পর করতে পারি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তাদের কল্যাণের জন্য ক্ষমা চাওয়া, তাদের মৃত্যুর পর তাদের প্রতিজ্ঞা পূরণ করা, তাদের ওসীলায় যাদের সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তাদের সাথে সদ্ভাব

রক্ষা এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবের সম্মান করা।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ الْأَبُ ـ

"সবচেয়ে বড় নেকী হচ্ছে, পিতার প্রতি সদ্ভাব ও ভক্তি প্রদর্শনের পর তিনি মারা গেলে তার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার ও সম্পর্ক স্থায়ী রাখা।" আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

بِرُّ الْوَالِدَةِ عَلَى الْوَلَدِ ضِعْفَانِ ـ

"মাতার হক সন্তানের উপর দ্বিগুণ।"

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ "মাতার দো'আ অধিকতর শীঘ্র কবূল হয়ে থাকে।" আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ "পিতার তুলনায় মাতা বেশী স্নেহময়ী। আর এরূপ দো'আ অগ্রাহ্য হয় না।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কার সাথে সদ্ব্যব্যবহার করবো? তিনি বললেন ঃ পিতামাতার সাথে। লোকটি বললোঃ আমার পিতামাতা নাই। তিনি বললেন ঃ

بَرَّ وَلَدَكَ كَمَا أَنَّ لِوَالِدَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا كَذٰلِكَ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ

"আপন সন্তানদের সাথে সদ্ব্যবহার কর ; তোমার উপর পিতামাতার যেমন হক রয়েছে, তোমার সন্তানদেরও তোমার উপর তেমনি হক রয়েছে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা ঐ পিতাকে অনুগৃহিত করুন, যে তার সন্তানকে সৎস্বভাব

ও শিষ্টাচারে সাহায্য করে, অর্থাৎ নিজের অসদাচরণ ও শিষ্টাচারবিরোধী আচরণে সন্তান দুর্বৃত্ত না হয়।”

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ “সন্তানদেরকে কোন সম্পদ বা বিষয়-সম্পত্তি দেওয়ার ব্যাপারে তোমরা সমতা রক্ষা কর।”

জ্ঞানীগণ বলেছেন ঃ “তোমার সন্তান তোমার জন্য খোশবুস্বরূপ ; তুমি তাদের ভালবাস, তারা তোমার খেদমত করবে; সহযোগী হবে, নতুবা তোমার অবাধ্য হতে পারে।”

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “সপ্তম দিনে সন্তানের আকীকা কর, নাম রাখ এবং কষ্টদায়ক জিনিস (চুল ইত্যাদি) তার থেকে দূর করে দাও। যখন ছয় বছরের হয়, তখন তাকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দাও। নয় বছরের হলে তার বিছানা পৃথক করে দাও। তের বছরের হলে নামায পরিত্যাগ করার কারণে প্রহার কর। ষোল বছরের হলে তাকে বিবাহ করিয়ে দাও। অতঃপর তার হাত ধরে বল— বৎস! আমি তোমাকে আদব শিখিয়েছি, তালীম দিয়েছি, বিবাহ করিয়ে দিয়েছি ; দুনিয়াতে আমি তোমার ফিৎনা হতে এবং আখেরাতে তোমার আযাব হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি।”

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ “পিতার উপর সন্তানের হক আছে, পিতা সন্তানকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে এবং তার সুন্দর নাম রাখবে।”

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ “প্রত্যেক সন্তান আকীকার নিকট বন্ধক রাখা অবস্থায় রয়েছে ; সপ্তম দিনে সে আকীকায় পশু জবাই করা চাই এবং সপ্তম দিনেই মাথা মুণ্ডানো চাই।”

এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মুবারক (রহঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজের সন্তানের বিষয়ে অভিযোগ করলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি তার উপর বদ দো'আ করেছ? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তবে তো তুমি নিজেই তাকে বরবাদ করে দিলে। বস্তুতঃ নিজের সন্তানদের ব্যাপারে কঠিন না হয়ে সহজ হওয়া এবং হেকমত অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ।”

হযরত আকরা ইব্‌নে হারেছ (রাযিঃ) দেখলেন—রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন (দৌহিত্র) সন্তানকে চুম্বন করছেন। তিনি বললেন ঃ আমার দশটি সন্তান, তাদের একটিকেও আমি কখনও চুম্বন করি নাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ যে দয়া করে না তাকে দয়া করা হবে না।"

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (উসামাহ্ যখন শিশু ছিলেন তখন) উসামাহ্‌র মুখ ধুয়ে দিতে বল্‌লেন। আমি মুখ ধুইতে লাগলাম, কিন্তু এটা আমার ভাল লাগছিল না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বুঝতে পারলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি আমার হাত থেকে উসামাহ্‌কে ছাড়িয়ে নিলেন এবং নিজেই তার মুখ ধুয়ে দিলেন, অতঃপর তাকে চুম্বন করে বললেন ঃতারজন্য নির্দিষ্ট কোন কাজের মেয়ে না থাকায়ই তো আমরা এ সুযোগটি পেয়েছি। সুতরাং এটি নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতি উসামাহ্‌র এহ্‌সান।"

একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় হযরত হাসান (রাযিঃ) (তাঁর শিশুকালে) হাঁটতে গিয়ে পড়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নেমে তাকে ধরে উঠালেন এবং এ আয়াতখানি তিলাওয়াত করলেন ঃ

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ـ

"নিঃসন্দেহে তোমাদের সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি (তোমাদের জন্য) পরীক্ষাস্বরূপ।" (তাগাবুন ঃ ১৫)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে শাদ্দাদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে (ইমামতে) নামায পড়াতে ছিলেন। যখন তিনি সেজদায় গেলেন তখন হযরত হুসাইন (রাযিঃ) (শিশুকালে) তাঁর গর্দান মুবারকে উঠে বসে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা থেকে উঠতে বিলম্ব করছিলেন। পিছনে যারা ছিলেন তারা মনে করলেন—কিছু ঘটেছে ; নতুবা এ বিলম্বের কারণ কি! নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানালেন যে,

আমার (দৌহিত্র) সন্তান আমাকে সওয়ারী বানিয়েছিল ; আমিও শীঘ্র তাকে নামিয়ে দেওয়াটা পছন্দ করি নাই, যাতে সে তার আত্মতৃপ্তি পূরণ করে নেয়।"

এ হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে, সেজদায় বিলম্ব করে দীর্ঘ সময় আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভে ধন্য হওয়া। একই সাথে সন্তানের প্রতি স্নেহ ও সদাচরণ করা এবং উম্মতকে বিষয়টির তালীম দেওয়া।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

رِيحُ الْوَلَدِ مِنْ رِيحِ الْجَنَّةِ.

"সন্তানের খোশ্‌বূ জান্নাতের খোশ্‌বূসম।"

হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)–এর পুত্র ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন যে, একদা আমার পিতা হযরত আহ্‌নাফ ইব্‌নে কায়সকে ডেকে আনার জন্য পাঠালেন। তিনি উপস্থিত হলে পিতা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আবুল বাহ্‌র! সন্তান সম্পর্কে তুমি কি বল? তিনি বললেন ঃ হে আমীরুল মুমেনীন! তারা আমাদের হৃদয়ের ফল, আমাদের ক্ষমতা ও শক্তির স্তম্ভ। আমরা তাদের জন্য নরম যমীনস্বরূপ, ছায়াপ্রদ আসমানের ন্যায়, তাদেরই কারণে আমরা বড় বড় দুঃসাধ্য কাজে নেমে পড়ি। সুতরাং তারা কিছু চাইলে অবশ্যই দিন, তারা মন ধরলে অবশ্যই তাদেরকে সন্তুষ্ট করুন। তাহলে আপনাকে তারা ভালবাসা উপহার দিবে। আপনার জন্য তারা প্রাণান্তকর খাটুনি খাটবে। তাদের জন্য আপনি ভারী বোঝা না হোন। এতে আপনার জীবন তাদের কাছে বিরক্তিকর হবে, তারা আপনার মৃত্যু কামনা করবে, আপনার সংশ্রব তারা অপছন্দ করবে।" হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) বললেন ঃ হে আহ্‌নাফ! আপনার শুভাগমন এমন সময় হয়েছে যখন আমি আমার পুত্র ইয়াযীদের প্রতি রোষান্বিত ছিলাম। আহ্‌নাফ বিদায় নিলেন, এদিকে হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) পুত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন এবং তার নিকট দুই লক্ষ দিরহাম ও দুইশত কাপড় পাঠালেন। ইয়াযীদ তা সমান সমান দু ভাগ করে এক লাখ দিরহাম ও একশত কাপড় নিজে রাখলেন আর এক লাখ দিরহাম ও একশত কাপড় হযরত আহ্‌নাফের নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

অধ্যায় ঃ ৯০

পাড়া-প্রতিবেশীর হক ও গরীব-দুঃখীদের সাথে সদ্ব্যবহার

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের কারণে মুসলমানের প্রতি মুসলমানের যে হক রয়েছে, মুসলমান প্রতিবেশী তার চেয়ে বেশী হক ও প্রাপ্যের অধিকার রাখে। কেননা, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "পাড়া-প্রতিবেশী তিন ধরণের হয়ে থাকে ঃ এক. যে প্রতিবেশী এক প্রকার হকের অধিকারী। দুই. যে প্রতিবেশী দুই প্রকার হকের অধিকারী। তিন. যে প্রতিবেশী তিন প্রকার হকের অধিকারী। যে প্রতিবেশী তিন প্রকারের হক ও অধিকার রাখে, তারা একাধারে আত্মীয়-মুসলমান-প্রতিবেশী। অর্থাৎ আত্মীয়তা, ইসলাম ভ্রাতৃত্ব এবং প্রতিবেশীত্ব—এই তিন প্রকারের হক তাদের রয়েছে। যে প্রতিবেশী দুই প্রকারের হক রাখে, তারা হচেছ, মুসলমান প্রতিবেশী, অর্থাৎ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও প্রতিবেশীত্ব—এই দুই প্রকারের হক তাদের রয়েছে। আর যে প্রতিবেশী এক প্রকারের হক রাখে, তারা হচ্ছে সাধারণ পাড়া-প্রতিবেশী ; এদের কেবল প্রতিবেশীত্বের হক রয়েছে, যেমন মুশ্‌রিক প্রতিবেশী।" হাদীসখানিতে প্রণিধানযোগ্য যে, কেবল প্রতিবেশীত্বের কারণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত চমৎকার ভাবে মুশ্‌রিকেরও হক সাব্যস্ত করেছেন।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

أَحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا -

"তুমি পাড়া-প্রতিবেশীর হক উত্তমভাবে আদায় কর, তাহলে সত্যিকার মুসলমান হতে পারবে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهٗ سَيُوَرِّثُهٗ

"হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্যে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) এত বেশী উপদেশ দিতে লাগলেন যে, আমি ভাবলাম শীঘ্রই তাকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা হবে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يَأْمَنَ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ -

"কোন বান্দা সে পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারে না যে পর্যন্ত তার প্রতিবেশী তার কষ্টদায়ক আচরণ হতে নিরাপদ না হতে পারে।"

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ -

"কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে দুই ব্যক্তির অভিযোগের শুনানি ও বিচার হবে, তারা হবে দুই প্রতিবেশী।"

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِذَا اَنْتَ رَمَيْتَ كَلْبَ جَارِكَ فَقَدْ اٰذَيْتَهٗ -

"তোমার প্রতিবেশীর কুকুরের প্রতি যদি তুমি একটি তীর (কিংবা ঢেলা ইত্যাদি) ছুড়লে, তাহলে তুমি তাকে কষ্ট দিলে।"

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো ঃ আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দিচ্ছে ; সে আমাকে গালমন্দ করে, আমাকে বিরক্ত করে। তিনি বললেন ঃ যাও ; সে যদি তোমার সাথে সদ্ব্যবহারের হক আদায়ে ত্রুটি করে, তাহলে সে আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করলো ; কিন্তু তুমি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ব্যাপারে সচেতন থেকো।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করা হলো ঃ জনৈকা মহিলা নিয়মিত রোযা রাখে, রাত জেগে নামায পড়ে ; কিন্তু

প্রতিবেশীকে জ্বালাতন করে। হুযূর বললেন ঃ "সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।"

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার প্রতিবেশী সম্পর্কে অভিযোগ জ্ঞাপন করলে তিনি বললেন ঃ ছবর কর। অতঃপর আরও দু'বার এমনি হলো। চতুর্থবার হুযূর বললেন ঃ তুমি তোমার বিছানাপত্র রাস্তায় ফেলে রাখ। লোকটি তাই করলো। এবার যেকোন পথচারী লোকটির এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করে– লোকটির এই দশা কেন? কারণ জানতে পেরে লোকেরা বলতে লাগলো– জালেম প্রতিবেশীর উপর আল্লাহ্র লা'নত। এ কথা প্রতিবেশীর গোচরীভূত হওয়ার পর সে এসে লোকটিকে অনুরোধ স্বরে বলতে লাগলো—ভাই, তুমি তোমার বিছানা-পত্র স্বস্থানে নিয়ে নাও ; আমি আর কোনদিন তোমার সাথে অসদাচরণ করবো না।

ইমাম যুহ্রী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে প্রতিবেশীর অভিযোগ করলে তিনি বললেন ঃ "মসজিদের দরজায় এ কথা লিখে দাও ঃ "ওহে লোকসকল! আশ-পাশের চল্লিশ বাড়ীর লোকেরা পরস্পর প্রতিবেশী।" ইমাম যুহ্রী (রহঃ) বলেন ঃ চতুর্দিকের প্রত্যেক দিকে চল্লিশটি করে বাড়ী বুঝানো হয়েছে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ স্ত্রীলোক, বাড়ী এবং ঘোড়া এই তিনের মাঝে শুভ এবং অশুভ দু'টিই রয়েছে। স্ত্রীলোকের মধ্যে শুভ হচ্ছে, তার মহর কম হওয়া, সহজে বিবাহ হয়ে যাওয়া এবং উৎকৃষ্ট চরিত্রের হওয়া। এর অশুভ দিক হচ্ছে, মহর বেশী হওয়া, সহজে বিবাহ না হওয়া এবং দুশ্চরিত্রা হওয়া।

বাড়ীর ব্যাপারে শুভ ও কল্যাণের দিক হচ্ছে, বাড়ী প্রশস্ত হওয়া, প্রতিবেশী সৎ হওয়া। আর অশুভ দিক হচ্ছে, বাড়ী সংকীর্ণ হওয়া এবং প্রতিবেশী অসৎ হওয়া।

ঘোড়ার শুভ ও কল্যাণের দিক হচ্ছে, মালিকের বশীভূত হয়ে থাকা এবং ঘোড়ার মধ্যে কোনরূপ কুঅভ্যাস না থাকা। আর অশুভ ও মন্দ দিক হচ্ছে, মালিকের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত হওয়া এবং কুঅভ্যাস থাকা।

এ কথাও অতি উত্তমরূপে স্মরণ রাখা উচিত যে, পাড়া-প্রতিবেশীর

দায়িত্ব শুধু এতটুকুই নয় যে, সে কাউকে কষ্ট দিবে না ; বরং অপরের দ্বারা উৎপীড়িত হলে তা সহ্য করাও প্রতিবেশীর দায়িত্ব। কেননা, প্রতিবেশীর হক আদায় ও তার সাথে সদ্ব্যবহার তখনই প্রতিফলিত হবে যখন তার কর্তৃক প্রদত্ত কষ্টে ছবর করা হবে ; কেবল কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার নাম প্রতিবেশীর হক-আদায় নয়। অধিকন্তু প্রতিবেশীর সাথে বিনয় ও বিনম্র স্বভাব অবলম্বন করবে, তার প্রতি অনুকম্পা-অনুগ্রহ করবে— এটা জরুরী। বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন দরিদ্র প্রতিবেশী ধনী প্রতিবেশীর আচল ধরে ফেলবে এবং অভিযোগ করবে— আয় রব্ব! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সে কেন তার ধন-সম্পদ থেকে আমাকে দান করা হতে বিরত রয়েছে, কেন সে আমা থেকে তার দরজা বন্ধ করে রেখেছে।

একদা হযরত ইব্‌নে মুকাফ্‌ফা জানতে পেলেন যে, ঋণ পরিশোধের জন্য তার প্রতিবেশী বাড়ী বিক্রি করে দিচ্ছে। তিনি তাকে তা বিক্রি করতে বারণ করলেন এবং পরিমিত টাকা ঋণ পরিশোধের জন্য হাদিয়া করে দিলেন।

এক বুযুর্গ তাঁর বাড়ীতে ইঁদুরের উৎপাতের কথা উল্লেখ করলে এক ব্যক্তি তাকে পরামর্শ দিয়ে বললো ঃ আপনি বিড়াল পোষলে সমস্যা থাকবে না। তিনি বললেন ঃ এতে খুবই আশংকা রয়েছে যে, বিড়ালের ডাক শুনে ইঁদুর ভয়ে আমার বাড়ী ছেড়ে প্রতিবেশীর বাড়ীতে আশ্রয় নিবে। আমি নিজের জন্য এরূপ হওয়াটা পছন্দ করি না, তাই আমার প্রতিবেশীর জন্যে এটা কেন পছন্দ করবো? সুতরাং এ হতে পারে না।”

মোটকথা, পাড়া-প্রতিবেশীর যেসব হক ও অধিকার রয়েছে, তা মোটামুটিভাবে (সংক্ষেপে) এই যে, সাক্ষাতে তুমি আগে তাকে সালাম দিবে, অযথা আলাপ দীর্ঘ করবে না, বেশী বেশী প্রশ্নের অবতারণা করবে না, অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষা করবে, মুসীবতে তাকে সান্ত্বনা দিবে, শোক-দুঃখে তাকে সঙ্গ দিবে, তার আনন্দে তুমিও আনন্দ প্রকাশ করবে ; তাকে অভিনন্দিত করবে, তার ভুল-ত্রুটি মার্জনা করবে, তার বাড়ীর ছাদের উপর দিয়ে তাকাবে না ; তার গোপনীয়তা নষ্ট করবে না, তার বাড়ীর দেওয়ালে কোন পশু-ছানা বা অন্য কোন বস্তু রেখে তাকে বিরক্ত করবে না, তার সীমানাস্থিত ড্রেন বা প্রণালীতে পানি প্রবাহিত করবে না, তার আঙ্গিনায়

ধুলি-বালি বা মাটি নিক্ষেপ করবে না, তার গৃহে প্রবেশের রাস্তা সংকীর্ণ করবে না, ঘরে কিছু নিয়ে যেতে থাকলে সেদিকে দৃষ্টিপাত করবে না, তার কোন গোপন বিষয় প্রকাশ পেয়ে গেলে তা গোপন করে রাখবে ; প্রচার করবে না, আপদ-বিপদে তার সাহায্য-সহযোগিতা করবে, তার অনুপস্থিতিতে তার বাড়ীর প্রতি রক্ষণাবেক্ষণের দৃষ্টি রাখবে, তার বিরুদ্ধে কোন কথায় কর্ণপাত করবে না, তার ইয্যত-সম্ভ্রম রক্ষায় তৎপর থাকবে, স্ত্রী-পরিবারের প্রতি দৃষ্টি সংযত রাখবে, পরিচারিকার প্রতি তাকাবে না, তার শিশু-সন্তানদের সাথে সবিনয় মিষ্ট-মধুর আচরণ করবে, দ্বীনি বিষয়ে অজ্ঞ হলে মহব্বতের সাথে তাকে সৎ-সঠিক পথ প্রদর্শন করবে, এমনিভাবে পার্থিব বিষয়েও তাকে সুপরামর্শ প্রদান করবে। এ হচ্ছে সাধারণ পাড়া-প্রতিবেশীর মোটামুটি হকসমূহ।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "তোমরা কি জান প্রতিবেশীর প্রতি তোমাদের কর্তব্য কি? সে সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করবে, তার সহযোগিতায় শরীক হবে, সে তোমার কাছে ঋণ চাইলে ঋণ দিবে, সে অভাবগ্রস্ত হলে তাকে সাহায্য করবে, সে অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষা করবে, তার মৃত্যু হলে জানাযায় শরীক হবে ; জানাযার পিছনে অনুসরণ করবে, তার সুসংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করবে, তার বিপদে সান্ত্বনা দিবে, তার অনুমতি ব্যতীত তোমার গৃহকে এত উঁচু করবে না ; যাতে তার বাড়ীতে বাতাস প্রবেশ করতে বাধা পায়, তাকে যন্ত্রণা দিবে না, যদি কোন ফল ক্রয় কর তবে তাকে কিছু দিবে, যদি না দাও তবে গোপনে তা ঘরে নিয়ে যাবে এবং তোমার সন্তানদের তা বাইরে নিয়ে যেতে দিবে না ; যাতে তার সন্তানদের রাগ না জন্মায়, হাঁড়িতে কিছু রান্না করার সময় ধোঁয়ায় তাকে কষ্ট দিও না ; অন্যথায় কিছু খাদ্যাংশ তার ঘরে পাঠিয়ে দিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

اَتَدْرُوْنَ مَا حَقُّ الْجَارِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يَبْلُغُ حَقَّ الْجَارِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَهُ اللّٰهُ ـ

"প্রতিবেশীর প্রতি তোমাদের কর্তব্য কি তা কি তোমরা জান? যাঁর

হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, আল্লাহ্‌র অনুগৃহিত ব্যক্তি ছাড়া প্রতিবেশীর পুরাপুরি হক কেউ আদায় করতে পারবে না।"

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ একদা আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাযিঃ)–এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাঁর এক গোলাম বকরীর গোশত তৈরী করছিল। তিনি তাকে বললেন, গোশত তৈরী শেষ হলে আমাদের ইহূদী প্রতিবেশী থেকে তা বন্টন করা শুরু করবে। এ কথা তিনি পর পর কয়েকবার বললেন। একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, একই কথা আপনি আর কতবার বলবেন? তিনি বললেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে এত বেশী উপদেশ দিয়েছেন যে, আমরা তখন ভেবেছি শীঘ্রই তাকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা হবে।

হযরত হিশাম (রহঃ) বলেছেন ঃ হযরত হাসান (রাযিঃ) ইহূদী কিংবা নাসারা প্রতিবেশীকে কুরবাণীর গোশতের কিছু অংশ দেওয়াটাকে দোষণীয় কিছু মনে করতেন না।

হযরত আবূ যর (রাযিঃ) বলেন ঃ আমার পরম প্রিয় বন্ধু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন ঃ

إِذَا طَبَخْتَ قِدْرًا فَاكْثِرْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ بَعْضَ اَهْلِ بَيْتٍ فِيْ جِيْرَانِكَ فَاغْرِفْ لَهُمْ مِنْهَا

"যখন তরকারী রান্না কর, তার ঝোল বৃদ্ধি করো এবং প্রতিবেশীগণকে তা থেকে কিছু দাও।"

অধ্যায় ঃ ৯১

মদ্যপান ও তার শাস্তি

মদ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে তিনখানি আয়াত নাযিল করেছেন। সর্বপ্রথম নাযিল করেছেন নিম্নোক্ত আয়াতখানি ঃ

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ

"মানুষ আপনাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, এতদুভয়ের মধ্যে গুরুতর পাপও আছে এবং মানুষের কোন কোন উপকারও আছে।" (বাকারাহ্ ঃ ২১৯)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কোন কোন মুসলমান মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ ত্যাগ করেন নাই। পরবর্তীতে এরূপ হয় যে, একজন মদ পান করে নামায আরম্ভ করেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কুরআনের সূরা ভুল পড়তে লাগলেন। তখনই দ্বিতীয় এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى

"হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের কাছেও যেয়ো না।" (নিসা ঃ ৪৩)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও কোন কোন মুসলমান মদ্যপান অব্যাহত রাখেন। আবার কেউ কেউ তা পরিত্যাগ করেন।

ইতিমধ্যে পুনরায় এরূপ হয় যে, একজন মদ পান করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় উটের গণ্ডদেশের একটি হাঁড় উঠিয়ে হযরত আব্দুর রহমান ইব্নে আউফের মাথায় ছুড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। অতঃপর বদরযুদ্ধে নিহত মুশরিক নেতাদের উদ্দেশ্য করে ক্রন্দন করে শোক

ও প্রশংসা কীর্তন করতঃ কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। এ ঘটনা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করা হলে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে চাদর হেঁচড়িয়ে বের হয়ে আসলেন এবং হাতে যা ছিল তা তিনি লোকটির প্রতি ছুড়ে মারলেন। লোকটি তৎক্ষণাৎ বলতে আরম্ভ করলো ঃ আমি আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের ক্রোধ হতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি। তখনই মদ সম্পর্কে কুরআনের এ তৃতীয় আয়াতখানি নাযিল হয় ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

"হে ঈমানদারগণ! নিশ্চিত জেনো— মদ, জুয়া, মূর্তি এবং হুয়ার জন্যে তীর নিক্ষেপ এ সবগুলোই নিকৃষ্ট শয়তানী কাজ। কাজেই এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে থাক, যাতে তোমরা মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করতে পার। মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা-তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্র স্মরণ এবং নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখাই হলো শয়তানের একান্ত কাম্য। তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে না?" (মায়েদাহ্ ঃ ৯১)

আয়াতখানি নাযিল হওয়ার পর তৎক্ষণাৎ হযরত উমর (রাযিঃ) শেষাংশের জের ধরে স্বীয় আনুগত্য ও সমর্থন নিবেদন করে বললেন ঃ

اِنْتَهَيْنَا اِنْتَهَيْنَا

"বিরত হলাম, বিরত হলাম।"

মদ্যপানের নিষিদ্ধতা-সম্পর্কিত প্রচুর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ.

"মদ্যপানে অভ্যাসরত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَوَّلُ مَا نَهَانِيْ رَبِّيْ بَعْدَ عِبَادَةِ الْاَوْثَانِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَمُلَاحَاتِ الرِّجَالِ۔

"মূর্তিপূজার সর্বপ্রথম যে গর্হিত কাজের নিষেধাজ্ঞা আমার কাছে এসেছে তা হলো, মদ্যপান ও ঝগড়া-ফাসাদ।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যেসব লোক দুনিয়াতে মদ্যপানে একত্রিত হয়েছে, জাহান্নামে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে একত্র করবেন। সেখানে তারা পরস্পর একে অপরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে বলতে থাকবে— হে অমুক! আমার সাথে (দুনিয়াতে) তুমি যে আচরণ করেছ সেজন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে কোন ভাল বদলা না দিন ; জাহান্নামের এই আযাব তুমিই আমাকে পৌঁছিয়েছ। এভাবে অন্যান্যরাও বলতে থাকবে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মদ পান করেছে, আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এমন মারাত্মক বিষ পান করাবেন, যা তার সম্মুখে আনার সাথে সাথে তার চেহারার গোশত ও চামড়া বিষপাত্রের মধ্যে খসে পড়ে যাবে। আর যখন তা তাকে পান করানো হবে তখন সর্ব শরীরের গোশত-চামড়া খসে পড়বে ; অন্যান্য দোযখীরাও এ বিষক্রিয়ায় কষ্ট বোধ করবে। ওহে লোক সকল! শুনে রাখ— যে মদ পান করে, যে এর রস বের করে, যে রস নিয়ে যায়, যে বহন করে, যার কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং যে মদের মূল্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এরা সকলেই এই পাপের অংশীদার ; আল্লাহ্ তা'আলা এদের নামায, রোযা, হজ্জ কবূল করবেন না যাবৎ এরা তওবা না করবে। তওবার পূর্বেই যদি এরা মারা যায়, তবে দুনিয়াতে যা পান করেছে তার প্রতি ঢোকে তাদেরকে জাহান্নামের পূঁজ পান করানো আল্লাহ্ তা'আলার কর্তব্য হয়ে যায়। খবরদার! খবরদার! সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য হারাম ; সর্বপ্রকার মদ হারাম।"

ইব্‌নু আবিদ্দুনিয়া (রহঃ) বলেন ঃ "আমি এক মদ্যপ নেশাগ্রস্তের পার্শ্ব

দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম ; দেখি—সে নিজের হাতের উপর প্রস্রাব করছে আর এ দ্বারা তার হাত ধৌত করছে যেমন উযূকারী ব্যক্তি করে থাকে। আবার সে মুখে উচ্চারণ করছে—আল্লাহ্‌র প্রশংসা, যিনি দ্বীন-ইসলামকে নূরস্বরূপ এবং পানিকে পবিত্রতার উপাদানস্বরূপ দিয়েছেন।"

আব্বাস ইব্‌নে মিরদাসকে জাহেলিয়াত-যুগে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ আপনি মদ পান করেন না কেন ; অথচ এটা শরীরের উত্তেজনা বৃদ্ধি করে? তিনি বলেছেন ঃ আমি এটা পছন্দ করি না যে, একটা ঘৃণ্য মূর্খতার বস্তু আমি আমার নিজ হাতে ধরবো, আবার নিজ হাতেই সেটা নিজের পেটে ভরবো ; আমি পছন্দ করি না যে, সকালে আমি সাধারণ মানুষের নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করবো আবার সন্ধ্যাবেলায়ই তাদের সামনে নেশাগ্রস্ত নির্বোধ-নাদান প্রতীয়মান হবো।"

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ সমস্ত কুকার্যের উৎসমূল (মদ্যপান) থেকে তোমরা বেঁচে থাক। পূর্বেকার যুগের জনৈক ইবাদত-গুযার ও সাধু লোক ছিল। জন-কোলাহল থেকে দূরে বিজন এক স্থানে সে ইবাদতে মগ্ন থাকতো। একদা জনৈকা স্ত্রীলোকের তার সাথে সখ্যতা সৃষ্টি হয়। এ সুবাদে কোন এক বিষয়ের উপর সাক্ষ্য প্রদানের অজুহাতে আপন কৃতদাসের মাধ্যমে স্ত্রীলোকটি তাকে খবর দিলে সে এসে উপস্থিত হয়। গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের পর স্ত্রীলোকটি প্রতিটি কক্ষের দরজা বন্ধ করে দেয়। তার সাথেই ছিল একটি বালক। স্ত্রীলোকটি বললো ঃ আমি তোমাকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ডাকি নাই ; এটা কেবল বাহানা মাত্র। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, তুমি এই বালকটিকে খুন কর অথবা অমার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হও কিংবা এক পেয়ালা মদ পান কর। অন্যথায় আমি চিৎকার দিয়ে লোকজন জড়ো করে তোমাকে অপমান করে ছাড়বো। লোকটি কোন দিশা না পেয়ে মদ্যপানে রাজী হলো। এক পেয়ালা মদ পান করে সে বলতে লাগলো ঃ আরও দাও। এভাবে সে বারবার পান করলো। অবশেষে সে স্ত্রীলোকটির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো, এমনকি বালকটিকেও সে খুন করলো। ওহে লোক সকল! মদ্যপান পরিহার কর, তা থেকে পূর্ণ মাত্রায় বেঁচে চল। আল্লাহ্‌র কসম, একই ব্যক্তির হৃদয়ে মদ্যপান ও ঈমান কস্মিনকালেও একত্র

হয় না ; একটি থাকে তো অপরটি বের হয়ে যায়।"

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "আমার এক কন্যা অসুস্থা হয়ে পড়ে। তার জন্য আমি নবীয (খেজুর ভিজানো পানি) তৈরী করেছি। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনলেন। তিনি দেখলেন—খেজুরের নবীযে পাগ উঠছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ দিয়ে তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি আরজ করলাম—আমার পীড়িতা কন্যার চিকিৎসা করা। তিনি বললেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ اُمَّتِيْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْهَا ـ

"কোনরূপ হারাম বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের জন্য রোগ-নিরাময় রাখেন নাই।"

বর্ণিত আছে, "যখন মদ হারাম করা হয়েছে, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা এর সর্ববিধ উপকারিতা উঠিয়ে নিয়েছেন।"

অধ্যায় ঃ ৯২

মি'রাজুন্নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত কাতাদাহ্ থেকে, তিনি হযরত আনাস ইব্‌নে মালেক থেকে এবং তিনি হযরত মালেক ইব্‌নে সা'সাআহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট মি'রাজ-রজনীর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ আমি কাবা ঘরের হাতীমে[১] ছিলাম, অধিকাংশ সময় বলেছেন, পাথরের উপর শুয়েছিলাম। এমন সময় আমার নিকট একজন আগন্তুক (জিব্‌রাঈল) আসলেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি শুনেছি, হুযূর বলেছেন ঃ (অঙ্গুলি নির্দেশনা করে) আমার এখান থেকে এখান পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হয়েছে। এক বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি জারূদকে জিজ্ঞাসা করলাম যিনি শ্রোতা হিসাবে আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন, উক্ত বাক্যের দ্বারা তিনি দেহের কোন কোন স্থানকে উদ্দেশ্য করেছেন? তিনি বললেন ঃ গলদেশ হতে পশম পর্যন্ত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অতঃপর তিনি (জিব্‌রাঈল) আমার দিল্ বের করে ঈমানী নূর দ্বারা ভরপুর এক সোনার খাঞ্চায় রেখে আমার অন্ত্রনালী ইত্যাদি ধৌত করে পুনরায় তা যথাযথ স্থানে স্থাপন করে দিলেন। অতঃপর আমার নিকট গাধার চেয়ে বড় অথচ খচ্চরের চেয়ে সামান্য ছোট সুদৃশ্য একটি জন্তু হাজির করা হলো। জারূদ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ হামযাহ্ (হযরত আনাসের উপনাম)! এটিই কি ছিল বুরাক? হযরত আনাস (রাযিঃ) বললেন ঃ হাঁ, এটিই বুরাক—শূন্য দিগন্তে দৃষ্টি যতদূর যায়, এক এক পদক্ষেপে নিমিষের মধ্যে সে ততদূর পথ অতিক্রম করছিল। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন,

---

[১] হাতীম— কা'বা ঘরেরই একাংশ, কাবা পুনঃনির্মাণের সময় তা বাইরে পড়ে গিয়েছিল এবং অদ্যাবধি সে অবস্থায়ই রয়েছে।

আমাকে সেই বুরাকের উপর আরোহন করানো হলো এবং হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে চললেন। দেখতে দেখতে আমরা দুনিয়ার আকাশে (প্রথম আসমান) পৌছে গেলাম। দরজা খোলার জন্য বলা হলে ভিতর থেকে আওয়ায আসলো— "কে?" উত্তর—আমি জিব্‌রাঈল। প্রশ্ন হলো, "সঙ্গে আর কে?" উত্তর—"মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।" পুনরায় প্রশ্ন হলো, "তিনি কি আমন্ত্রিত হয়েছেন?" জিব্‌রাঈল (আঃ) উত্তর করলেন, "হাঁ"। শুনামাত্রই "মারহাবা" (খুশী হউন) ও শুভাগমন বলতে বলতে ফেরেশ্‌তা দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। সেখানে (প্রথম আসমানে) ছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, এই যে আপনার পিতা আদম (আঃ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি প্রতি–সালাম করে বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

"যোগ্য ছেলে, যোগ্য নবী—খুশী থাক।"

অতঃপর জিব্‌রাঈল আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে উপনীত হলেন। সেখানেও জিব্‌রাঈল (আঃ) দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো— "কে?" উত্তর— "আমি জিব্‌রাঈল।" প্রশ্ন আসলো— "সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন— "মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো—"তিনি কি আমন্ত্রিত হয়েছেন?" জিবরাঈল (আঃ) উত্তর করলেন—"হাঁ"। শুনামাত্রই "খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে তাঁরাও অভ্যর্থনা জানালেন। সেখানে ছিলেন হযরত ইয়াহ্‌য়া ও ঈসা আলাইহিমাস্‌ সালাম ; তাঁরা নবী আলাইহিস্‌ সালামের খালাতো ভাই। জিব্‌রাঈল বললেন ঃ তাঁদেরকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তারা জবাব দিয়ে বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

"খুশী হউন হে আমাদের যোগ্য ভাই ও শ্রেষ্ঠ নবী।"

অতঃপর আমাকে নিয়ে জিব্‌রাঈল (আঃ) তৃতীয় আসমানে উপনীত

হলেন। সেখানেও জিব্‌রাঈল (আঃ) দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো—"কে?" জিব্‌রাঈল বললেন,"আমি জিব্‌রাঈল।" প্রশ্ন আসলো—"সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন—"মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো—"তিনি কি আমন্ত্রিত?" জিব্‌রাঈল বললেন, "হাঁ।" শুনামাত্রই "খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে তারাও দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। এখানে ছিলেন হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম। জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, ইনি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিয়ে বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ۔

"খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও শ্রেষ্ঠ নবী।"

অতঃপর জিব্‌রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানে উপনীত হলেন। দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো— "কে?" উত্তর দিলেন—"আমি জিব্‌রাঈল।" প্রশ্ন আসলো—"সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন—"মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো— "তিনি কি আমন্ত্রিত?" জিব্‌রাঈল বললেন— "হাঁ।" শুনামাত্রই "খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। এখানে ছিলেন হযরত ইদরীস আলাইহিস্ সালাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ইনি হযরত ইদরীস, তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিয়ে বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ۔

"খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও শ্রেষ্ঠ নবী।"

অতঃপর জিব্‌রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানে উপনীত হলেন। দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো— "কে?" জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, "আমি জিব্‌রাঈল।" প্রশ্ন আসলো, "সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন— "মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো— "তিনি কি আমন্ত্রিত?" জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, "হাঁ।" শুনামাত্রই

"খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে দরজা খুলে দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। এখানে ছিলেন হযরত হারূন আলাইহিস্ সালাম। জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, ইনি হযরত হারূন, তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিয়ে বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

"খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও যোগ্য নবী।"

অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানে উপনীত হলেন। সেখানে দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো— "কে?" জিব্রাঈল (আঃ) বললেন ঃ "আমি জিব্রাঈল।" প্রশ্ন আসলো— "সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন— "মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আবার প্রশ্ন আসলো—"তিনি কি আমন্ত্রিত?" জিবরাঈল (আঃ) বললেন—"হাঁ।" শুনামাত্রই "খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে দরজা খুলে দেন। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম হযরত মূসা আলাইহিস সালাম। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, "সালাম করুন, ইনি হযরত মূসা (আঃ)।" আমি সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন এবং বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

"খুশী হউন হে আমার যোগ্য ভাই ও যোগ্য নবী।"

অতঃপর আমি যখন উর্ধ্ব-পথে রওয়ানা হলাম, তখন হযরত মূসা (আঃ) ক্রন্দন করে উঠলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "এই নব্য যুবক পয়গাম্বর? আমার পরে তিনি প্রেরিত হয়েছেন। অথচ আমার উম্মতের চেয়ে তাঁর উম্মত বেহেশ্তে যাবে অনেক বেশী সংখ্যায়।"

অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে পৌছলেন সপ্তম আসমানে। সেখানে দরজা খোলার জন্য বললেন। আওয়ায আসলো— "কে?" জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, "আমি জিব্রাঈল।" প্রশ্ন আসলো— "সঙ্গে কে?" উত্তর দিলেন— "মুহাম্মদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। পুনরায় প্রশ্ন আসলো— "তিনি কি আমন্ত্রিত?" জিব্রাঈল (আঃ) বললেন—"হাঁ।" শুনামাত্রই

"খুশী থাকুন, মহান ব্যক্তির শুভাগমন" বলে অভ্যর্থনা জানান। ভিতরে প্রবেশ করে দেখি হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম। জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, ইনি আপনার পিতা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি প্রতি-সালাম করলেন এবং বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالْإِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ-

"যোগ্য ছেলে যোগ্য নবী খুশী থাক।"

অতঃপর আমাকে আরও উর্ধ্বলোকে "সিদ্‌রাতুল-মুনতাহা"য় পৌছানো হয়েছে। সেই বৃক্ষের একটি কুল 'হাজরে'র (এক স্থানের নাম) বিখ্যাত মটকার মত বড়। আর এক একটি পাতা যেন হাতীর এক একটি কান। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, "এটি সিদ্‌রাতুল-মুন্‌তাহা।" সেখানে দেখি চারটি নদী প্রবাহিত। জিজ্ঞাসার পর হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, যে দুইটি নদী ভিতরের দিকে প্রবাহিত, সেই দুইটি বেহেশতের নদী। আর বহির্মুখী নদী দুইটি নীল ও ফুরাত (অর্থাৎ নীল নদ ও ফুরাত নদীর প্রতিকৃতি)।"

অতঃপর আমাকে বায়তুল-মা'মূরে প্রবেশ করানো হয়েছে। প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা সেই গৃহে প্রবেশ করেন এবং একবার বের হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার তাদের পালা আসে না।

অতঃপর আমার সম্মুখে এক পেয়ালা শরাব, এক পেয়ালা দুধ ও এক পেয়ালা মধু রেখে যেটি ইচ্ছা পান করতে আমাকে বলা হলো। আমি দুধের পেয়ালাটি শুধু গ্রহণ করি। এতদ্দর্শনে জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, "এটি দ্বীন (ধর্ম), যার উপরে আপনি এবং আপনার উম্মত কায়েম থাকবেন।"

অতঃপর আমার উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হলো। সেখান হতে ফেরার পথে মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট এলে তিনি জানতে চাইলেন— কি কি ফরয করা হয়েছে। আমি বললাম, "দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায।" হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আপনার উম্মতের দ্বারা পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করা কখনও সম্ভবপর হবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে কতই অসুবিধা ভোগ করেছি। তাদেরকে হেদায়েত করার চেষ্টা ও

তদবীরে আমি কম করি নাই। কিন্তু সবই বৃথা গিয়েছে। কাজেই আপনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গিয়ে নামাযে আরও কিছু কম করিয়ে নিন। অতঃপর আমি আল্লাহ্র দরবারে হাজির হয়ে অনুরোধ জানালে পর আল্লাহ্ তা'আলা দশ ওয়াক্ত মাফ করলেন। ফেরার পথে আবার মূসা (আঃ)–এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি পূর্বের ন্যায় শঙ্কা প্রকাশ করে আরও কিছুটা লাঘব করে নেওয়ার পরামর্শ দেন। আমি আবার আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয় আরযী পেশ করলাম। এবার আরও দশ ওয়াক্ত নামায মওকূফ করা হলো। এবারও মূসা আলাইহিস্ সালামের সাথে সাক্ষাৎ হলে পূর্বের ন্যায় পরামর্শ দেন। আর আমি আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজী পেশ করলে আরও দশ ওয়াক্ত নামায লাঘব করে দেন। ফেরার পথে মূসা (আঃ)–এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তিনি পূর্ববৎ আরও কিছুটা লাঘব করে নিতে বলেন। আমি পুনরায় আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজী পেশ করি। তখন আরও দশ ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেওয়া হলো। পুনরায় যখন মূসা (আঃ)–এর নিকট পৌঁছলাম, তিনি (শুনে) পূর্বের ন্যায় বললেন। আমি আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হলাম। এবার দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হলো। আমি মূসা আলাইহিস্ সালামের নিকট ফিরে আসলে এবারও তিনি বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও আদায় করতে পারবে না। আমি বনী ইসরাঈল–এর দরুন বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি– তাদেরকে নিয়ে আমি কতই না অসুবিধা ভোগ করেছি। কাজেই অবস্থা আমার খুব জানা আছে। সুতরাং আপনি আরও কমিয়ে নিতে পারেন কিনা চেষ্টা করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "বারবার গিয়ে আব্দার করেছি। এখন আমার লজ্জাবোধ হয়। আমি আর যেতে চাই না। পাঁচ ওয়াক্তের নামাযই আমি কবুল করে নিলাম।" এমন সময় আরশ হতেও আওয়ায আসলো ঃ

اَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِىْ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِىْ -

"আমার ফরয বলবৎই রেখেছি, তবে বান্দাদের কাজ লাঘব করে দিয়েছি।"

অধ্যায় ঃ ৯৩

জুমু'আর ফযীলত

জুমু'আর দিন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতময় দিন। এই দিনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীন-ইসলামকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, অনুরূপ মুসলমানদের জন্য এ দিনটি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ দান। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ

"যখন জুমু'আর দিনে নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর।" (জুমু'আহ্ ঃ ৯)

অতএব, জুমু'আর আযানের পর দুনিয়াবী কাজে মগ্ন না থেকে খুতবা ও নামাযের জন্য মসজিদে যেতে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্তব্য। অনুরূপভাবে জুমু'আর জন্য বিঘ্নতা সৃষ্টি করে এমন কার্যসমূহ অবশ্য পরিত্যাজ্য।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর আমার এই দিনে এবং আমার এই স্থানে জুমু'আ ফরয করেছেন।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ "বিনা উযরে যে ব্যক্তি তিনটি জুমু'আ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে (দুর্ভাগ্যের) সিলমোহর লাগিয়ে দিবেন।" অন্য সূত্রে বর্ণিত— এমন ব্যক্তি ইসলামকে যেন স্বীয় পৃষ্ঠের পশ্চাতে নিক্ষেপ করলো।

এক ব্যক্তি হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো, জনৈক ব্যক্তি মারা গেছে ; সে জুমু'আ পড়তো না এবং জামাতেও হাজির হতো না। তিনি বললেন, সে ব্যক্তি দোযখে যাবে। প্রশ্নকারী লোকটি এক

মাস পর্যন্ত একই প্রশ্ন করতে থাকলো এবং ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) তাকে একই জবাব দিলেন যে, সে দোযখে যাবে।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে—ইহূদী নাসারাদেরকে জুমু'আর এই দিনটি দেওয়া হয়েছিল ; কিন্তু তারা এতে মতবিরোধ করেছে। ফলে, এ থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। আর আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জুমু'আর দিনের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন, আমরা তা লাভ করেছি এবং পূর্ব থেকেই এ দিনটি এই উম্মতের জন্য রাখা হয়েছিল। এ উম্মতের জন্য দিনটি ঈদের দিন। সুতরাং এই উম্মত সকলের অগ্রবর্তী হয়ে গেল আর ইহূদী-নাসারাগণ পিছনে পড়ে গেল।

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত—হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ একদা হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) আমার নিকট তশরীফ আনলেন, তাঁর হাতে ছিল একটি শুভ্র কাঁচের টুকরা; বললেন, এটি জুমু'আ—আপনার রব্ব আপনার উপর ফরয করেছেন, যাতে আপনার জন্য এবং আপনার পর উম্মতের জন্য এটি দলীল স্বরূপ হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এতে আমাদের জন্য কি আছে? জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, এতে এমন একটি মহামূল্যবান মুহূর্ত রয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি নিজের কোন নেক মকসূদ পূরণের জন্য সেই মুহূর্তে দো'আ করে, তবে তা অবশ্যই কবূল হবে। আর যদি সেই প্রার্থিত বস্তু তার ভাগ্যে পূর্ব থেকে লিপিবদ্ধ না থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা প্রার্থনাকারীকে তদপেক্ষা অধিক প্রিয় ও আকর্ষণীয় বস্তু দান করবেন। অনুরূপভাবে যদি কেউ সেই মুহূর্তে তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ কোন অনিষ্টকর বস্তু থেকে পানাহ চায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তদপেক্ষা বড় বিপদ হতে রক্ষা করবেন। আমাদের নিকট এ দিনটি সমস্ত দিনের সর্দার। আখেরাতে এ দিনটিকে আমরা 'ইয়াওমুল-মাযীদ' (অতিরিক্ত পুরস্কার দিবস) বলে ডাকবো। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলে হযরত জিব্‌রাঈল বললেন, 'বেহেশতে আল্লাহ্ তা'আলা এমন একটি স্থান তৈরী করে রেখেছেন, যা শুভ্র মুশকের চেয়েও অধিক সুঘ্রাণময় হবে। প্রতি জুমু'আর দিন আল্লাহ্ তা'আলা ইল্লিয়্যীন থেকে কুরসীর উপর (স্বীয় মহিমায়) অবতরণ করতঃ বেহেশতবাসীদের জন্য তজল্লী এখতিয়ার করেন। অতঃপর তারা আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভ করবে।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "এমন সকল দিন অপেক্ষা যাতে সূর্য উদিত হয় (অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত দিনের মধ্যে) সর্বশ্রেষ্ঠ দিন জুমু'আর দিন। এই দিনেই হযরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁকে বেহেশতে দাখেল করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁকে যমীনে অবতরণ করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁর তওবা কবূল করা হয়েছে, এই দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এই দিনেই কিয়ামত কায়েম হবে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ দিনটি 'ইয়াওমুল-মাযীদ' (বা অতিরিক্ত পরস্কার দিবস), আসমানে ফেরেশতাগণ দিনটিকে এই নামেই জানেন, বেহেশতে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভের দিনও এটি।"

বর্ণিত আছে, "প্রত্যেক জুমু'আর দিন আল্লাহ্ তা'আলা ছয় লক্ষ দোযখীকে মুক্তি দান করেন।"

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "জুমু'আর দিন যদি নিরাপদ (পাপাচার ও আপদমুক্ত) থাকে, তবে (সপ্তাহের) অবশিষ্ট দিনগুলোও নিরাপদ থাকবে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ সূর্যটি ঢলার পূর্বমুহূর্তে আকাশের মাঝখানে যখন থাকে, প্রতিদিন সেই সময় দোযখের আগুন উত্তপ্ত করা হয়, কাজেই তোমরা তখন নামায পড়ো না—তবে জুমু'আর দিন ব্যতীত। কেননা, জুমু'আর পূর্ণ দিনই নামাযের জন্য—এদিন দোযখ উত্তপ্ত করা হয় না।"

হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলন— "আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত জনপদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন মক্কা-কে, সমস্ত মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন রমযান মাস-কে, সমস্ত দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন জুমু'আর দিন-কে এবং সমস্ত রাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন শবে-কদর-কে।"

কথিত আছে, পক্ষীকুল এবং পোকা-মাকড় পর্যন্ত জুমু'আর দিন পরস্পর সাক্ষাৎ করে এবং বলে ঃ "সালাম, সালাম, শুভদিন।"

হুযূর আকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে অথবা জুমু'আর রাত্রে মারা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য শহীদের সমতুল সওয়াব লিখে দেন এবং কবরের ফেতনা থেকে তাকে রক্ষা করেন।

অধ্যায় ঃ ৯৪

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য

স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রচুর হক ও অধিকার রয়েছে। স্বামী স্ত্রীর প্রতি সদা সদয় ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করবে। স্ত্রীর কোন আচরণ অপছন্দ হলে ছবর ও ধৈর্য ধারণ করবে ; কারণ বুদ্ধি-বিবেকের দিক থেকে তারা অপূর্ণ। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج

"আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর।" (নিসা ঃ ১৯)

আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার ও হক আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে ইরশাদ করেন ঃ

وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ○

"আর এই নারীগণ তোমাদের নিকট হতে এক দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে রেখেছে।" (নিসা ঃ ২১)

আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ

"(তোমরা সদ্ব্যবহার কর) সহচরদের সাথেও।" (নিসা ঃ ৩৬)

এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'সহচরদের' দ্বারা স্ত্রীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের অন্তিম সময়ে যখন তাঁর জবান মুবারক আড়ষ্ট ও আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে আসছিল—তখন ওসীয়ত করেছিলেন ঃ

اَلصَّلٰوةَ اَلصَّلٰوةَ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ لَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا لَا يُطِيْقُوْنَ اللّٰهَ

اللّٰهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ فِي أَيْدِيكُمْ ـ

"নামায, নামায। তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীকে তাদের শক্তি-সামর্থের বাইরে কখনও বোঝা চাপিয়ো না। স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের হক আদায়ের বিষয়ে আল্লাহ্কে ভয় কর ; তারা বস্তুতঃ তোমাদের হাতে বন্দী।"

স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করার বিশেষ তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্র বিধান ও আমানতের অধীনে তাদেরকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্র দেওয়া বাক্যের মাধ্যমেই তাদের গোপনাঙ্গ তোমাদের জন্য হালাল হয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর কষ্টদায়ক আচরণে ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মুসীবতের উপর হযরত আইয়ূব আলাইহিস্ সালামের ছবর-সমতুল্য সওয়াব দান করবেন। আর যে স্ত্রীলোক তার স্বামীর অসদাচরণে ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ফেরাউনের স্ত্রী হযরত আছিয়ার সমতুল্য সওয়াব দান করবেন।"

মনে রেখো— স্ত্রীকে শুধু কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার নাম স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার ও তার হক আদায় নয় ; বরং প্রকৃত হক আদায় ও সদ্ব্যবহার হচ্ছে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনরূপ অসদ্ব্যবহার ও কষ্ট প্রদান হলে তাতে ধৈর্যধারণ করা, সে ক্রোধান্বিত হলে বা উত্তেজিত হলে তা অম্লান বদনে সয়ে নেওয়া। এ ব্যাপারে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের অনুকরণ করা চাই। তাঁর বিবিগণ কখনও তাঁর সাথে তর্ক করতেন কিংবা তাদের কেউ তাঁর থেকে পৃথক একাকীত্বেও রাত্রি যাপন করেছেন।

একদা হযরত উমর (রাযিঃ)-এর স্ত্রী তাঁর সাথে তর্কে লিপ্ত হলে তিনি যখন বললেন—কিহে! তুমি আমার সাথে তর্ক করছো? হযরত উমরের স্ত্রী বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ যে ক্ষেত্রে তাঁর সাথে তর্ক করেন ; অথচ তিনি আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সেক্ষেত্রে আমি কেন অপরাধী হবো? হযরত উমর (রাযিঃ) বল্লেন ঃ বড় দুর্ভাগ্য

হবে হাফ্‌সার যদি সে হুযূরের সাথে তর্ক করে থাকে। অতঃপর তিনি (আপন কন্যা) হযরত হাফ্‌সাকে বল্‌লেন ঃ "আবূ কুহাফার পুত্র আবূ বকরের কন্যার (আয়েশার) প্রতি তোমার অন্তরে যেন কোনরূপ হিংসার উদ্রেক না হয়। মনে রেখো—সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরম প্রিয় ও ভালবাসার পাত্র—এমনিভাবে তিনি হযরত হাফ্‌সাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তর্কের বিষয়ে সতর্ক করে আরও উপদেশ দিয়েছেন।

বর্ণিত আছে, একদা হুযূরের কোন স্ত্রী তাঁর বুকে জোরে হাত মেরে ধাক্কার ন্যায় দিয়েছিলেন। এ জন্যে স্ত্রীর মাতা তাকে শাসন করে ধমক দিচ্ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল্‌লেন ঃ তাকে ছেড়ে দিন ; তারা তো আমার সাথে এর চেয়ে আরও অধিক করে থাকে।

একদা হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এবং হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে বাদানুবাদ হয়। তাঁরা দু'জনেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-কে মধ্যস্থ (সালিস-বিচারক) সাব্যস্ত করে তাঁকে খবর দিলে তিনি উপস্থিত হলেন। হুযূর বল্‌লেন ঃ হে আয়েশা! তুমি আগে বলবে না আমি আগে বলবো? হযরত আয়েশা বল্‌লেন ঃ আপনিই আগে বলুন এবং দেখুন—সত্য ছাড়া কিছু বলবেন না। এ কথা শুনে হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে পদাঘাত করলেন, ফলে তাঁর মুখ থেকে রক্ত বের হয়ে এল। আর বললেন ঃ ওহে নিজের দুশমন! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কখনও অসত্য বলতে পারেন? হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই আশ্রয় নিলেন এবং তাঁর পিছন পার্শ্বে গিয়ে বসে রইলেন। তখন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল্‌লেন ঃ হে আবূ বকর! তোমাকে আমরা এই কাজ করার জন্য ডাকি নাই এবং এটা আমার পছন্দও নয়।

একদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) রাগ হয়ে কথার ভিতর বলে ফেলেছেন ঃ আপনি তো মনে করেন যে, খুব আল্লাহ্‌র নবী হয়ে গেছেন। এ কথা শুনেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। এ ছিল তাঁর স্ত্রীর সাথে সুন্দর সদ্ব্যবহার ও উন্নত চরিত্রের আদর্শ। (এ সব ক্ষেত্রে নুবুওয়তের শানে বে-আদবী, অস্বীকৃতি, কিংবা অন্য কোন

ধরণের প্রশ্নই উঠে না ; এ ছিল তাদের মধ্যকার অম্ল-মধুর সম্পর্কের অভিব্যক্তি; খাঁটী ঈমানদারের জন্য তা উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন কিছু নয়।)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে বল্‌তেন ঃ আমি তোমার সন্তোষ কি ক্রোধের অবস্থা পূবাহ্নেই আঁচ করতে পারি। হযরত আয়েশা আরজ করলেন ; আপনি কিরূপে তা বুঝতে পারেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ তুমি যখন খুশী থাক, তখন কথা বলতে গিয়ে বল ঃ না, মুহাম্মদের প্রভুর কসম, আর যখন রাগান্বিত থাক তখন বল ঃ না, ইব্‌রাহীমের প্রভুর কসম। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বল্‌লেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন আমি কেবল আপনার নামটাই উচ্চারণ করি না। (কিন্তু আপনার মহব্বত ও প্রেম-ভক্তি আমার অন্তঃকরণে গেঁথে থাকে)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে তাঁর বিবিগণের মধ্যে প্রথম হযরত আয়েশার মহব্বতই হয়েছে। তিনি বলতেন ঃ "হে আয়েশা! আবূ যরা' তার স্ত্রীর জন্য যেমন ছিল, আমিও তোমার পক্ষে তদ্রূপ। তবে আমি তোমাকে তালাক দিবো না।"

হুযূর আলাইহিস্ সালাম তাঁর অন্যান্য বিবিগণকে বলতেন ঃ তোমরা আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কোনরূপ কষ্ট দিও না ; কেননা, আল্লাহ্‌র কসম- তোমাদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই সাথে শয্যাগ্রহণ অবস্থায় আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে। (সুতরাং তাঁর মর্তবা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খুবই উচু)

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদের প্রতি এবং ছোটদের প্রতি সকল মানুষ অপেক্ষা দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিবিগণের সাথে নেহাৎ সরল-সহজ ও সাদা-সিধা আচার-আচরণে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি তাদের সাথে কথা, কার্যে ও চরিত্রে উদার নীতি অবলম্বন করে চলতেন। তিনি তাদের সাথে কৌতুক-আনন্দও করতেন। একদা তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর সাথে দৌড়-প্রতিযোগিতা করেছিলেন। এতে হযরত আয়েশা অগ্রগামী হয়ে যান। পরবর্তী সময়ে পুনরায় একবার যখন প্রতিযোগিতা হয়, তখন তিনি অগ্রসর হয়ে গেলেন। এবার তিনি বল্‌লেন ঃ দেখ হে আয়েশা! আমি কিন্তু পূর্বেরটা শোধ করে দিলাম। বিবিদের মনে আনন্দ

আনয়নের জন্য তিনি এরূপ করতেন। বর্ণিত আছে, তিনি আপন স্ত্রীদের সাথে সর্বজন অপেক্ষা কৌতুকী ছিলেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, হাবাশার কিছু লোক আশূরের দিনে খেলা-ধূলা করছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বল্লেন ঃ তুমি কি এদের খেলা-ধূলা দেখবে? আমি সম্মতিসূচক উত্তর দিলে তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠালেন। দরজায় দাঁড়িয়ে দু' দিকে দু' হাত দরাজ করে তা ধরে রাখলেন। আমি তাঁর এক হাতের উপর চিবুক রেখে তাদের খেলা দেখছিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি বল্লেন ঃ বস্ বস্, এখন শেষ কর। আমি বল্লাম—না, আরও কিছুক্ষণ দেখবো। এভাবে কিছুক্ষণ পর পর দু'তিনবার তিনি আমাকে ক্ষান্ত করতে বল্লেন। অবশেষে আরও একবার যখন বল্লেন, তখন আমি ক্ষান্ত করলে তিনি তাদেরকে যেতে বল্লেন ; তারা চলে গেল।

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সমস্ত মু'মিনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পূর্ণ ঈমানের অধিকারী, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী এবং আপন স্ত্রীদের সাথে সর্বাপেক্ষা অমায়িক ও বিনম্র স্বভাবের অধিকারী।

তিনি বলেছেন ঃ

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي .

"তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তারা যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহারে উৎকৃষ্ট। আমি আমার স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহারে তোমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।"

হযরত উমর (রাযিঃ) কঠিন হওয়া সত্ত্বেও বল্ছেন ঃ তোমরা নিজ গৃহে স্ত্রীদের সাথে শিশুসুলভ মন নিয়ে থাক ; পুরুষোচিত যোগ্যতার যেখানে প্রয়োজন সেখানে তা দেখাবে।"

হযরত লুক্মান (রহঃ) বলেন ঃ "বুদ্ধিমানের উচিত সে যেন ঘরের পরিবেশে বাচ্চার মত থাকে, আর সমাজে পুরুষের ন্যায় থাকে।"

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহ্ তা'আলা রুক্ষ স্বভাবসম্পন্ন পাষাণ হৃদয় লোককে পছন্দ করেন না।" এর অর্থ হচ্ছে, যারা আপন স্ত্রীদের সাথে

এরূপ স্বভাবের আচরণ করে এবং মনের দিক থেকে দাম্ভিক ও অহংকারী হয়।

কুরআনে ব্যবহৃত عُتُلّ শব্দের মর্মও তাই, অর্থাৎ স্ত্রীদের সাথে রুক্ষ আচরণকারী।

হযরত জাবের (রাযিঃ) জনৈকা বিধবা স্ত্রীলোককে বিবাহ করলে পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন ঃ "তুমি কুমারী কন্যা বিবাহ করলে না কেন? তুমি তার সাথে কৌতুক করতে এবং সেও তোমার সাথে কৌতুক করতো।"

এক বেদুঈন মরুচারীনি স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর পর তার প্রশংসা করে বলছিল ঃ "গৃহে প্রবেশ করার পর তিনি সদা হাস্যমুখ থাকতেন আর বাইরে-সমাজে তিনি থাকতেন স্বল্পভাষী ও গাম্ভীর্যের অধিকারী। ঘরে যৎকিঞ্চিৎ যা-ই পেতেন খেয়ে নিতেন, ঘরের কোন বস্তু হারিয়ে গেলে তেমন কোন যোগ-জিজ্ঞাসা করতেন না।"

স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচারের মধ্যে এটিও একটি যে, খোলা-মেলা, সরলতা ও বিনম্র স্বভাবের আতিশয্যে তাদের বাসনা পূরণে সীমা লংঘন না করা চাই, যার ফলে তাদের নৈতিক চরিত্র বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তোমার প্রতি ভক্তি-প্রযুক্ত ভয় দূর হয়ে যায়। বরং ন্যায়-পরায়ণ ও মধ্যপন্থী থাকা চাই এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা কায়েম থাকে—এরূপ আচরণ করা চাই। যদি তাদের থেকে শরীয়তের খেলাফ বা ইসলামী রীতি-নীতি বিরোধী কার্যকলাপ সংঘটিত হয়, তবে সাথে সাথে প্রতিবাদ ও শাসন করা চাই।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন ঃ "আল্লাহ্র কসম, সর্ববিষয়ে যে ব্যক্তি স্ত্রীর কামনা-বাসনার পায়রবী করে, পরিণামে সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।"

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন ঃ "অনেক সময় স্ত্রীদের কথা বা পরামর্শের বিপরীত করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত থাকে।"

জনৈক জ্ঞান-তাপসের উক্তি হচ্ছে, স্ত্রীদের সাথে তোমরা পরামর্শ কর, আবার (অনেক ক্ষেত্রে) পরামর্শের বিপরীতও কর।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "স্ত্রী-

বশীভূত পুরুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।" এর কারণ হচ্ছে, ক্রমান্বয়ে সে তার দাসে পরিণত হয় ; অবশেষে স্ত্রীর আজ্ঞাবহ হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ধ্বংসের গহ্বরে গিয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষকে নারীর কর্তা বানিয়েছেন ; কিন্তু সে তা উল্টিয়ে দেয়। ফলে, সে শয়তানের অনুসারী হয়, যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ط

"(শয়তান বলে,) আমি তাদেরকে আরও শিক্ষা দিবো, যেন তারা আল্লাহ্র সৃষ্ট আকৃতিকে বিকৃত করে দেয়।" (নিসা ঃ ১১৮)

পুরুষের উচিত ছিল, সে কর্তা হয়ে থাকবে, না অধীন। আল্লাহ্ পাক পুরুষদের সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ

"পুরুষগণ নারীদের শাসনকর্তা।" (নিসা ঃ ৩৪)

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ইউসুফে স্বামীকে 'সর্দার' বলে অভিহিত করেছেন, ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ -

"এবং উভয়ে সেই রমনীর সর্দার (স্বামী)-কে দরজার নিকট দাঁড়ানো অবস্থায় পেল।" (ইউসুফ ঃ ২৫)

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন ঃ "তিনটি শ্রেণী এমন রয়েছে যদি তাদের সম্মান কর, তবে তারা তোমাকে হেয় করবে ঃ ১. স্ত্রী, ২. খাদেম (চাকর), ৩. ঘোড়া।" এ উক্তির দ্বারা হযরত ইমামের উদ্দেশ্য হলো, যদি কেবল সম্মান আর সদয় ব্যবহারই করা হয়, সেইসাথে সময় সময় প্রয়োজনে কোনরূপ প্রতিবাদ ও শাসন না করা হয়, তবে পরিণতি এরূপই দাড়ায়।

অধ্যায় ঃ ৯৫

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য

এ সম্পর্কিত মৌলিক ও সারকথা এই যে, বিবাহ্-বন্ধন প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব-অধীনতারই একটি প্রকার। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর স্ত্রী স্বামীর জন্যে এক প্রকার আজ্ঞাবহ দাসীরূপ হয়ে যায়। তখন তার কর্তব্য হয়— স্বামীর অভীপ্সিত প্রতি কাজে আনুগত্য করা। তবে শর্ত এই যে, তা কোনরূপ আল্লাহ্র অবাধ্যতা ও পাপকার্য না হওয়া চাই।

স্বামীর আনুগত্যে স্ত্রীর কর্তব্য ও দায়িত্ব— এ সম্পর্কিত প্রচুর রেওয়ায়াত হাদীসগ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ.

"যে স্ত্রীলোক তার স্বামীকে খুশী রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

এক ব্যক্তি সফরে (প্রবাসে) গমনকালে তার স্ত্রীর কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিল যে, সে তার অনুপস্থিতির সময়-কালে উপর (তলা) থেকে নীচে অবতরণ করবে না। নীচে স্ত্রীর পিতা অবস্থান করতেন। একদা তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। নীচে নেমে পিতাকে দেখা ও সেবা-শুশ্রূষার জন্য অনুমতি চেয়ে স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোক পাঠালো। তিনি বললেন ঃ তাকে বল, সে যেন স্বামীর অনুগতই থাকে। এরপর পিতা মারা যান। পুনরায় অনুমতি চেয়ে লোক পাঠালে হুযূর বললেন ঃ তাকে বল, সে যেন স্বামীর অনুগতই থাকে। অতঃপর পিতার দাফনকার্য সম্পন্ন হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীর নিকট পয়গাম পাঠালেন যে, "স্বামীর আনুগত্যের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা

তোমার পিতাকে মাফ করে দিয়েছেন।" (বিধানটি স্বতন্ত্র ; কেননা ক্ষেত্রবিশেষে এ হুকুমের তারতম্যও হতে পারে।)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتْ جَنَّةَ رَبِّهَا۔

"যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযানের রোযা রাখে, আপন সতীত্ব রক্ষা করে এবং স্বামীর বাধ্য থাকে—সে তার প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

প্রণিধানযোগ্য যে, এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামীর বাধ্যতার বিষয়টিকে ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়াবলীর সাথে উল্লেখ করে তৎপ্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদের প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ مُرْضِعَاتٌ رَحِيمَاتٌ بِاَوْلَادِهِنَّ لَوْلَا مَا يَأْتِيْنَ اِلٰى اَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ

"গর্ভধারীনি স্ত্রীলোক, সন্তানের মা, সন্তানকে দুধ পান করানোর কষ্ট স্বীকারকারীনি, সন্তানের প্রতি দয়া ও স্নেহ প্রদর্শনকারীনি— এরা যদি স্বামীর প্রতি অবাধ্যতার আচরণ না করে, যা সাধারণতঃ করে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে নিয়মিত নামাযী মহিলারা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَاِذَا اَكْثَرُ اَهْلِهَا النِّسَاءُ فَقُلْنَ لِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ۔

"আমি জাহান্নামে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি ; দেখি— সেখানের অধিকাংশ অধিবাসী নারী সমাজ। তারা জিজ্ঞাসা করলো ঃ কেন এমন হবে ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ তারা অতি মাত্রায় অভিশাপ বর্ষণ করে এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "আমি জান্নাতে দৃষ্টিপাত করেছি ; দেখি— নারী সমাজ সেখানে খুবই কম। (বর্ণনাকারী বলেন ঃ) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ স্বর্ণ ও যাফরান (রঙ্গিন পোষাক) এ দুই লালের আকর্ষণ ও মোহ তাদেরকে বিমুখ করে রেখেছে।"

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বলেন ঃ একজন যুবতী মেয়েলোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এখন উঠতি বয়স ; বিয়ের জন্যে আমার পয়গাম আসছে ; কিন্তু আমি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকে অপছন্দ করছি। আপনি বলুন— স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য কি রয়েছে? তিনি বললেন ঃ আপাদমস্তক স্বামীর শরীর পীড়িত হয়ে যদি পূঁজে ভরে যায় আর স্ত্রী তার সেবা-শুশ্রূষায় আপন জিহ্বা দ্বারা লেহন করে, তবু তার কৃতজ্ঞতা আদায় হবে না। মেয়েলোকটি বললো ঃ তাহলে কি আমি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবো না? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না, তুমি বিবাহ বস ; কারণ এতেই মঙ্গল নিহিত রয়েছে।

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, খাস্আম গোত্রের এক মহিলা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি একজন বিধবা স্ত্রীলোক ; আমার বিবাহ বসার ইচ্ছা আছে, আপনি বলুন— স্বামীর হক কি? তিনি বললেন ঃ স্ত্রীর উপর স্বামীর হক হচ্ছে, সে যখন তার স্ত্রীকে শয্যায় আহ্বান করে, তখন সে উটের পিঠে উপবিষ্ট থাকলেও যেন তার কাছে এসে উপস্থিত হয়। স্বামীর আরও হক হচ্ছে যে, তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী গৃহের কোন বস্তু কাউকে দিবে না। যদি দেয় তবে গুনাহ্ স্ত্রীর হবে আর সওয়াব স্বামীর হবে। স্বামীর আরেকটি হক হচ্ছে, তার অনুমতি ব্যতীত

স্ত্রী নফল রোযা রাখবে না। যদি এরূপ করে তবে এটা অযথা পানাহার থেকে বিরত থেকে কষ্ট করা হবে ; কোনরূপ সওয়াব হবে না। স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতি বতীত ঘর থেকে বের হয়, তবে পুনরায় ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত অথবা তওবা না করা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

"আমি যদি অন্য কাউকে সেজদা করতে আদেশ করতাম তাহলে নারীদেরই বলতাম তাদের স্বামীদের সেজদা করতে।" কারণ স্ত্রীদের উপর স্বামীদের হক গুরুতর।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ স্ত্রীলোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত নিকটতর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয় তখন, যখন তারা আপন গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। গৃহের আঙ্গিনায় আদায়কৃত তাদের নামায মসজিদে আদায়কৃত নামায হতে উত্তম। গৃহাভ্যন্তরে আদায়কৃত নামায গৃহের আঙ্গিনায় আদায়কৃত নামায হতে উত্তম। গৃহের অন্দর কুঠরীতে আদায়কৃত নামায (সাধারণ) গৃহাভ্যন্তরে আদায়কৃত নামায হতে উত্তম।" পর্দার হেফাযতের জন্যেই এ হুকুম হয়েছে। এ জন্যেই তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ "স্ত্রীলোক স্বয়ং পর্দা ; ঘর থেকে বের হলেই শয়তান উঁকি-ঝুকি মারতে থাকে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "স্ত্রীলোকের পর্দা এগারটি ঃ বিবাহের পর স্বামী তার জন্যে একটি পর্দা ; মৃত্যুর পর কবর তার জন্যে দশটি পর্দা।"

মোটকথা, স্ত্রীর উপর স্বামীর অনেক হক রয়েছে ; তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হক হচ্ছে দুটি ঃ- এক. আপন সতীত্বরক্ষা ও পর্দা পালন। দুই. প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু স্বামীর কাছে দাবী না করা।

আদর্শ পূর্বসূরীগণের নীতি ছিল, তাদের কেউ যখন জীবিকার জন্য ঘর থেকে বের হতেন, তখন তাদের স্ত্রী-কন্যাগণ বলতেন ঃ অবৈধ উপার্জন

থেকে বেঁচে চলবেন ; আমরা "ক্ষুধার যন্ত্রণা ও অন্যান্য কষ্ট সহ্য করে নিবো। তবুও দোযখের আগুন সহ্য করতে পারবো না।"

তাঁদেরই মধ্যকার একজনের ঘটনা— একদা সফরের এরাদা করলেন। পাড়া-প্রতিবেশী কেউ তার এ সফর কামনা করছিল না ; তারা সে লোকের স্ত্রীকে বললো ঃ আপনি তার এ সফরে সম্মতি দিচ্ছেন কেন, অথচ তিনি তার অনুপস্থিতিকালীন খরচাদি আপনাদেরকে দিয়ে যাচ্ছেন না? স্ত্রী জবাব দিলেন ঃ আমি তার সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকে তাকে শুধু একজন ভোজন-বিলাসীই পেয়েছি ; রিযিকদাতা হিসাবে তাকে পাই নাই, বরং প্রকৃত রিযিকদাতা একমাত্র আল্লাহ্ পাকই ; এ কথার উপর আমি পূর্ণ ঈমান রাখি। তিনি যাচ্ছেন ; যান, কিন্তু আসল রিযিকদাতা তো রয়েছেন।

হযরত রাবেয়া বিন্তে ইসমাঈল (রহঃ) হযরত আহ্মদ ইব্নে আবী হওয়ারী (রহঃ)-এর নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছিলেন। তিনি ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকতেন। তাই অসম্মতি প্রকাশ করে জবাব দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, আমার কর্মমগ্নতার (ইবাদত-বন্দেগীর) কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা বাদ দিয়ে রেখেছি। হযরত রাবেয়া বল্লেন ঃ আমিও আপনার ন্যায় কাজে (ইবদাতে) মগ্ন থাকি ; তদুপরি আমার বিবাহের খাহেশও নাই, কিন্তু আমার পূর্ববর্তী স্বামী থেকে আমি যে প্রচুর সম্পদ পেয়েছি ; আমার ইচ্ছা হয় আপনি সেগুলো আপনার অন্যান্য বন্ধুজন ও তাপসগণের মধ্যে খরচ করুন। আর সে সঙ্গে আমিও তাঁদের পরিচিতি লাভে ধন্য হই। এ ভাবে খোদা-প্রাপ্তির একটি পথ আমার জন্যে হয়ে যায়। এ কথা শুনে তিনি বল্লেন ঃ তাহলে আমার শায়খ-গুরুজনের নিকট পরামর্শ করে নিই। তাঁর শায়খ হযরত আবূ সুলাইমান দার্‌রানী (রহঃ) এতকাল তাকে বৈবাহিক জীবন অবলম্বন করতে নিষেধ করতেন, আর বলতেন ঃ আমাদের লোকদের মধ্যে যারাই বিবাহ করেছে, তাদের অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেছে (অর্থাৎ পার্থিব ঝামেলায় পড়ে কিছু যিকির-আযকার ও ধ্যান-সাধনা ছেড়ে দিয়েছে)। হযরত সুলাইমান দার্‌রানী (রহঃ) উক্ত মহিলার উক্তি ও অবস্থা জেনে তাকে পরামর্শ দিলেন, তুমি তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে নাও ; তিনি আল্লাহ্‌র ওলী সিদ্দীকীনদের ন্যায় উক্তি করেছেন। আহ্মদ ইব্নে আবী হাওয়ারী (রহঃ) বলেন ঃ অতঃপর আমি তাঁকে বিবাহ করে নিলাম। কিন্তু ঘরে আমার

স্ত্রী নফল রোযা রাখবে না। যদি এরূপ করে তবে এটা অযথা পানাহার থেকে বিরত থেকে কষ্ট করা হবে ; কোনরূপ সওয়াব হবে না। স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘর থেকে বের হয়, তবে পুনরায় ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত অথবা তওবা না করা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا۔

"আমি যদি অন্য কাউকে সেজদা করতে আদেশ করতাম তাহলে নারীদেরই বলতাম তাদের স্বামীদের সেজদা করতে।" কারণ স্ত্রীদের উপর স্বামীদের হক গুরুতর।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ স্ত্রীলোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত নিকটতর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয় তখন, যখন তারা আপন গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। গৃহের আঙ্গিনায় আদায়কৃত তাদের নামায মসজিদে আদায়কৃত নামায হতে উত্তম। গৃহাভ্যন্তরে আদায়কৃত নামায গৃহের আঙ্গিনায় আদায়কৃত নামায হতে উত্তম। গৃহের অন্দর কুঠরীতে আদায়কৃত নামায (সাধারণ) গৃহাভ্যন্তরে আদায়কৃত নামায হতে উত্তম।" পর্দার হেফাযতের জন্যেই এ হুকুম হয়েছে। এ জন্যেই তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ "স্ত্রীলোক স্বয়ং পর্দা ; ঘর থেকে বের হলেই শয়তান উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "স্ত্রীলোকের পর্দা এগারটি ঃ বিবাহের পর স্বামী তার জন্যে একটি পর্দা ; মৃত্যুর পর কবর তার জন্যে দশটি পর্দা।"

মোটকথা, স্ত্রীর উপর স্বামীর অনেক হক রয়েছে ; তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হক হচ্ছে দুটি ঃ- এক. আপন সতীত্বরক্ষা ও পর্দা পালন। দুই. প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু স্বামীর কাছে দাবী না করা।

আদর্শ পূর্বসূরীগণের নীতি ছিল, তাদের কেউ যখন জীবিকার জন্য ঘর থেকে বের হতেন, তখন তাদের স্ত্রী-কন্যাগণ বলতেন ঃ অবৈধ উপার্জন

থেকে বেঁচে চলবেন ; আমরা "ক্ষুধার যন্ত্রণা ও অন্যান্য কষ্ট সহ্য করে নিবো। তবুও দোযখের আগুন সহ্য করতে পারবো না।"

তাঁদেরই মধ্যকার একজনের ঘটনা— একদা সফরের এরাদা করলেন। পাড়া-প্রতিবেশী কেউ তার এ সফর কামনা করছিল না ; তারা সে লোকের স্ত্রীকে বললো ঃ আপনি তার এ সফরে সম্মতি দিচ্ছেন কেন, অথচ তিনি তার অনুপস্থিতিকালীন খরচাদি আপনাদেরকে দিয়ে যাচ্ছেন না? স্ত্রী জবাব দিলেন ঃ আমি তার সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকে তাকে শুধু একজন ভোজন-বিলাসীই পেয়েছি ; রিযিকদাতা হিসাবে তাকে পাই নাই, বরং প্রকৃত রিযিকদাতা একমাত্র আল্লাহ্ পাকই ; এ কথার উপর আমি পূর্ণ ঈমান রাখি। তিনি যাচ্ছেন ; যান, কিন্তু আসল রিযিকদাতা তো রয়েছেন।

হযরত রাবেয়া বিন্তে ইসমাঈল (রহঃ) হযরত আহ্মদ ইব্নে আবী হওয়ারী (রহঃ)-এর নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছিলেন। তিনি ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকতেন। তাই অসম্মতি প্রকাশ করে জবাব দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, আমার কর্মমগ্নতার (ইবাদত-বন্দেগীর) কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা বাদ দিয়ে রেখেছি। হযরত রাবেয়া বল্লেন ঃ আমিও আপনার ন্যায় কাজে (ইবদাতে) মগ্ন থাকি ; তদুপরি আমার বিবাহের খাহেশও নাই, কিন্তু আমার পূর্ববর্তী স্বামী থেকে আমি যে প্রচুর সম্পদ পেয়েছি ; আমার ইচ্ছা হয় আপনি সেগুলো আপনার অন্যান্য বন্ধুজন ও তাপসগণের মধ্যে খরচ করুন। আর সে সঙ্গে আমিও তাঁদের পরিচিতি লাভে ধন্য হই। এ ভাবে খোদা-প্রাপ্তির একটি পথ আমার জন্যে হয়ে যায়। এ কথা শুনে তিনি বল্লেন ঃ তাহলে আমার শায়খ-গুরুজনের নিকট পরামর্শ করে নিই। তাঁর শায়খ হযরত আবূ সুলাইমান দার্‌রানী (রহঃ) এতকাল তাকে বৈবাহিক জীবন অবলম্বন করতে নিষেধ করতেন, আর বলতেন ঃ আমাদের লোকদের মধ্যে যারাই বিবাহ করেছে, তাদের অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেছে (অর্থাৎ পার্থিব ঝামেলায় পড়ে কিছু যিকির-আযকার ও ধ্যান-সাধনা ছেড়ে দিয়েছে)। হযরত সুলাইমান দার্‌রানী (রহঃ) উক্ত মহিলার উক্তি ও অবস্থা জেনে তাকে পরামর্শ দিলেন, তুমি তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে নাও ; তিনি আল্লাহ্‌র ওলী সিদ্দীকীনদের ন্যায় উক্তি করেছেন। আহ্মদ ইব্নে আবী হাওয়ারী (রহঃ) বলেন ঃ অতঃপর আমি তাঁকে বিবাহ করে নিলাম। কিন্তু ঘরে আমার

বসবাস এমন ছিল যে, গোসল করা তো দূরের কথা, খাওয়া-দাওয়ার পর হাত ধোয়ার ফুরসৎ পায় না এমন ব্যক্তির ন্যায় শীঘ্র বের হয়ে আসতাম। পরবর্তীতে আমি আরও বিবাহ করেছি। কিন্তু এই প্রথমা স্ত্রী আমাকে উন্নত খাওয়া-দাওয়া করাতো সব সময় উৎফুল্ল রাখতো আর বলতো—যান, সদা আনন্দিত থাকুন এবং অন্যান্য স্ত্রীদের জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন। শ্যাম দেশের এ হযরত রাবেয়া (রহঃ)-এর সেই মর্তবা ছিল, যে মর্তবা ছিল বসরা নিবাসী হযরত রাবেয়া বস্‌রিয়া (রহঃ)-এর।

স্ত্রীলোকের পক্ষে এটা অপরিহার্য কর্তব্য যে, স্বামীর সম্মতি না জেনে তার সম্পদে কিছুমাত্র এদিক-সেদিক করবে না। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হচ্ছে, স্ত্রীলোক স্বামীর বিনা অনুমতিতে অন্য কাউকে কিছু খাওয়াবে না। হ্যাঁ, কোন খাদ্যবস্তু বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিলে তা ভিন্ন কথা। স্বামীর অনুমতি নিয়ে কোন অভাবীকে অন্ন দান করলে, স্বামীর সমপরিমাণ সওয়াব সে পাবে। পক্ষান্তরে, বিনা অনুমতিতে এরূপ করলে সে গুনাহগার হবে আর স্বামীর আমলনামায় সওয়াব লিপিবদ্ধ হবে।

কন্যার প্রতি মাতা-পিতার কর্তব্য হচ্ছে, মাতা-পিতা তাদের প্রতিটি কন্যা-সন্তানকে পূর্বাহ্নেই শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে। উন্নত আচার-ব্যবহার ও সুন্দর আচরণনীতি, স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করার প্রয়োজনীয় ও সুন্দর তরতীব ও নিয়ম-পদ্ধতি শিখাবে।

বর্ণিত আছে, হযরত উসামাহ্ বিন্‌তে খারেজাহ্ ফাযারী (রাযিঃ) তার কন্যাকে স্বামীর সোপর্দ করার সময় উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ এতদিন তুমি পাখীর বাসার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র পরিসরে অবস্থান করছিলে। এখন তুমি একটি অপরিচিত প্রশস্ত পরিবেশে যাচ্ছ—তোমাকে এমন এক শয্যা গ্রহণ করে নিতে হবে যেটি সম্পর্কে তোমার কোনই পরিচিতি নাই। এমন সাথীকে আপন করে নিতে হবে, যার সাথে পূর্ব থেকে কোনই সম্পর্ক নাই ; সম্পূর্ণ নূতন সম্পূর্ণ অপরিচিত। কাজেই তুমি তার জন্যে যমীনস্বরূপ হয়ে যাও, সে তোমার জন্য আসমানস্বরূপ হবে। তুমি তার জন্য বিছানাস্বরূপ হয়ে যাও, সে তোমার জন্য সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ হবে। তুমি তার বাঁদী হয়ে যাও, সে তোমার গোলাম হয়ে যাবে। কোন কাজে বা কথায় খোঁচা দিওনা বা

অতিরঞ্জন করো না, সে তোমাকে সরিয়ে দিবে। তুমি তাকে দূরে রেখো না, সে তোমাকে দূর করে দিবে। সে তোমার নিকটবর্তী হলে, তুমি তার আরও নিকটবর্তী হও। আর সে যদি তোমাকে পরিহার করে চলে, তবে তুমি তার থেকে সরে পড়। সর্বদা লক্ষ্য রাখবে— তোমা থেকে সে যেন সব সময় ভাল শুনে, ভাল দেখে, ভাল আঁচ করে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, হযরত মায়মূনাহ্ (রাযিঃ) হুযূরের অনুমতি না নিয়ে নিজের বাঁদীকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। নির্ধারিত দিনে তার নিকট উপস্থিত হয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি জানতে পেরে বলেছিলেন ঃ "তোমার ভাই-বোনদেরকে যদি বাঁদীটি দান করে দিতে তবে তুমি অধিক সওয়াবের ভাগী হতে।"

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি তার স্ত্রীকে উপদেশ দিয়েছেন ঃ "মার্জনার দৃষ্টি রাখ, তাহলে ভালবাসা স্থায়ী হবে। আমার অসন্তোষের মুহূর্তে নিশ্চুপ থেকো, তাহলে কল্যাণ হবে, ঢোলের ন্যায় আমাকে আঘাত করো না, কারণ, জানা নাই অদৃশ্যের অন্তরালে কি লুকিয়ে রয়েছে। অধিক মাত্রায় অভিযোগ করো না, এতে ভালবাসা হ্রাস পায় ; অন্তর তোমায় অস্বীকার করতে পারে ; অন্তরের উপর আমারও হাত নাই। অন্তঃকরণে আমি যেমন ভালবাসা লক্ষ্য করেছি, তেমনি তাতে শত্রুতাও অবস্থান করে, তবে ভালবাসা শত্রুতাকে দূর করতে সক্ষম।"

অধ্যায় ঃ ৯৬

জিহাদের গুরুত্ব ও ফযীলত

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

"পূর্ণ মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে অতঃপর তাতে সন্দেহ করে নাই, অধিকন্তু স্বীয় ধন–সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে ; তারাই সত্যবাদী। (হুজুরাত ঃ ১৫)

হযরত নু'মান ইব্নে বশীর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরের নিকট বসা ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি উক্তি করলো—ইসলাম গ্রহণ করার পর হাজীদের খেদমত, তাদের পানি পান করানো, মসজিদুল–হারাম আবাদ করা ছাড়া অন্য কোন আমলের আমি প্রয়োজন মনে করি না এবং পরোয়াও করি না। অপর একজন বললো ; তুমি যে কাজগুলোর কথা বলেছো, সেগুলোর তুলনায় জিহাদ শ্রেষ্ঠ। হযরত উমর (রাযিঃ) তাদেরকে ধমকের স্বরে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরের কাছে বসে তোমরা এতো উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ করছো?— এটা ঠিক নয়। বরং তোমরা এরূপ করতে পার যে, আজকে জুমার দিন ; নামায শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তোমাদের বিতর্কিত বিষয়টির সমাধান করে নাও। এর পরই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কুরআনের এ আয়াতগুলো নাযিল হয় ঃ

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

"তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানোকে এবং মসজিদে হারামের আবাদ রাখাকে সেই ব্যক্তির আমলের সমান সাব্যস্ত করে রেখেছ? যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও কিয়ামত-দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, আর সে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করেছে ; তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সমান নয় ; আর যারা অবিচারক আল্লাহ্ তাদেরকে সুবুদ্ধি দান করেন না।" (তওবাহ্ ঃ ১৯)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে সালাম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরও সাহাবায়ে কেরামসহ বসা ছিলাম ; আমাদের উদ্দেশ্য ছিল—সমস্ত নেক আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোন্টি তা জানা, অতঃপর সে অনুযায়ী আমল করা। তখনই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۝

"সমস্ত বস্তু আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে, যা আসমানসমূহে আছে আর যা যমীনে আছে, আর তিনিই প্রবল প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়। হে মু'মিনগণ ! তোমরা এরূপ কথা কেন বলছো, যা কর না? আল্লাহ্র নিকট এটা অত্যন্ত অসন্তুষ্টির কারণ যে, এরূপ কথা বল যা কর না। আল্লাহ্ তো ঐ সমস্ত লোককে ভালবাসেন, যারা তার পথে এরূপ মিলিত হয়ে যুদ্ধ করে, যেন তারা একটি অট্টালিকা। (ছফ ঃ ১৪)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আয়াতখানি তিলাওয়াত করে শুনালেন।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করেছে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন কোন আমল বাত্লিয়ে দিন, যা করলে আমি জিহাদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করি। হুযূর বললেন ঃ এমন কোন আমল আমি দেখি না। অতঃপর (তাকে জিহাদের অধিকতর গুরুত্ব বুঝানোর জন্য) বল্লেন ঃ তুমি কি এরূপ করতে পারবে যে, মুজাহিদ ব্যক্তি যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন থেকে তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে এবং কোন রকম ত্রুটি না করে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকবে, কোন রকম ত্রুটি না করে রোযাদার অবস্থায় থাকবে? সে বললোঃ হুযূর! এটা তো বড় কঠিন বরং অসম্ভব ব্যাপার; কে এমন পারবে!

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সাহাবীগণের মধ্য হতে এক ব্যক্তি এক গোত্রের পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার সময় স্বচ্ছ পানির একটি সুন্দর ঝর্ণা দেখে বলেছেন ঃ আমি যদি জন–মানবের কোলাহল থেকে পৃথক জীবন যাপন করতাম, তাহলে এখানে এই ক্ষুদ্র গোত্রটির কাছেই আবাস করে নিতাম ; তৎক্ষণাৎ আবার বল্লেন, না ; এ বিষয়ে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নেই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বল্লেন ঃ এরূপ কখনও করো না, কারণ ঃ

فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ اُغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ـ

"আল্লাহ্র পথে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জিহাদে মগ্ন রয়েছে, বাড়ীতে অবস্থান করে সত্তর বছর ইবাদত করলে যে সওয়াব লাভ হবে, সে ব্যক্তি

তার চেয়ে বেশী সওয়াবের ভাগী হবে। তোমরা চাও না যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন? যদি চাওতাহলে তোমরা আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর। যে ব্যক্তি একবার উষ্ট্রীর দুধ দোহন পরিমাণ সময় জিহাদ করবে,তার জন্য জান্নাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে যাবে।"

প্রণিধানযোগ্য যে, এতো উচ্চ মর্যাদাশীল সাহাবীকেও প্রচুর ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকার জন্যে যে ক্ষেত্রে লোকারণ্যের বাইরে অবস্থানের অনুমতি দেন নাই ; বরং তাকে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে জিহাদ পরিত্যাগ করে চলা আমাদের জন্য কি করে জায়েয হবে? অথচ আমাদের ইবাদত-বন্দেগীর পরিমাণও খুব কম, হালাল রিযিকের ব্যাপারেও আমরা উদাসীন, তদুপরি নিয়ত ও উদ্দেশ্যও আমাদের খারাব।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ مَثَلَ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُّجَاهِدُ
فِىْ سَبِيْلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْخَاشِعِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ -

"খাঁটী নিয়তে আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী ব্যক্তির মর্যাদা—খাঁটী নিয়ত সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকেই জানেন—রোযাদার এবং খুশু-খুযূ সহকারে রুকু, সিজদা ও কিয়ামকারী নামাযী ব্যক্তির ন্যায়।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে রব্ব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসাবে মেনে নিয়েছে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।" এ হাদীসখানি শুনে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর নিকট খুবই ভাল লেগেছে। তিনি আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হাদীসখানি পুনরায় ইরশাদ করুন। তিনি পুনরায় শুনালেন এবং বললেন ঃ আরেকটি বিষয় এমন রয়েছে যেটির উপর আমল করলে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার একশতটি দর্জা (পদ-মর্যাদা) বুলন্দ করেন, যার প্রতি দুই দর্জার মাঝখানে যমীন থেকে আসমানের দূরত্ব-বরাবর ব্যবধান থাকে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে বিষয়টি কি? তিনি বল্লেন ঃ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্।"

অধ্যায় ঃ ৯৭

শয়তানের ধোকা ও প্রতারণা

এক ব্যক্তি হযরত হাসান (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ হে আবূ সাঈদ (তাঁর উপনাম)! শয়তান কি ঘুমায়? তিনি মৃদু হেসে বল্‌লেন ঃ আরে, শয়তান যদি ঘুমাতো, তাহলে আমাদের আরাম হয়ে যেতো ; বস্তুতঃ শয়তান তার কাজে এমনই তৎপর যে, কোন মুমিন তার থেকে নিস্তার পায় না। তবে তাকে দূর্বল করা বা দমন করার জন্য উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُنْضِيْ شَيْطَانَهُ كَمَا يُنْضِيْ اَحَدُكُمْ بَعِيْرَهُ فِيْ سَفَرِهٖ -

"প্রকৃত মুমিন সে, যে তার শয়তানকে এমন দুর্বল করে দেয়, যেমন তোমরা সফরে উটকে দূর্বল করে দাও।"

হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন ঃ "সত্যিকার মু'মিনের শয়তান দূর্বল থাকে। "

হযরত কায়স্‌ ইব্‌নে হাজ্জাজ (রহঃ) বলেন ঃ "আমার শয়তানটি নিজেই আমাকে জানিয়েছে যে, সে যখন আমার ভিতরে প্রবেশ করেছিল, তখন উটের ন্যায় তাজা ও মোটা ছিল ; কিন্তু এখন সে চড়ুই পাখীর মত ছোট্ট ও দূর্বল হয়ে গেছে।" আমি তাকে এরূপ হয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলেছে ঃ "তুমি আল্লাহ্‌র যিকিরের দ্বারা আমাকে গলিয়ে ফেলেছ।"

সুতরাং যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয়-ভীতি আছে, এমন পরহেজগার লোকদের পক্ষে শয়তানকে পরাভূত করা কঠিন কিছু নয়। তারা সাধনাব্রতী

হলে শয়তানের চোর–দরজাগুলো বন্ধ করে সহজেই আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ বড় বড় এবং প্রকাশ্য গুনাহের প্রতি ধাবিত হওয়ার শয়তানী পথগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু শয়তান কূট–কৌশল অবলম্বন করে অতি সূক্ষ্ম পথে তাদের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখে, যেগুলো বুঝে উঠা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে, আত্মরক্ষা করতে পারে না। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, অন্তরের দিকে শয়তানের জন্য অনেকগুলো প্রবেশপথ রয়েছে, কিন্তু ফেরেশতাগণের জন্য প্রবেশপথ মাত্র একটি। এই একটি পথ অনেকগুলোর মধ্যে সংমিশ্রিত হয়ে রয়েছে। অতএব, এ ক্ষেত্রে বান্দার অবস্থা ঘন অন্ধকার রাতের সেই মুসাফিরের ন্যায়, যে এমন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলছে যেটিতে প্রচুর পেঁচানো পথ রয়েছে ; যেগুলোর সঠিক দিক নির্ণয় করা সূক্ষ্ম–পরিপক্ক দৃষ্টি এবং দীপ্তিময় সূর্যের আলো ছাড়া সম্ভব নয়। এখানে সূক্ষ্ম–পরিপক্ক দৃষ্টি হচ্ছে তাক্ওয়া ও খোদাভীতিময় স্বচ্ছ অন্তঃকরণ আর সূর্যের আলো হচ্ছে কুরআন ও হাদীস–আহরিত সত্যিকার জ্ঞান বা ইলম। এরই মাধ্যমে এ কঠিন ও বন্ধুর পথের পথিক তার সমূহ জটিলতা নিরসনে সক্ষম হতে পারে। নতুবা এ সমস্যার কোন অন্ত নাই।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন ঃ একদা হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রেখা টেনে বল্লেন ঃ "এটা আল্লাহ্র পথ।" অতঃপর সেই রেখাটির ডানে, বামে আরও কতকগুলো রেখা টানলেন। এবার বল্লেন ঃ এগুলোও পথ ; কিন্তু এর প্রত্যেকটির উপর শয়তান বসে আছে এবং লোকজনকে সে (ধ্বংস ও বিভ্রান্তির) সে পথগুলোর দিকে আহ্বান করছে। এরপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতখানি তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ

"অবশ্যই এটি আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সে সব পথ তোমাদেরকে তাঁর (আল্লাহ্র) পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।" (আন্আম ঃ ১৫৩)

শয়তানের সূক্ষ্ম ও গোপন পথসমূহকে অনুধাবন করার জন্য আমরা এ ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ পেশ করছি। কিভাবে শয়তান বিজ্ঞ আলেম, ইবাদত গুজার ওলী, প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রক ও পাপাচার থেকে বিরত লোকদেরকে পর্যন্ত কাত করে ফেলে, উদাহরণটি দ্বারা এ বিষয়টি প্রতিভাত হবে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, বনী ইস্রাঈল গোত্রে এক পাদ্রী ছিল। একদা ইব্লীস শয়তান তাকে প্রতারিত করার জন্য ফন্দি আঁটলো। এক বাড়ীতে এসে একটি যুবতী মেয়ের গলা টিপে ধরে। তাতে সে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর শয়তান বাড়ীর লোকদের মনে ধারণা জন্মিয়ে দিলো যে, পাদ্রীর নিকট এই রোগীনির অব্যর্থ চিকিৎসা-তদবীর রয়েছে। সুতরাং তারা মেয়েটিকে নিয়ে পাদ্রীর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, তাকে আপনার নিকট রাখুন। পাদ্রী নিজের হেফাজতে তাকে রাখতে অস্বীকার করলো। কিন্তু অভিভাবকদের বার বার অনুরোধে অবশেষে রাজী হয়ে গেল এবং মেয়েটিকে নিজ হেফাজতে রেখে চিকিৎসা করতে লাগলো। কিছুদিন পর শয়তান পাদ্রীর মনে কুমন্ত্রনা দিতে লাগলো। ফলে, পাদ্রী মেয়েটির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে গেল। এভাবে একদিন সে পাদ্রী কর্তৃক গর্ভধারণ করলো। অতঃপর শয়তান পাদ্রীর মনে এই মর্মে ওয়াস্ওয়াসাহ সৃষ্টি করলো যে, তার অভিভাবকদের নিকট তুমি কি জবাব দিবে ; তারা এসে যখন দেখবে তাদের মেয়ে গর্ভধারণ করেছে, তখন তারা তোমাকেই দায়ী করবে, এভাবে তুমি তোমার মান-সম্মান সবই হারাবে। সুতরাং শয়তান তাকে উপায় শিখিয়ে দিল যে, এখন তুমি মেয়েটিকে হত্যা করে মাটির নীচে পুঁতে ফেল, এভাবে তোমার সব সমস্যা চুকে যাবে ; অভিভাবকরা এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলবে—সে মারা গেছে। পাদ্রী তাই করলো। এদিকে শয়তান অভিভাবকদের নিকট এসে তাদের মনেও এ বিষয়ে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করলো। তারা এসে পাদ্রীর নিকট মেয়েটির খোঁজ নিল। পাদ্রী বল্লো, সে মারা গেছে। এ কথা শুনে তারা মোটেই বিশ্বাস করলো না ; পাদ্রীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাকে হত্যা করার জন্য শুলিতে নিয়ে গেল। এ সময় শয়তান তার নিকট হাজির হয়ে বললো ঃ তুমি আমাকে চিন? আমি নিজেই মেয়েটির গলা টিপে ধরেছিলাম, তার অভিভাবকদের পরামর্শ দিয়েছিলাম এবং তোমার অন্তরে ওয়াস্ওয়াসাহ্ ঢেলেছিলাম। এখন যদি তুমি এহেন বিপদ থেকে

রক্ষা পেতে চাও, তবে আমার কথা শুনো। পাদ্রী বল্‌লো ঃ তোমার কথা কি? শয়তার বললো ঃ খুবই সহজ ; তুমি শুধু আমাকে দুটি সিজদা কর। পাদ্রী কোন উপায়ান্তর না দেখে শয়তানকে সিজদা করে কাফের হয়ে গেল। অতঃপর শয়তান পাদ্রীকে উপহাস করতে করতে পলায়ন করলো। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ই ইরশাদ করেছেন ঃ

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ ج فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ

"এরা শয়তানের ন্যায়, যে শয়তান মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়ে সারে তখন শয়তান বলে ঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই।" (হাশর ঃ ১৬)

বর্ণিত আছে, একদা অভিশপ্ত ইব্‌লীস হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)কে প্রশ্ন করেছিল—এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি যে, সৃষ্টিকর্তা আমাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি করেছেন এবং যে কাজে ইচ্ছা সে কাজে আমাকে ব্যবহার করছেন, অতঃপর তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে বেহেশ্‌ত দিবেন, নতুবা দোযখে নিক্ষেপ করবেন ; সবই দেখি তারই ইচ্ছা—এটা কি কোন ইনসাফ বা ন্যায়ানুগ কাজ হলো, না তিনি জুলুম করলেন ; ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) একটু চিন্তা করে বল্‌লেন ঃ "সৃষ্টিকর্তা যদি তোকে তোর ইচ্ছা অনুযায়ী সৃষ্টি করে থাকেন, তবে তো এটা অবশ্যই জুলুম হবে, আর যদি তিনি তাঁর নিজস্ব মর্জী অনুযায়ী সৃষ্টি করে থাকেন, তবে স্মরণ রাখ যে, মহান সৃষ্টিকর্তা স্বীয় ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ে সকল প্রকার প্রশ্ন ও জবাবদিহি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।" এ কথা শুনে শয়তান বিফল-বিমুখ হয়ে পলায়ন করলো এবং বলতে থাকলো— "হে শাফেয়ী! এই একটি মাত্র প্রশ্নের দ্বারা আমি সত্তর হাজার আবেদ ও খোদাভীরু লোককে গোম্‌রাহ্ করেছি এবং উবূদিয়তের খাতা হতে তাদের নাম কাটিয়ে দিয়েছি।"

বর্ণিত আছে, একদা অভিশপ্ত ইব্‌লীস হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো ঃ হে নবী! আপনি বলুন ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। হযরত ঈসা (আঃ) জবাব দিলেন ঃ এটা সত্য কলেমা ; কিন্তু তোর হুকুমে

আমি তা পড়বো না। এর কারণ হচ্ছে যে, ইব্‌লীস শয়তান অনেক সময় ইবাদত ও নেক কাজের মাধ্যমেও ধোকায় ফেলে। আর এরই মাধ্যমে সে অদ্যাবধি বহু আবেদ, যাহেদ, বিত্তশালী এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদেরকে ধোকায় ফেলে ধ্বংস করেছে। আল্লাহ্! পাক যাকে হেফাজত করেন সেই মাহ্‌ফূজ থাকতে পারে। আয় আল্লাহ্ আমাদেরকে শয়তানের ধোকা–প্রতারণা হতে হিফাজত করুন ; আপনার সাথে মোলাকাতের তওফীক নসীব করুন এবং হেদায়াতের উপর কায়েম–দায়েম রাখুন।

অধ্যায় ঃ ৯৮

সামা’

['সামা' আরবী শব্দ ; অর্থ ঃ শ্রবণ করা। অভিধানে সঙ্গীত অর্থেও উল্লেখিত হয়েছে। এ থেকেই এক শ্রেণীর মূর্খ ও ভণ্ড লোক গীত-বাদ্য ও নর্তন-কুর্দন জায়েয বলে প্রচারের সুযোগ নিয়েছে। অথচ, অধুনা প্রচলিত কাওয়ালী, মুর্শিদী গান বা অশ্লীল নৃত্য-গীত, ক্রীড়া-কৌতুক ও বাদ্যানুষ্ঠানের সাথে সামা'র কোনই সম্পর্ক নাই ; এগুলো সম্পূর্ণ হারাম।]

কাজী আবূ তাইয়্যিব তব্‌রী (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আবূ হানীফা, হযরত সুফিয়ান সওরী রাহেমাহুমুল্লাহ ও অন্যান্য ফকীহ্‌গণের এক জামাত থেকে যেসব উক্তি নকল করেছেন, সেগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা (প্রচলিত) সামা'কে হারাম সাব্যস্ত করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তদীয় 'আদাবুল-কাজী' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "নিঃসন্দেহে গান-বাজনা বাতিলের অন্তর্ভুক্ত, বেহুদা এবং অবশ্য হারাম কাজ ; নির্বোধ ছাড়া এহেন গর্হিত বিষয় কেউ শুনতে পারে না ; এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।"

কাজী আবূ তাহয়্যিব (রহঃ) বলেন ঃ "গায়ের মাহ্‌রাম (যার সাথে পর্দা করতে হয়) স্ত্রীলোকের সামা' শ্রবণ করা ইমাম-শাফেয়ী ও তাঁর বিজ্ঞ ফকীহ্ শাগরেদগণের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম—চাই স্ত্রীলোক সামনে উপস্থিত হোক বা পর্দার অন্তরালে হোক কিংবা আযাদ হোক অথবা বাঁদী হোক; সর্বাবস্থায়ই হারাম। তিনি বলেন ঃ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর উক্তি, হচ্ছে—কোন বাঁদীর কাছ থেকে সামা'র জন্য যদি লোকজন একত্রিত হয়, তবে সেই বাঁদীর মালিক এমন নির্বোধ বলে সাব্যস্ত হবে যে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সাধারণ একটি দণ্ড হাতে নিয়ে ডুগ্‌ডুগি বাজানোও জায়েয নয় ; কারণ, এগুলো দ্বীন-বিদ্বেষী লোকদের উদ্দেশ্যমূলক আবিষ্কার ; তারা চায়—এগুলোর মধ্যে

মত্ত হয়ে মানুষ কুরআন তিলাওয়াত ও আসল উদ্দেশ্যের বিষয়ে গাফেল হয়ে যাক।"

হযরত ইমাম শাফেয়ী আরও বলেন ঃ হাদীসের দৃষ্টিতে নারদ বা তাস-পাশা খেলা অন্যান্য খেলার তুলনায় অধিকতর জঘন্য কাজ ; এবং আমি শত্‌রঞ্জ-দাবা খেলাকেও ঘৃণা করি ; সর্ববিধ ক্রীড়া-কৌতুককেই আমি অপছন্দ করি। কেননা, এহেন মত্ততা কোন দ্বীনদার লোকের চরিত্র হতে পারে না ; এমনকি কোন ভদ্র লোক এগুলো খেলতে পারে না।"

ইমাম মালেক (রহঃ) গান বা সঙ্গীত থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ কেউ একটি বাঁদী খরিদ করার পর যদি জানতে পারে যে, এটি গায়িকা, তবে (এটা এমন একটা দোষ যে এজন্যে) সে বাদীটিকে বিক্রেতার নিকট ফেরৎ দিতে পারবে (এবং বিক্রেতা তা ফেরৎ নিতে বাধ্য থাকবে)। মদীনা মোনাওয়ারার সকল ফকীহ্‌গণেরও একই অভিমত।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট গান গুনাহের কাজ। 'কূফা'বাসী সমস্ত ফকীহ্ ও ইমামগণের একই অভিমত—হযরত ইব্‌রাহীম নখ্‌যী হযরত শায়বী (রহঃ) প্রমুখের এই মন্তব্য ও অভিমত কাজী আবূ তাইয়্যিব তব্‌রী (রহঃ) নকল করেছেন।

অধ্যায় ঃ ৯৯

বিদআত ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে বিরত থাকা

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ -

"দ্বীন সম্পর্কে মনগড়াভাবে নতুন সৃষ্টি করা বিষয়সমূহ হতে তোমরা বেঁচে চল। কেননা, এরূপ প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদআত, আর প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِ دِيْنِنَا هٰذَا مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ -

"যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীন সম্পর্কে কোন নতুন কথা সৃষ্টি করেছে (যা এতে নাই), সে কথা রদ্দ্ বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।"

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِىْ

"তোমরা আমার সুন্নত এবং আমার পর সৎপথ-প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে আঁকড়িয়ে ধর।"

উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা জানা গেল যে, যে কোন বিষয় কুরআন, সুন্নাহ্ এবং আয়েম্মায়ে কেরামের ইজ্‌মা'র খেলাফ হবে, সেটাই বিদআত ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি কোন নেক কাজের বুনিয়াদ রাখলো, সে জন্যে তার সওয়াব রয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা সে অনুযায়ী আমল করবে, তাদের সওয়াবও সে পাবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি কোন অসৎ কাজের বুনিয়াদ রাখলো, সে জন্যে তার পাপ রয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা সে অনুযায়ী চলবে, তাদের পাপও সে পাবে।"

হযরত ক্বাতাদাহ্ (রাযিঃ) পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ج

"নিঃসন্দেহে আমার এ সোজা পথ ; তোমরা এর অনুসরণ কর।" (আন্‌আম ঃ ১৫৩)

তিনি বলেছেন ঃ "সঠিক পথ একটিই ; আর এটিই একমাত্র হেদায়াতের পথ—এ পথেরই পরিণামফল জান্নাত।"

হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেছেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বুঝানোর জন্যে আপন মোবারক হস্তে একটি রেখা টেনে বলেছেন ঃ এটি আল্লাহ্ তা'আলার সরল পথ। অতঃপর এর ডানে-বামে রেখা টেনে বলেছেন ঃ এগুলোও পথ ; কিন্তু তা শয়তানের পথ এবং প্রত্যেকটি পথে শয়তান বসে মানুষকে বিপথে ডাকছে। অতঃপর (উপরোক্ত) আয়াতখানি তিলাওয়াত করেছেন। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) উক্তি করেছেন ঃ "এগুলো হচ্ছে গুম্‌রাহীর পথ।"

হযরত ইব্‌নে আতিয়্যাহ্ (রহঃ) বলেন ঃ "ভুল ও ভ্রান্ত পথ যেগুলো হাদীসে দেখানো হয়েছে, সেগুলো দ্বারা ইহূদীবাদ, খৃষ্টবাদ, ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্মবাদ এবং বিদআতী ও গুম্‌রাহ্ লোকদের পথকে উদ্দেশ্য করা

হয়েছে, যে সব বিদআতী ও গুম্‌রাহ্ লোকেরা নিজেদের চিন্তা-কল্পনা ও বে-লাগাম ইচ্ছানুযায়ী দ্বীনের শাখা-প্রশাখাগত বিষয়াবলীর পরিবর্তন করে এবং শরয়ী বিষয়ে অযথা তর্ক-বিতর্ক ও ভ্রান্ত গবেষণা ও আহরণে লিপ্ত হয়।"

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ ـ

"আমার সুন্নতের বিষয়ে যে ব্যক্তি অনাগ্রহী হয়েছে, সে আমার দলভুক্ত নয়।"

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَا مِنْ اُمَّةٍ اِبْتَدَعَتْ بَعْدَ نَبِيِّهَا فِيْ دِيْنِهَا بِدْعَةً اِلَّا اَضَاعَتْ مِثْلَهَا مِنَ السُّنَّةِ ـ

"যে কোন উম্মত তাদের নবী কর্তৃক আনীত দ্বীনের মধ্যে মনগড়াভাবে নতুন কোন (বিদআত) বিষয় সৃষ্টি করেছে, ঠিক সেই অনুপাতে তারা অপর একটি সুন্নত ধ্বংস করেছে।"

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَا تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ مِنْ اِلٰهٍ يُعْبَدُ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ هَوًى يُتَّبَعُ

"আকাশের নীচে বাতিল পূজনীয় বস্তুসমূহের মধ্যে প্রবৃত্তি অপেক্ষা বড় আর কোনটি নাই।"

অর্থাৎ দ্বীনের মোকাবিলায় প্রবৃত্তির অনুসরণ জঘন্যতম অপরাধ।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "অতঃপর নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী এবং সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে মুহাম্মদের পন্থা। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে যা দ্বীন সম্পর্কে মনগড়াভাবে নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এরূপ প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই (বিদআত গুম্‌রাহী।"

এ হাদীসেরই শেষাংশটি হচ্ছে ঃ

اِنَّمَا اَخْشٰى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَىِّ فِىْ بُطُوْنِكُمْ وَفُرُوْجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْهَوٰى۔

"তোমাদের ব্যাপারে আমার ঐসব কাম-প্রবৃত্তিগত বিষয়ে ভয় হয়, যেগুলো তোমাদের পেট, লজ্জাস্থান ও মনের বে-লাগাম তাড়নার সাথে সম্পর্কিত।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتّٰى يَدَعَ بِدْعَتَهٗ۔

"বিদআতী ব্যক্তি যে পর্যন্ত বিদ্‌আত-কার্য ত্যাগ না করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তওবার তওফীক দেন না।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বিদআতী ব্যক্তির রোযা, হজ্জ, উমরাহ্, জিহাদ, কোন ফরজ ইবাদত কিংবা কোন নফল ইবাদত কবূল করেন না। ইসলাম থেকে সে এমনভাবে বের হয়ে যায় যেমন গোলা আটা থেকে চুল বের হয়ে আসে।

لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلٰى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيْغُ عَنْهَا اِلَّا هَالِكٌ لِكُلِّ عَمْرَةٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهٗ اِلٰى سُنَّتِىْ فَقَدِ اهْتَدٰى وَ مَنْ كَانَتْ شِرَّتُهٗ اِلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ فَقَدْ هَلَكَ

"আমি তোমাদেরকে (দ্বীনের বিষয়ে) একটি শ্বেত-শুভ্র আলোকিত পথের উপর রেখে যাচ্ছি ; যার রাতও দিবাভাগের ন্যায় উজ্জ্বল। নিজেই ধ্বংস হতে চায় এমন লোক ছাড়া এতে কেউ পদস্খলিত হবে না। প্রতিটি মানুষের জীবনে কর্মক্ষমতা রয়েছে, আর এ কর্মক্ষমতা কাজে লাগানোর সুযোগ ও অবকাশও দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি এ সুযোগ ও অবকাশ আমার সুন্নত ও আদর্শের অনুসরণে লাগাবে, সেই সঠিক ও সুপথ-প্রাপ্ত হবে, আর যে অন্য কিছুতে লাগাবে, সে বিচ্যুত ও ধ্বংস-প্রাপ্ত হবে।"

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ "আমার উম্মতের জন্য তিনটি বিষয়কে আমি বড় ভয় করি এক, আলেমের পদস্খলন, দুই অনুসৃত প্রবৃত্তি, তিন জালেমের শাসন।"

খেলা ও খেলার সরঞ্জাম

সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ বন্ধুকে বল্লো ঃ আস, জুয়া খেলি (সে পাপ করলো অতএব ক্ষমার জন্য) সে যেন সদকা করে।

মুসলিম শরীফ, আবূ দাঊদ ও ইব্নে মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি নারদ (তাস-পাশা) খেলে, সে যেন আপন হাত শুকরের মাংস ও রক্ত দ্বারা রঞ্জিত করলো।

মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নারদ (তাস) খেলে, আবার উঠেই নামাযে দাঁড়ায়, তার উদাহরণ হচ্ছে, এমন ব্যক্তির ন্যায় যে পূঁজ এবং শুকরের রক্ত দ্বারা উযূ করে নামায আদায় করলো।" অর্থাৎ তার নামায কবূল হবে না, যা অন্য রেওয়ায়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) হযরত ইয়াহ্য়া ইব্নে কাসীর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন ; তারা তাস-পাশা খেলছিল। তখন তিনি বলেছেন ঃ "এদের অন্তঃকরণ উদাসীন, হাতগুলো অহেতুক ফুযুল কাজে

লাগানো হচ্ছে আর জিহ্বাগুলো বেহুদা কথাবার্তা বলছে।"

দীলামী (রহঃ) রেওয়ায়াত করেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যখন তোমরা হার-জিতের তীর খেলা, দাবা, পাশা বা অনুরূপ (অবৈধ) কোন খেলায় রত লোকদের পাশ দিয়ে যাও, তখন তোমরা তাদের সালাম দিও না এবং তারা তোমাদের সালাম করলে জওয়াব দিও না।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ "তিন ধরণের খেলা জাহেলিয়ত-যুগের 'মাইসিরে'র (জুয়া) অন্তর্ভুক্ত ঃ ক্বেমার (জুয়া), পাশা, কবুতর বাজী।"

হযরত আলী (রাযিঃ) একদা শত্‌রঞ্জ (দাবা) খেলায় মত্ত এক দল লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিলেন ঃ এগুলো আবার কোন মূর্তি যে, তোমরা এর উপর ঝুকে রয়েছ, দাবা-শত্‌রঞ্জ খেলে হাত কলুষিত করা অপেক্ষা জ্বলন্ত অঙ্গার ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত হাতে রাখা উত্তম।" আরও বলেছেন ঃ "আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা অন্য কাজের জন্য সৃষ্ট হয়েছো।"

হযরত আলী (রাযিঃ) আরও বলেন ঃ দাবা-শত্‌রঞ্জ খেলোয়াড় অধিকতর মিথ্যুক হয়। কেউ বলে ঃ মেরে ফেলেছি ; অথচ সে মারে নাই। কেউ বলে ঃ মরে গেছে ; অথচ মরে নাই। (অর্থাৎ একেবারে নিরর্থক ও বেহুদা কথা।)

হযরত আবূ মূসা আশ্‌আরী (রাযিঃ) বলেন ঃ "একমাত্র পাপী লোকেরাই দাবা-শত্‌রঞ্জ খেলে থাকে।"

জেনে রাখ—উদ (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র), তানপুরা, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের সংযোগে গান-বাজনা ও খেলা-তামাশা করা যেগুলো আনন্দ-উল্লাস ও উত্তেজনা আনয়ন করে এসব হারাম। আল্লাহ্ পাক বেঁচে চলার তওফীক দান করুন।

অধ্যায় ঃ ১০০

রজব মাসের ফযীলত

'রজব' শব্দটি আরবী تَرْجِيْبٌ (তারজীব) হতে নির্গত। অর্থ, সম্মান প্রদর্শন। এ মাসকে আসাব্ব (اَلْاَصَبُّ ঃ প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস)–ও বলা হয়। কেননা, এ মাসে তওবাকারীদের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রচুর রহমত বর্ষিত হয় এবং ইবাদতগুজার বান্দাদের উপর কবূলিয়তের নূর ও ফয়েজ–বরকত নাযিল হয়। এ মাসকে আসাম্ম (اَلْاَصَمُّ ঃ বধির)–ও বলা হয়। কেননা, এ মাসে যুদ্ধ–বিগ্রহ বন্ধ থাকার দরুন এ সম্পর্কিত কোন কিছু শুনা যেতো না। কেউ কেউ বলেছেন, বেহেশতে 'রজব' নামে একটি ঝর্ণা আছে। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্ট, বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা—এই পানি পান করার সুযোগ একমাত্র সেই ব্যক্তিই পাবে, যে রজব মাসে রোযা রাখে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "রজব আল্লাহ্‌র মাস, শা'বান আমার মাস এবং রমযান আমার উম্মতের মাস।"

তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে তিন অক্ষর–বিশিষ্ট রজব (رَجَبٌ)শব্দটির ر রহমতের, ج জুরম্ অর্থাৎ বান্দার গুনাহের এবং ب বার্‌র অর্থাৎ অনুগ্রহের সংকেত বহন করে। যেন আল্লাহ্ পাক বলছেন— اَجْعَلُ جُرْمَ عَبْدِىْ بَيْنَ رَحْمَتِىْ وَبِرِّىْ (আমি আমার বান্দার গুনাহ্‌কে আমার রহমত ও অনুগ্রহের মাঝখানে রাখি)।

হযরত আবূ হুরায়রাহ রোযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি রজব মাসের ২৭ তারিখে রোযা রাখবে, তার আমলনামায় ষাট মাসের রোযার সওয়াব লিখা হবে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সর্বপ্রথম হযরত

জিব্‌রাঈল (আঃ) রজবের এই সাতাইশ তারিখেই নুবুওয়তের সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "আল্লাহ্‌র এই রজব–আসাম্ম মাসে একদিনও যে ব্যক্তি ঈমান ও ইখলাসের সাথে রোযা রাখবে, সে আল্লাহ্ তা'আলার চরম সন্তুষ্টি লাভ করবে।"

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বছরের মাসগুলোকে চারটি মাসের দ্বারা সৌন্দর্য দান করেছেন—যিল–ক্বদ, যিল–হজ্জ, মুহর্‌রম ও রজব। যেমন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হয়েছে ; مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ তন্মধ্যে তিনটি একাধারে আর একটি ভিন্ন। আর এই ভিন্ন–স্বতন্ত্র মাসটি হচ্ছে রজব মাস।"

কথিত আছে, এক মহিলা রজব মাসে প্রতিদিন বায়তুল–মুকাদ্দাস মসজিদে বার হাজার বার সূরা 'ক্বুল হুওয়াল্লাহ্' পাঠ করতো। তার অভ্যাস ছিল রজব মাসে সে নিয়মিত পশমের কাপড় পরিধান করতো। একদা সে অসুস্থা হয়ে যায় এবং পুত্রকে সে ওসীয়ৎ করে যে, মৃত্যুর পর তার পশমের পোষাকটিও যেন তার সাথে দাফন করে দেয়। কিন্তু পুত্র সেই ওসীয়ৎ পালন না করে মৃত্যুর পর তাকে উৎকৃষ্ট কাপড়ে দাফন করেছে। অতঃপর সে একরাত্রিতে স্বপ্ন দেখলো— মা পুত্রকে বলছে, "আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট, তুমি আমার ওসীয়ৎ পালন কর নাই।" পুত্র চিন্তান্বিত হয়ে মা'র পশমের লেবাসখানি কবরে রাখার জন্য আবার কবর খুঁড়লো, কিন্তু কি আশ্চর্য! মা কবরে নাই। এমন সময় গায়েব থেকে আওয়ায আসলো– ওহে! তুমি কি জাননা; রজব মাসে যে আমার ইবাদত করে আমি তাকে নির্জন একাকীত্বে ফেলে রাখি না?"

বর্ণিত আছে, যারা রজব মাসে রোযা রাখে, তাদের গুনাহ্‌মাফীর জন্য ফেরেশতাকুল রজবের প্রথম জুমা–রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে দো'আয় মগ্ন থাকেন।"

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি হারাম মাসে (যিল–কদ, যিল–হজ্জ, মুহর্‌রম ও রজব) তিন দিন রোযা রাখবে, তারজন্য নয় বৎসর ইবাদতের সওয়াব লিখা হবে।" হযরত আনাস বলেন, "বর্ণনাটি আমি নিজ কর্ণে হুযূর থেকে শুনেছি। নতুবা আমার শ্রবণশক্তি রহিত হয়ে যাক।"

হিকমত ঃ আল্লাহ্‌র সম্মানিত মাস যেমন চারটি, তেমনি শ্রেষ্ঠ ফেরেশতার সংখ্যাও চার। তেমনি শ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাবের সংখ্যাও চার। তেমনি উযূর (ফরয) অঙ্গও চারটি। এমনিভাবে শ্রেষ্ঠ তাসবীহের কালেমাও চারটি, অর্থাৎ,—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْـبَرُ -

এমনিভাবে অংকের মূল স্তম্ভের সংখ্যাও চার, অর্থাৎ— একক, দশক, শতক, হাজার। অনুরূপ, সময় গণনার বড় বড় অংশও চারটি, যথা ঃ ঘন্টা, দিন, মাস, বছর। বছরের ঋতুও চারটি ঃ শীত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত, বসন্ত। এমনিভাবে রোগ-ব্যাধির মৌলিক উৎসও চারটি, যথা ঃ রক্ত, পিত্ত, অম্ল, শ্লেষ্মা। খোলাফায়ে রাশেদীনের সংখ্যাও চার ঃ আবূ বকর, উমর, উসমান ও আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

ইমাম দীলামী (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা চারটি রাতে প্রচুর পরিমাণে রহমত নাযিল করেন ঃ এক. ঈদুল আযহার রাতে। দুই. ঈদুল ফিতরের রাতে। তিন. অর্ধেক শাবানের রাতে। চার. রজবের রাতে।

ইমাম দীলামী (রহঃ) হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) সূত্রে রেওয়ায়াত করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ পাঁচটি রাত্র এমন রয়েছে, যেগুলোতে কেউ দো'আ করলে তা রদ (ফেরৎ) হয় না ঃ এক, রজব মাসের প্রথম রাত্রি। দুই, শা'বান মাসের অর্ধেকের রাত্রি (১৪ই শা'বানের দিবাগত রাত্রি)। তিন, জুম'আর রাত্রি। চার ও পাঁচ, 'দুই ঈদের রাত্রি।"

অধ্যায় ঃ ১০১

শা'বান মাসের ফযীলত

'শা'বান' (شَعْبَان) অর্থ শাখা-প্রশাখা বের হওয়া। এ মাস প্রচুর কল্যাণ ও নেকীর মাস। তাই, এর নামকরণ হয়েছে 'শা'বান'। আরেক অর্থে 'শা'বান ঃ (شِعْب থেকে নির্গত, পাহাড়ে যাওয়ার পথ) কল্যাণের পথ।

হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, যখন শা'বান মাস উপস্থিত হতো, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "এ মাসে তোমরা তোমাদের অন্তরকে পাক-পবিত্র করে নাও এবং নিয়তকে সঠিক করে নাও।"

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় একাধারে এতো অধিক রোযা রাখতেন, আমরা মনে করতাম, তিনি আর রোযা ছাড়বেন না। আবার কখনও এমন হতো যে, একাধারে তিনি রোযা রাখছেন না, তখন আমরা মনে করতাম ; তিনি আর রোযা রাখবেন না। তাঁর অধিকাংশ রোযা হতো শাবান মাসে।"

হযরত উসামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরজ করেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শা'বান মাসে আপনাকে যত অধিক সংখ্যায় রোযা রাখতে দেখি, তত অন্য মাসে দেখি না, এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ এ (শা'বান) মাস রজব ও রমযানের মাঝখানের (ফযীলতময়) মাস ; অথচ লোকেরা এ মাসের ব্যাপারে উদাসীন। মানুষের আমলসমূহ এ মাসে রাব্বুল আলামীনের দরবারে পেশ করা হয়। আমার আমল যখন পেশ করা হয়, তখন রোযা অবস্থায় থাকা আমি পছন্দ করি।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন— আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রমযান ছাড়া কখনও পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখি নাই এবং শা'বান মাসে যত

অধিক সংখ্যায় রোযা রেখেছেন, তেমন অন্য কোন মাসে দেখি নাই।"

এক রেওয়ায়াতে আছে— "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূরা শা'বান মাস রোযা রাখতেন।" মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে— "তিনি স্বল্প সংখ্যক দিন ব্যতীত পূরা শা'বান মাস রোযা রাখতেন।"

বস্তুতঃ এ দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটি প্রথম রেওয়ায়াতের জন্য ব্যাখ্যাস্বরূপ অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসে এতো বেশী রোযা রাখতেন যেন পূরা মাসটিকে ঘিরে নিতেন। সুতরাং 'পূরা মাস'–এর দ্বারা এখানে 'অধিকাংশ'–কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

বর্ণিত আছে, মুসলমানদের জন্য দুনিয়াতে যেমন দু'টি ঈদের দিন আছে, তেমনি ফেরেশ্তাদের জন্যেও আসমানে দু'টি ঈদের রাত্র আছে। মুসলমানদের জন্য ঈদুল–ফিতর ও কুরবানীর ঈদ আর ফেরেশ্তাদের জন্য শবে বরাত ও লাইলাতুল–কদর। এ জন্যেই শবে বরাত–কে 'ঈদুল–মালায়িকাহ্' নাম দেওয়া হয়েছে।"

ইমাম সুবকী (রহঃ) তদীয় তফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, শবে–বরাতে ইবাদত করার ওসীলায় বছরের গুনাহ্ মাফ হয় আর জুম'আর রাতে ইবাদতের ওসীলায় সপ্তাহের গুনাহ্ মাফ হয় এবং শবে কদরে ইবাদত করলে জীবনের গুনাহ্ মাফ হয়। এ জন্যেই শবে–বরাতকে গুনাহ্–মাফীর রাত্রও বলা হয়। অনুরূপ, এ রাত্রিকে 'হায়াত বা 'জীবনের রাত্রি'ও বলা হয়। ইমাম মুনযিরী (রহঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস নকল করেছেন— "যে ব্যক্তি দুই ঈদের দুই রাত্রি এবং অর্ধ শা'বানের রাত্রি জেগে ইবাদত করবে, তার অন্তর সে দিনও (কিয়ামতের দিন) মরবে না, যেদিনটি অন্তরসমূহের মৃত্যুর দিন হবে।"

এ রাত্রিকে 'শাফায়াতের রাত্রি'ও বলা হয়। হাদীস শরীফে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য ১৩ই শা'বানের রাত্রি সুপারিশ করেছিলেন, তাতে কবূল হয়েছিল এক তৃতীয়াংশ, অতঃপর ১৪ই শা'বানের রাত্রিতে পুনরায় সুপারিশ করেছেন, তাতে কবূল হয়েছে আরেক তৃতীয়াংশ, অতঃপর ১৫ই শা'বানের রাত্রির সুপারিশে অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ কবূলিয়ত–প্রাপ্ত হয়ে তা' পূর্ণতা লাভ করে। তবে যে সকল বান্দা উদভ্রান্ত উটের ন্যায় অবাধ্য হয়ে দূরে পলায়ন করে, তাদের জন্য কবূল হয় নাই।

এ রাত্রিকে 'মাগফিরাতের রাত্রি'ও বলা হয়। ইমাম আহমদ (রহঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা অর্ধশা'বানের রাত্রিতে বান্দাদের প্রতি বিশেষ করুণাদৃষ্টি করেন এবং দুই শ্রেণীর লোক ব্যতীত সকলের মাগফিরাত করে দেন ঃ এক, মুশ্রিক আর দ্বিতীয় হিংসুক।"

এ রাত্রিকে 'পরিত্রাণ ও মুক্তির রাত্রি'ও বলা হয়। ইব্নে ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জরুরী কাজে আমাকে হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর ঘরে পাঠালেন। আমি তাঁকে (হযরত আয়েশাকে) বললাম, আপনি শীঘ্র করুন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে এসেছি তিনি অর্ধশা'বানের রাত্রি সম্পর্কিত জরুরী বিষয়াবলী বর্ণনা করছেন। হযরত আয়েশা বললেন, হে আনাস ! বস, আমি তোমাকে অর্ধশা'বানের রাত্রি সম্পর্কে একটি ঘটনা শুনাই। একদা সেই রাত্রটি ছিল রাসূলুল্লাহ্র কাছে আমার হিস্সা। তিনি আমার সাথে শয্যা গ্রহণ করলেন। কিন্তু রাত্রিতে এক সময় সজাগ হয়ে আমি তাঁকে বিছানায় অনুপস্থিত পেলাম। মনে মনে ভাবলাম— তাহলে কি তিনি কিব্তী বাঁদীর পার্শ্বে চলে গেলেন ! বের হয়ে হঠাৎ আমার পা গিয়ে পড়লো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তখন লক্ষ্য করে শুনি— তিনি একাগ্র মনে বলছেন ঃ

سَجَدَ لَكَ سَوَادِىْ وَخِيَالِىْ وَاٰمَنَ بِكَ فُؤَادِىْ وَهٰذِهٖ يَدِىْ وَمَاجَنَيْتُ بِهَا عَلٰى نَفْسِىْ يَاعَظِيْمًا يُرْجٰى لِكُلِّ عَظِيْمٍ اِغْفِرِ الذَّنْبَ الْعَظِيْمَ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ۔

"আয় আল্লাহ্! সর্বান্তঃকরণে— আমার দেহ আমার মুখমণ্ডল সবকিছু আপনার জন্য সেজদাবনত। আমার অন্তঃকরণ আপনার প্রতি ঈমান এনেছে। এই যে আমার হাত— সে-ও আপনার প্রতি বিশ্বাসী। এ হাত ও অন্যান্য

আর যা কিছু দিয়ে আমি কোন অপরাধ করি— আমাকে মাফ করুন ; হে মহান, মহা অপরাধের ক্ষমার জন্যেও যার অনুগ্রহের আশা করা হয়- আমার বড় বড় গুনাহ্-ও মাফ করে দিন। আমার মুখমণ্ডলকে, আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, আকৃতি দিয়েছেন, কর্ণ ও শ্রবণশক্তি, চক্ষু ও দৃষ্টিশক্তি যিনি দান করেছেন— আমাকে ক্ষমা করুন।"

অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন এবং এই দো'আ পড়লেন ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ قَلْبًا تَقِيًّا نَقِيًّا مِّنَ الشِّرْكِ بَرِيًّا لَا كَافِرًا وَّلَا شَقِيًّا۔

"আয় আল্লাহ্! আপনার ভয়ে শিরক থেকে পবিত্র, গুনাহ থেকে স্বচ্ছ অন্তর আমাকে দান করুন— যার মধ্যে কুফরের লেশমাত্র না থাকে, যে অন্তর কোনদিন বঞ্চিত ও দূর্ভাগা না-হয়।"

অতঃপর তিনি পুনরায় সেজদায় গেলেন। এ সময় তাঁকে আমি এই দো'আ পড়তে শুনেছি ঃ

اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ اَقُوْلُ كَمَا قَالَ اَخِيْ دَاوُدُ اَعْفِرُ وَجْهِيْ فِي التُّرَابِ لِسَيِّدِيْ وَحَقَّ لِوَجْهِ سَيِّدِيْ اَنْ يُعْفَرَ

"আয় আল্লাহ্! আপনার সন্তুষ্টির দোহাই দিয়ে আপনার রোষ ও অসন্তুষ্টি হতে পানাহ্ চাই। আপনার ক্ষমার দোহাই দিয়ে আপনার আযাব ও গজব হতে পানাহ্ চাই। আপনার দোহাই দিয়ে আপনি থেকে পানাহ্ চাই। আপনার প্রশংসা করে শেষ করা আমার জন্য সম্ভব নয়। আপনি তেমনি যেমন আপনি নিজের প্রশংসা করেছেন। আমি তা-ই বলি যা আমার ভাই দাঊদ বলেছিলেন—আমি আমার প্রভুর জন্য আমার চেহারা মাটিতে

স্থাপন করি—এতে আমি তাঁর ক্ষমা অবশ্যই পেতে পারি।”

অতঃপর তিনি মাথা উত্তোলন করলেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হউন—আপনি কী করছেন আর আমি কি ভাবছি! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে হুমায়রা (হযরত আয়েশার অপর নাম)! তুমি কি জান না— আজকের এই রাত্রি অর্ধশা'বানের রাত্রি, এ রাত্রিতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী কাল্‌ব গোত্রের অসংখ্য ছাগলের পশমের পরিমাণ লোককে দোযখ থেকে পরিত্রাণ ও মুক্তি দান করেন, তবে ছয় শ্রেণীর লোক ব্যতীত ঃ ১। মদ্যপায়ী ২। পিতা-মাতার অবাধ্য ৩। ব্যভিচারী ৪। সম্পর্ক ছিন্নকারী ৫। ফেত্‌নাবাজ ৬। চুগলখোর। এক বর্ণনায় ফেতনাবাজের স্থলে প্রাণীর ছবি অংকনকারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্ধশা'বানের এ রাত্রিকে ‘কিসমত ও তকদীরের রাত্রি’ বা ‘বরাতের রাত্রি’ও বলা হয়। হযরত আতা' ইব্‌নে ইয়াসার (রহঃ) বর্ণনা করেন, এক শা'বান থেকে পরবর্তী শা'বান পর্যন্ত যারা মারা যাবে, তাদের নামের লিখিত সূচী এই অর্ধশা'বানের রাত্রিতে মউতের ফেরেশ্‌তার নিকট হস্তান্তর করা হয়। অথচ এই মুহূর্তে তাদের কেউ কেউ ক্ষেতে-খামারে কাজ করতে থাকে, কেউ কেউ বিবাহ করতে থাকে, কেউ কেউ অট্টালিকা তৈরীতে মত্ত থাকে, এদিকে মালাকুল মউত অপেক্ষায় থাকে যে, আল্লাহ্‌র হুকুম হবে আর তৎক্ষণাৎ তার জান কবজ করে নিবে।”

অধ্যায় ঃ ১০২

রমযান মাসের ফযীলত

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর।" (বাকারাহ্ ঃ ১৮৩)

হযরত সাঈদ ইব্‌নে জুবাইর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের যুগেও রোযার প্রচলন ছিল ; কিন্তু তাদের রোযা হতো ইশার সময় থেকে নিয়ে পরদিন রাত্র পর্যন্ত। ইসলামের শুরুভাগেও এই নিয়মের প্রচলন ছিল।

আলেমগণের এক জামাতের অভিমত অনুযায়ী নাসারাদের উপরও রোযা ফরয ছিল এবং স্বাভাবিক গতিতে রোযার সময় হতো কখনও গ্রীষ্মকালে কখনও শীতকালে। এতে তাদের সফরে, ব্যবসা-বাণিজ্যে নানারকম ব্যাঘাত দেখা দিতো। তাই, সকলের অভিমত নিয়ে তাদের কর্তা লোকেরা শীত-গ্রীষ্মের মাঝামাঝি বসন্তকালীন সময়টিকে রোযার জন্য নির্ধারিত করে নেয়, আর নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তনের এই জঘন্য পাপটি মোচনের জন্য অতিরিক্ত দশটি রোযার সংযোজন করে নেয়।

পরবর্তী সময়ে আরও ঘটনা ঘটেছে— তদানীন্তন কালে এক বাদশাহ আপন রোগমুক্তির জন্য মান্নত করেছিল, সুস্থ হলে আরও সাতটি রোযা বাড়িয়ে নিবো। পরবর্তী বাদশাহ এসে আরও তিনটি রোযা সংযোজন করে মোট পঞ্চাশটি করে নেয়। এরপর এক সময় প্লেগ-মহামারী দেখা দিলে তারা আরও দশটি রোযা বাড়িয়ে নিয়ে ষাট সংখ্যা পূর্ণ করে নেয়।

বর্ণিত আছে, পূর্ববর্তী কোন এক জাতির উপর রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বিস্মৃত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

ইমাম বগভী (রহঃ) বলেন, সহীহ্ অভিমত অনুযায়ী 'রমযান' একটি মাসের নাম, শব্দটি رَمْضَاء (রাম্‌যা') থেকে উদ্ভূত, অর্থ— উত্তপ্ত পাথর। আরববাসীরা তীব্র গরমের মৌসুমে রোযা রাখতো। সে সময় তারা বছরের মাসগুলোর নাম রাখে, তখন স্বাভাবিক ধারাবাহিকতায় এ মাসটির অবস্থান ছিল গরম মৌসুমে। তাই, এর নামকরণ হয় 'রমযান'। অন্য এক অভিমত অনুযায়ী উক্ত নামকরণের তাৎপর্য হলো— রোযা মানুষের পাপসমূহকে জ্বালিয়ে দেয়। এ থেকেই রোযার মাসের নামকরণ হয় রমযান।

রমযানের রোযা ফরয হয় হিজরী দ্বিতীয় সনে। আমলের দিক থেকে এ রোযা যেমন অত্যাবশ্যকীয়, আকীদাগত দিক থেকেও মাহে রমযানের রোযার ফরযিয়তের প্রতি ঈমান রাখা অপরিহার্য। সুতরাং এ ফরযিয়তের অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের।

প্রচুর হাদীসে রমযানের রোযার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ كُلُّهَا فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ فِي الشَّهْرِ كُلِّهِ -

"যখন রমযান মাসের প্রথম রাত্র উপস্থিত হয় সব জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং পূর্ণ মাসব্যাপী একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা একজন ঘোষককে হুকুম প্রদান করেন, সে এই মর্মে ঘোষণা দেয়— হে পুণ্যের আশাবাদী! অগ্রসর হও, হে অমঙ্গলকামী! পিছে হট। আরও ঘোষণা দেয়— আছে কোন ক্ষমাপ্রার্থী, তাকে ক্ষমা করা হবে। আছে কোন প্রার্থনাকারী, তার প্রার্থনা কবূল করা হবে। আছে কোন তওবাকারী, তার তওবা কবূল করা হবে। সকাল পর্যন্ত এই আহ্বান অব্যাহত থাকে। ইফতারের সময় প্রতি রাত্রে আল্লাহ্ তা'আলা দশ লক্ষ পাপাচারী ব্যক্তিকে মুক্তি দান করেন, যাদের জন্য জাহান্নাম অপরিহার্য হয়ে গিয়েছিলো।"

হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসের শেষ তারিখে আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন— "তোমাদের উপর এমন একটি মহান মাস ছায়া করছে, যার মধ্যে রয়েছে লাইলাতুল–কদর। এই লাইলাতুল–কদর সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলা এ মাসে তোমাদের উপর রোযা ফরয করেছেন এবং রাত্রি জাগরণ করে (তারাবীহ্র) নামায পড়াকে পুণ্যের কাজ হিসাবে প্রদান করেছেন। যে ব্যক্তি এ মাসে একটি নফল ইবাদত করবে, সে অন্য মাসে একটি ফরয আদায়ের তুল্য সওয়াব পাবে। আর যে এ মাসে একটি ফরয ইবাদত করবে, সে অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায়ের সমতুল্য সওয়াব লাভ করবে।

এ মাস সবরের মাস। সবরের বিনিময় জান্নাত। এ মাস সহমর্মিতার মাস। এ মাসে মুমিন লোকদের রিযিক বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে তার সমান সওয়াব লাভ করবে, অথচ রোযাদার ব্যক্তির সওয়াবে বিন্দুমাত্রও ঘাটতি হবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে অনেকেরই সামর্থ নাই যে, সে অপরকে ইফতার করাবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি কাউকে একটু দুধ বা এক ঢোক পানি বা একটি খেজুর দ্বারা ইফতার করাবে, তাকেও আল্লাহ্ তা'আলা সেই সওয়াব দান করবেন। আর যে ব্যক্তি রোযাদারকে তৃপ্ত করে ইফতার করাবে, তার গুনাহ্ মাফ হবে, পরওয়ারদিগার আমার হাউজ থেকে তাকে এমন শরবত পান করাবেন যে, এরপর সে কোনদিন পিপাসার্ত হবে না এবং সেই রোযাদারের সমান সওয়াবও সে হাসিল করবে ; অথচ তার সওয়াবে কোন ঘাটতি হবে না।

এ মাসের প্রথম অংশ রহমতের দ্বিতীয় অংশ মাগফেরাতের এবং তৃতীয় অংশ জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়ার।

যে ব্যক্তি এ মাসে আপন গোলাম ও মযদূরের (দায়িত্বের) বোঝা হালকা করে দিবে, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিবেন।

তোমরা রমযান মাসে চারটি আমল অধিক পরিমাণে কর ; দু'টি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য। আর দু'টি যা না হলে তোমাদের উপায়ান্তর নাই।

প্রথম দু'টি হলো ঃ (এক,—) কালেমা তাইয়্যিবাহ্ এবং (দুই,—) এস্তেগফার বেশী বেশী করে পড়। আর দু'টি হলো ঃ (তিন,—) আল্লাহ্‌র কাছে বেহেশ্‌ত চাও এবং (চার,—) দোযখ থেকে পানাহ মাগো।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَأَخَّرَ ـ

"যে ব্যক্তি খাঁটি মনে ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার পূর্বের এবং পরের গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।"

আরও বর্ণিত হয়েছে—

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهٗ اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهٗ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ

"বনী আদমের প্রত্যেকটি আমল তার নিজের জন্য ; রোযা ব্যতীত। কেননা, তা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান।"

কত বড় সৌভাগ্যের বিষয়! রোযার ইবাদতকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন এবং তিনি নিজেই এর প্রতিদান।

হাদীস শরীফে আরও আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "রমযান মাসে পাঁচটি বিষয় আমার উম্মতকে এমন দেওয়া হয়েছে যা পূর্ববর্তী কোন উম্মতকে দেওয়া হয় নাই। এক—রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মুশকের সুগন্ধি হতেও বেশী সুগন্ধযুক্ত। দুই—ফেরেশতাগণ তার জন্য ইফতার পর্যন্ত গুনাহ্‌মাফীর দো'আ করতে থাকে। তিন—দুর্বৃত্ত শয়তানদেরকে এ মাসে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়। চার–প্রতিদিন আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতকে সুসজ্জিত করেন এবং বলেন ঃ আমার নেক বান্দারা দুনিয়ার দুঃখ-ক্লেশ ছেড়ে শীঘ্রই (বেহেশতে) আসছে। পাঁচ—রমযানের শেষ রাতে রোযাদারের গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ ক্ষমা কি শবে কদরে হয়ে থাকে! আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন ঃ না, বরং নিয়ম হলো, মজদূর কাজ শেষ করার পরই মুজুরী পেয়ে থাকে।

অধ্যায় ঃ ১০৩

শবে কদরের ফযীলত

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বনী ইসরাঈল গোত্রের এক বুযুর্গের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল— "তিনি একাধারে এক হাজার মাস আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং স্বীয় উম্মতের জন্যেও সেরূপ নেকীর আশা পোষণ করে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করলেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমার উম্মতের লোকদের আয়ু খুব কম এবং তাদের আমলও অতি অল্প ; আপনি মেহেরবানী করে তাদের নেকী বাড়িয়ে দিন।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করে এই উম্মতকে লাইলাতুল-কদর দান করলেন। এই মহান রাত্রির ইবাদত বনী ইসরাঈল গোত্রের এক ব্যক্তির একাধারে হাজার মাস জিহাদ করা অপেক্ষা উত্তম। কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মতকে উক্ত সুযোগ বিশেষভাবে দান করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে অন্য কোন উম্মতকে দেওয়া হয় নাই।

কথিত আছে, সেই ব্যক্তির নাম ছিল শামঊন। একাধারে এক হাজার মাস তিনি ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন এবং তার ঘোড়ার পশমও শুষ্ক হয় নাই। খোদা-প্রদত্ত ক্ষমতা ও অসম সাহসিকতায় তিনি দুশমনদের উপর হামলা চালাতেন। অতীষ্ঠ হয়ে দুশমনরা তাঁর স্ত্রীর নিকট গোপনে লোক পাঠায় এবং ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে মজবূত রশি দিয়ে বেঁধে তাদের সোপর্দ করতে পারলে স্ত্রীকে একটি বড় স্বর্ণের পাত্র পরিপূর্ণ করে স্বর্ণ প্রদান করবে বলে চুক্তি করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী স্ত্রী ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর হাত-পা বেঁধে দিল। কিন্তু তিনি জাগ্রত হয়ে হাত-পা নাড়া দিয়ে তৎক্ষণাৎ সেই বাঁধন ছুটিয়ে ফেলেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে স্ত্রী অজুহাত করে বললো, "আমি আপনার শক্তি পরীক্ষা করেছি মাত্র।" এ সংবাদ কাফেরদের

নিকট পৌঁছার পর তারা লোহার জিঞ্জীর পাঠিয়ে দিল। পূর্বের ন্যায় এবারও তিনি লোহার জিঞ্জীর খুলে ফেললেন। এবার স্বয়ং ইবলীস কাফেরদের নিকট উপস্থিত হয়ে পরামর্শ দিল, তোমরা স্ত্রীলোকটিকে বল, সরাসরি সেই বুযুর্গ লোকটিকে যেন সে জিজ্ঞাসা করে— এমন কি জিনিস আছে যা সেই লোক কাটতে না পারে। স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ "আমার চুলের গুচ্ছ কর্তন করতে আমি অক্ষম।" তার আটটি দীর্ঘ চুলের গুচ্ছ ছিল, পথ চলার সময় তা যমীন স্পর্শ করতো। লোকটি ঘুমানোর পর স্ত্রী তার দুই পা ও দুই হাত চার চার গুচ্ছ দ্বারা বেঁধে দিল। অতঃপর কাফেররা এসে তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায়। সেখানে ছিল এক বিরাট জবাইখানা ; চার শত গজ উঁচু, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থও অনুরূপ। মাঝখানে এক বিরাট স্তম্ভ। লোকেরা তাঁর কান ও ঠোঁট কেটে দিল। তখনও সমস্ত কাফের লোকজন তাঁর সম্মুখে বিদ্যমান, এমতাবস্থায় তিনি মুনাজাত করলেন ঃ "ইয়া আল্লাহ্! এই বাঁধন ভেঙ্গে দেওয়ার শক্তি আমাকে দান কর, এই স্তম্ভ স্থানচ্যুত করার ক্ষমতা দাও এবং এই অট্টালিকার নীচে চাপা দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দাও।" আল্লাহ্ তা'আলা তার দো'আ কবূল করলেন— খোদা-প্রদত্ত শক্তির সাহায্যে তিনি আপন বাঁধন ছুটিয়ে স্তম্ভটিকে স্থানচ্যুত করে ফেললেন। ফলে, ছাদসহ বিরাট অট্টালিকা তাদের উপর পড়ে যায়, আর সমস্ত কাফের ধ্বংস হয়ে যায় এবং তিনি আল্লাহ্র অসীম রহমতে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই জিহাদে লোকটির কি পরিমাণ সওয়াব হয়েছে, আমরা কি তা জানতে পারি? আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "আমারও তা' অজানা।" অতঃপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রার্থনার জওয়াবে 'লাইলাতুল-কদর' দান করলেন।

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত— রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যখন লাইলাতুল-কদর উপস্থিত হয়, তখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ফেরেশতাগণের বিরাট দল নিয়ে দুনিয়াতে অবতরণ করেন এবং বসা বা দাঁড়ানো (যে কোন) অবস্থায় আল্লাহ্র যিকরে মগ্ন বান্দাদেরকে তারা সালাম দেন এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত বর্ষণের

জন্য দো'আ করেন।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, কদরের রাত্রিতে কঙ্করের চেয়েও অধিক সংখ্যক ফেরেশতা নাযিল হোন এবং তাদের অবতরণের জন্য সেই রাত্রিতে আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। যেমন বর্ণিত আছে— সেই রাত্রিতে নূরের প্রাচুর্য থাকে, বিরাট তজল্লী প্রকাশ পায়, ঊর্ধ্বজগতের নানা মহিমার বিকাশ ঘটে। পৃথিবীতে অবস্থানরত মানুষের মধ্যে অনেকের সম্মুখে তা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। কেউ কেউ যমীন ও আসমানের ফেরেশতাগণকে স্পষ্ট দেখতে পান, আকাশমণ্ডলীর অন্তরায় তাদের সম্মুখ থেকে উঠে যায়। ফেরেশতাগণকে তাদের বাস্তব আকৃতিতে অবলোকন করেন, তাঁদের অনেকেই দাঁড়ানো অনেকেই বসা অনেকেই রুকূতে অনেকেই সেজদায় অনেকেই যিকর-আযকারে মগ্ন অনেকেই আল্লাহ্‌র শোকরে মগ্ন অনেকেই তসবীহ্ পড়া অবস্থায় আবার অনেকেই কালেমা তাইয়্যেবাহ্ পাঠরত অবস্থায় তাদের সম্মুখে দৃশ্যমান হোন।

এমনিভাবে অনেক ইবাদতগুযার বান্দার সম্মুখে বেহেশত পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে— সেখানকার উন্নত মহলসমূহ, বাসগৃহাদি, হূর, নহর, বৃক্ষ, ফল, আরশ, আরশের ছাদ, আম্বিয়া, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের মান-মর্যাদা ও আউলিয়া কেরামের পুরস্কার তাদের দৃষ্টির সামনে প্রতিভাত হয়। মোটকথা, তারা রীতিমত সেই ঊর্ধ্বজগতে ভ্রমণ করতে থাকেন। তাদের সম্মুখে দোযখ, দোযখের ভয়াবহ আযাব, দোযখের গর্তসমূহ ও কাফেরদের অবস্থা দৃষ্ট হয়। আবার অনেকের সম্মুখে আল্লাহ্ তা'আলার অনন্ত রূপ সরাসরি পরিস্ফুটিত হয়—তারা কেবল এই অসীম সত্তার দীদারেই মগ্ন হয়ে থাকেন।

হযরত উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "রমযানের সাতাইশতম রাত্রির সকাল পর্যন্ত পূর্ণ ইবাদত আমার নিকট পূর্ণ রমযান মাসের অন্যান্য সকল রাত্রির ইবাদত অপেক্ষা অধিক প্রিয়।" হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, যে সকল মহিলা পূর্ণ রাত্রি জাগরণে অক্ষম তারা কি করবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা তাকিয়া বা বালিশে কোনরূপ ঠেস না লাগিয়ে কিছু সময় আল্লাহ্‌র স্মরণে মগ্ন থাকবে— তা আমার নিকট সমগ্র উম্মতের পূরা রমযান ইবাদত করা অপেক্ষা প্রিয়।"

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কদরের রাত্রি জাগরণ করল এবং তাতে দুই রাক'আত নামায আদায় করল এবং আল্লাহ্র কাছে গুনামাফীর জন্য দো'আ করল, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাফ করে দিবেন এবং সে যেন আল্লাহ্র রহমতের দরিয়াতে ডুব দিল। এইরূপ ব্যক্তি জিবরাঈল (আঃ)–এর ডানার স্পর্শ লাভ করবে। আর যে ব্যক্তির এই স্পর্শ লাভ হবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

অধ্যায় ঃ ১০৪
ঈদের মাসায়েল

হিজরী শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ ঈদুল–ফিতরের এবং যিলহজ্জ মাসের দশম তারিখ ঈদুল–আযহার দিন। রমযান মাসের রোযার ইবাদত সমাপনান্তে মুসলমানগণ ঈদুল–ফিতরের মাধ্যমে আনন্দ উদ্‌যাপন করে। উভয় ঈদেই তারা বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করে থাকে। ঈদুল–ফিতরের পর ছয়টি রোযা রাখা হয়। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়। ঈদের দিনগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রচুর নে'আমত বর্ষণ করেন। এ জন্যেই মুসলমানগণ এ দিনগুলোর জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান থাকে ; এতে পরম আনন্দ উপভোগ করে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম ঈদুল–ফিতরের নামায হিজরী দ্বিতীয় সনে আদায় করেছেন এবং পরবর্তীতে কখনও এই নামায পরিত্যাগ করেন নাই। তাই ঈদের নামায (অতি জরুরী) সুন্নতে মুআক্কাদাহ্ (ওয়াজিব)।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত—"তোমরা তাকবীর (আল্লাহু আকবার)–বলার মাধ্যমে তোমাদের ঈদগুলোকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর।" হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ঈদের দিন তিনশত বার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ পাঠ করে এর সওয়াব সকল মৃত মুসলমানের রূহের মাগফেরাতের জন্য বখ্‌শে দিবে, এ তসবীহের বরকতে প্রত্যেকের কবরে এক হাজার নূর দাখেল হবে এবং মৃত্যুর পর এই তাসবীহ্ পাঠকারী ব্যক্তির কবরেও আল্লাহ্ তা'আলা এক হাজার নূর দান করবেন।"

হযরত ওহ্‌ব ইব্‌নে মুনাব্বেহ্ থেকে বর্ণিত, ঈদের দিনগুলোতে ইব্‌লীস চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। এ অবস্থা দেখে অন্যান্য শয়তান তার আশে–পাশে উপস্থিত হয় এবং জিজ্ঞাসা করে ঃ হে আমাদের সর্দার! আপনার

রোষ ও অসন্তুষ্টির কারণ কি? তখন ইবলীস জওয়াবে বলে ঃ আজকের (ঈদের) এ দিনে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে মাফ করে দিয়েছেন—এখন তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, তাদেরকে দুনিয়ার মোহ ও প্রবৃত্তির সাধ-অভিলাষে উন্মত্ত রেখে আখেরাতের বিষয়ে গাফেল ও অন্যমনস্ক করে দাও।

হযরত ওহ্ব থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঈদুল-ফিতরের দিনে বেহেশ্ত সৃষ্টি করেছেন এবং এ দিনেই বেহেশ্তে তূবা (আনন্দ)-বৃক্ষ রোপণ করেছেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এই দিনেই সর্বপ্রথম ওহী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন এবং এ দিনেই ফেরআউনের যাদুগরদের তওবা কবূল হয়েছে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْعِيْدِ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ

"যে ব্যক্তি ঈদুল-ফিত্রের রাতে ঈমান ও ইখলাসের সাথে ইবাদত-বন্দেগী করবে, তার দেল্ সেদিন যিন্দা থাকবে যেদিন অনেকের দেল্ মরে যাবে।"

হযরত উমর (রাযিঃ) ঈদের দিন তাঁর পুত্রের পরিধানে জীর্ণ পোষাক দেখে কেঁদে ফেল্লেন। পুত্র কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বল্লেন, বৎস! অন্যান্য কিশোর-বালকরা ঈদের দিনে তোমাকে এ পোষাক পরিহিত দেখবে, আমার ভয় হয়—এতে তোমার দেল্ ভাঙ্গতে পারে। হযরত উমরের পুত্র জওয়াবে বল্লেন, আব্বাজান! দেল্ ঐ ব্যক্তিরই ভাঙ্তে পারে, যে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিল করতে পারে নাই কিংবা যে সন্তান তার মা-বাপের সন্তোষ লাভ করতে পারে নাই ; আমি তো আশা করি, আপনার সন্তুষ্টি আমার প্রতি রয়েছে এবং এ ওসীলায় আল্লাহ্ পাকও আমার প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন। এ কথা শুনে হযরত উমর আরও কাঁদলেন, বুদ্ধিমান সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং খুব দো'আ দিলেন।

জনৈক আরবী কবি চমৎকার বলেছেন ঃ "লোকেরা আমাকে জিজ্ঞসা

করে, কাল ঈদের দিন তুমি কী পোষাক পরিধান করবে? বলি, যে পোষাক পরিধান করলে কয়েক ঢোক পান করা যায়—দারিদ্র্য ও ছবর এ দুই পোষাকের মাঝখানে এমন একটি দেল্ অবস্থান করছে, যে দেল্টি প্রতি ঈদ ও জুমা'তে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভ করে থাকে ঃ

اَلْعِيْدُ لِيْ مَاتَمٌ اِنْ غِبْتَ يَا اَمَلِيْ

وَالْعِيْدُ اِنْ كُنْتَ لِيْ مَرْاٰى وَمُسْتَمِعَا

"হে প্রেমাস্পদ! তুমি ব্যতীত আমার ঈদ আনন্দ নয় বরং তা শোক-বিলাপ। প্রকৃত ঈদ আমার হবে যদি হে মাহ্বূব! তোমার দর্শন লাভ করতে পারি এবং তোমাকে কিছু শোনাতে পারি।"

বর্ণিত আছে— ঈদুল-ফিত্রের দিন ভোর-সকালে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্তাদের পাঠিয়ে দেন ; তাঁরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং গলিপথের মুখে দাঁড়িয়ে সজোরে আওয়ায করে ঘোষণা দিতে থাকেন— মানব ও জ্বিন ব্যতীত অন্যান্য সকল মাখ্লূকাত যা শুনতে পায়— ওহে উম্মতে মুহাম্মদী! তোমরা তোমাদের দয়াময় রব্বের প্রতি ঝুকো, অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি তোমাদেরকে দান করবেন, বড় বড় গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। লোকেরা যখন নামাযের স্থানে পৌঁছে, আল্লাহ্ তা'আলা তখন ফেরেশ্তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ ঐ মজদূরের কী বিনিময় হতে পারে যে তার কাজ সম্পন্ন করেছে? ফেরেশ্তাগণ বলেন, তার বিনিময় হচ্ছে, পূর্ণ প্রাপ্য তাকে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা সাক্ষী থাক, বিনিময়ে আমি তাদেরকে আমার সন্তুষ্টি ও ক্ষমা দান করলাম।

অধ্যায় ঃ ১০৫

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের গুরুত্ব ও ফযীলত

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "ইবাদত–বন্দেগীর জন্য যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন অপেক্ষা আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়তর দিন আর নাই। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, এ দিনগুলোতে ইবাদত করা কি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, তবে যদি কেউ আপন জান–মাল নিয়ে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং সবকিছুই আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিসর্জন দেয়।"

হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "ইবাদতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ দশ দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন আর নাই। আরজ করা হলো, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদও কি এর সমতুল্য নয়? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জওয়াব দিলেন, না ; তবে সক্রিয় জিহাদের তীব্রতায় যদি কারও ঘোড়া আহত হয়ে যায় এবং খোদ মুজাহিদ যদি ধূলি–মলিন হয়ে যায়।"

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, এক যুবকের অভ্যাস ছিল যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা দিতেও সে রোযা রাখতে আরম্ভ করে দিতো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানতে পেরে যুবককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ দিনগুলোতে তোমার রোযা রাখার কারণ কি? সে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা–মাতা আপনার জন্য কুরবান হউন— এ দিনগুলো পবিত্র হজ্জের প্রতীক ও হজ্জ আদায়ের মুবারক সময়— হজ্জ আদায়কারীগণের সাথে আমিও নেক আমলে শরীক হই, এই আশায় যে, তাদের সাথে আমার দো'আও আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করে নিবেন। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ

"তোমার এক একটি রোযার বিনিময়ে একশত গোলাম আযাদ করার, একশত উট আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার এবং জিহাদের সাজ-সামানে ভরপুর এক ঘোড়া জিহাদের জন্যে দেওয়ার সওয়াব রয়েছে, তন্মধ্যে ৮ই যিলহজ্জ (ইয়াওমত্-তার্‌বিয়া)-এর রোযার বিনিময়ে এক হাজার গোলাম আযাদ করার এক হাজার উট দান করার এবং সাজ-সামান সহ জিহাদের জন্য এক হাজার ঘোড়া দান করার সমতুল্য সওয়াব রয়েছে, আবার ৯ই যিলহজ্জ (ইয়াওমুল-আরাফা)-এর রোযার বিনিময়ে দুই হাজার গোলাম আযাদ করার, দুই হাজার উট দান করার জিহাদের সাজ-সামান সহ দুই হাজার ঘোড়া দান করার সওয়াব রয়েছে।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

يَعْدِلُ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ بِصَوْمِ سَنَتَيْنِ وَيَعْدِلُ صَوْمُ عَاشُوْرَاءَ بِصَوْمِ سَنَةٍ

"আরাফা'র দিনের (৯ই যিলহজ্জ) রোযা দুই বৎসর রোযা রাখার সমতুল্য আর আশূরা' (১০ই মুহর্‌রম)-এর রোযা এক বৎসর রোযা রাখার সমতুল্য।"

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَوَاعَدْنَا مُوْسٰى ثَلَاثِيْنَ لَيْلَةً وَاَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ

"এবং আমি মূসা (আঃ)-এর সাথে ওয়াদা করেছি ত্রিশ রাত্রির এবং তা পূর্ণ করেছি আরও দশ দ্বারা।" (আ'রাফ ঃ ১৪১)

মুফাস্‌সিরগণ বলেছেন, সেই 'দশ' ছিল যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন।

হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত— আল্লাহ্ তা'আলা দিনসমূহের মধ্য হতে চারটি, মাসসমূহের মধ্য হতে চারটি, নারীদের মধ্যে চারজন, সর্বপ্রথম যারা জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে তাদের মধ্য হতে চারজন এবং স্বয়ং জান্নাত যে সকল নেকবান্দাদের প্রত্যাশী তাদের মধ্য হতে

চারজনকে নির্বাচন করেছেন এবং বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। সেগুলো হচ্ছে ঃ

(১) জুম'আর দিন ঃ জুম'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে কোন মুসলিম বান্দা সে মুহূর্তে আল্লাহ্‌র কাছে যা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তা দান করবেন— সেই প্রার্থিত বস্তু দুনিয়ার হোক বা আখেরাতের হোক।

(২) আরাফার দিন ঃ (যে দিনটিতে পবিত্র হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়) আরাফার দিন যখন উপস্থিত হয়, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তাদেরকে ফখর করে বলেন— হে ফেরেশ্‌তারা! তোমরা দেখ— আমার বান্দারা উপস্থিত হয়েছে; ধুলি-মলিন অবস্থায় তাদের কেশ অগুছালো, আমার জন্যে তারা ধন-মাল খরচ করেছে শারীরিকভাবে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়েছে ; তোমরা সাক্ষী থাক- আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম।

(৩) ঈদুল-আযহা অর্থাৎ কুরবানীর দিন ঃ ঈদুল-আযহার দিনে বান্দার কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহ্ তা'আলা তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেন।

(৪) ঈদুল-ফিতরের দিন ঃ রমযান মাসের রোযা রাখার পর ঈদুল-ফিতরের নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে লোকজন যখন বের হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তাগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ প্রত্যেক শ্রমিক শ্রমদানের পর পারিশ্রমিক চেয়ে থাকে, আমার বান্দারা পূর্ণ মাস রোযা রেখেছে, আজকে ঈদের দিন তারা বের হয়েছে আমার কাছে পারিশ্রমিক পাওয়ার আশায়। হে ফেরেশ্‌তারা! তোমরা সাক্ষী থাক— আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। এক আওয়াযকারী আওয়ায দিয়ে থাকে, 'হে উম্মতে মুহাম্মদী! তোমরা এমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন কর যে, তোমাদের গুনাহ্‌সমূহকে নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।"

যে চারটি মাসকে নির্বাচন করা হয়েছে, তা হচ্ছে, (১) রজব (২) যিলকদ (৩) যিলহজ্জ (৪) মুহর্‌রম।

বিশেষ মর্যাদাবান যে চারজন মহিলাকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন, (১) হযরত মারয়াম বিনতে ইমরান (২) হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, জগতের সকল মহিলার মধ্যে সর্বপ্রথম ইনিই আল্লাহ্ ও রাসূলের

প্রতি ঈমান এনেছেন। (৩) হযরত আছিয়া বিনতে মুযাহিম, তিনি ছিলেন ফেরআউনের স্ত্রী। (৪) হযরত ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি জান্নাতবাসীনী মহিলাদের সর্দার রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা।

যারা সকলের আগে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে— এক একজন সম্প্রদায় হতে এক একজন—সেই চারজন হচ্ছেন, (১) আরবদের মধ্য হতে সাইয়্যিদুনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (২) পারস্যদের মধ্য হতে হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ) (৩) রোমীয়দের মধ্য হতে হযরত সুহাইব রোমী (রাযিঃ) (৪) হাবশাবাসীদের মধ্য হতে হযরত বেলাল (রাযিঃ)

জান্নাত যাদের জন্য উদ্‌গ্রীব, তাদের মধ্য হতে এ চারজনকে নির্বাচন করা হয়েছে ঃ (১) হযরত আলী (রাযিঃ) (২) হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ) (৩) হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযিঃ) (৪) হযরত মিকদাদ ইব্‌নে আসওয়াদ (রাযিঃ)।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ৮ই যিলহজ্জে যে ব্যক্তি রোযা রাখলো, আল্লাহ্ তাকে হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর কঠিন রোগ-পরীক্ষায় ছবর করার সমতুল্য সওয়াব দান করবেন। আর যে ব্যক্তি আরাফার দিনে (৯ই যিলহজ্জে) রোযা রাখলো, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সওয়াবের ন্যায় সওয়াব দান করবেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, যখন আরাফার দিন উপস্থিত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রহমত বিস্তৃত করে দেন। এই দিনে যে পরিমাণ লোকদেরকে দোযখ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, অন্য কোনদিন তা হয় না। যে ব্যক্তি আরাফা'র এই দিনে রোযা রাখলো, তার গত বৎসর ও আগামী বৎসরের গুনাহ্ মাফ হয়ে গেল। (অর্থাৎ ছগীরা গুনাহ্ ; কবীরা গুনাহ্ মাফীর জন্য তওবা করতে হবে) আরাফা'র দিনের রোযার ওসীলায় গত ও আগামী এ দুই বছরের গুনাহ্ মাফ হওয়ার তাৎপর্য হলো, এ দিনটি দুই ঈদের মাঝখানে পড়েছে, মুসলমানদের জন্যে অত্যন্ত আনন্দের এ দু'টি দিন। এতে তাদের জন্যে গুনাহ্-মাফীর

চেয়ে অধিক আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে? আর আশূরার দিনের (১০ই মুহর্‌রম) আগমন ঘটে, দুই ঈদ অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর। তাই এ দিনে রোযার ওসীলায় গুনাহ্ মাফ হয় এক বৎসরের। আরেকটি কারণ হচ্ছে, আশূরা'র দিনটি হচ্ছে হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্য আর আরাফা'র দিনটি আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য। তাঁর বুযুর্গী সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের উপর। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অধ্যায় ঃ ১০৬

আশূরা' দিনের গুরুত্ব ও ফযীলত

[আশূরা বলতে মুহর্‌রম মাসের দশ তারিখকে বুঝায়]

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় পৌঁছার পর দেখতে পেলেন যে, ইহূদীরা আশূরা'র দিনটি রোযা রাখে। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বললো, এ দিনটিতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলকে ফেরআউনের বিরুদ্ধে জয়যুদ্ধ করেছিলেন। তাই শুক্‌রিয়া ও সম্মানার্থে এ দিনটিতে আমরা রোযা রাখি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমরা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের অধিক নিকটবর্তী।" অতঃপর তিনি উম্মতকে এ দিনে রোযা রাখতে হুকুম করলেন।

আশূরা'র দিনের ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কিত বহু রেওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। এই দিনে হযরত আদম (আঃ)-এর তওবা কবূল হয়, এই দিনেই তাঁকে সৃষ্টি করা হয় এবং এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে দাখেল করা হয়। আরশ, কুরসী, আসমান, যমীন, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জান্নাত এই দিনেই সৃষ্টি করা হয়। হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেন, আগুন থেকে এই দিনেই তিনি মুক্তি লাভ করেন। হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর উম্মত ফেরআউনের যুলুম-অত্যাচার থেকে চিরমুক্ত হন এবং ফেরআউন ও তার অনুচরবর্গ সমুদ্রে ডুবে ধ্বংস হয়। এ দিনেই হযরত ঈসা (আঃ) জন্মলাভ করেন, এই দিনেই তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়। এ দিনেই হযরত ইদ্রীস (আঃ)-কে উঁচু স্থানে (আসমানে) উঠানো হয়। এ দিনেই হযরত নূহ্ (আঃ)-এর জাহাজ জূদী পাহাড়ে এসে স্থির হয়, হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেট থেকে মুক্তি লাভ করেন। এ দিনেই হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বাদশাহী দেওয়া হয়। এ দিনেই হযরত ইয়াকূব (আঃ) চোখের জ্যোতি ফিরে পান। এ দিনেই

হযরত আইয়ূব (আঃ) জটিল রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেন। এ দিনেই সর্বপ্রথম আসমান থেকে যমীনে বৃষ্টিপাত হয়।

দশই মুহর্‌রম অর্থাৎ আশূরা'র দিনের রোযা পূর্বের উম্মতগণের মধ্যেও প্রসিদ্ধ ছিল। এমনকি বর্ণিত আছে যে, রমযানের পূর্বে আশূরা'র রোযা ফরয ছিল, অতঃপর রমযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পর আশূরা'র রোযার ফরযিয়ত রহিত হয়ে যায় এবং তা নফলে পরিণত হয়।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বেও এ রোযা রেখেছেন। মদীনা শরীফে তশরীফ আনয়ন করার পর তিনি এ রোযার বিষয় আরও গুরুত্ব ও জোর তাকীদ দেন এবং বলেছেন আগামী বৎসর আমি বেঁচে থাকলে মুহর্‌রমের ৯ ও ১০ তারিখে রোযা রাখবো। কিন্তু তিনি এ বৎসরই আল্লাহ্ তা'আলার পেয়ারা হয়ে গেছেন, ফলে ১০ই মুহর্‌রম ছাড়া অন্য তারিখে রোযা রাখা সম্ভব হয়ে উঠে নাই। অবশ্য এ ব্যাপারে তিনি উৎসাহিত করেছেন।

৯ ও ১০ই মুহর্‌রম সম্পর্কে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা দশই মুহর্‌রমের পূর্বের দিন এবং পরের দিন রোযা রাখ এবং এভাবে তোমরা ইহূদীদের বিপরীত কর। কেননা ইহূদীরা কেবল ১০ই মুহর্‌রমেরই রোযা রাখে।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) শো'আবুল-ঈমান কিতাবে রেওয়ায়াত করেছেন, আশূরা'র দিন যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের জন্য মুক্ত মনে প্রশস্ত হস্তে ব্যয় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা সারা বছর তার আয়-রোযগারে বরকত দিবেন।

আশূরা'র দিন সুরমা ব্যবহার করলে সে বৎসর সুরমা ব্যবহারকারী কোনরূপ চক্ষুরোগে আক্রান্ত হবে না এবং এ দিন গোসল করলে তার কোনরূপ অসুস্থতা দেখা দিবে না—এ হাদীসটি মওজূ' ও মনগড়া, হাকেম (রহঃ) পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই দিনে সুরমা ব্যবহার করা বিদ'আত। ইব্‌নে কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, সুরমা ব্যবহার করা, দানা (বীজ) ভাজা, তৈল ব্যবহার করা, খোশবূ ব্যবহার করা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ মিথ্যাচারী লোকদের মনগড়া ও বানোয়াট কথাবার্তা মাত্র।

এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, আশূরা'র দিন হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর উপর যা ঘটেছে, বস্তুতঃ তা ছিল হযরত হুসাইনের শাহাদাত ; যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাঁর মর্যাদা বুলন্দ হয়েছে, আহ্‌লে বাইতগণের মধ্যে অধিকতর উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর মুসীবতকে স্মরণকারী ব্যক্তি শুধু 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন' পড়বে। এতে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার অনুসরণ হবে এবং সেই সওয়াব নসীব হবে, যার ওয়াদা আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে করেছেন ঃ

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ○

"তাদের প্রতি বিশেষ বিশেষ করুণাসমূহ তাদের রব্বের তরফ হতে, এবং সাধারণ করুণাও। আর তাঁরাই এমন লোক, যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।" (বাকারাহ্ ঃ ১৫৭)

অতঃপর শিয়ারা যেসব অসঙ্গত ও বাজে বিষয়াদির প্রচলন ঘটিয়ে রেখেছে— যেমন মৃত ব্যক্তির গুণ–কীর্তন করে বিলাপ করা, শোক পালন করা ইত্যাদি। এসব বিষয় থেকে পুরাপুরিভাবে বেঁচে থাকবে। কেননা এসবে লিপ্ত হওয়া কোন ঈমানদার ব্যক্তির কাজ নয়। বস্তুতঃ এহেন কার্যকলাপ যদি আদৌ কল্যাণকর হতো, তাহলে হযরত হুসাইন (রাযিঃ)–এর মাতামহ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত উপলক্ষে প্রতি বছর এসব কার্য পালন করা জরুরী হতো, কেননা তিনিই ছিলেন এর জন্যে বেশী হকদার।

অধ্যায় ঃ ১০৭

মেহমানদারী বা অতিথি পরায়ণতা

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "মেহমান–অতিথির প্রতি মন সংকীর্ণ করে তাকে ঘৃণা করতে আরম্ভ কর না। কেননা, যে মেহমানকে ঘৃণা করলো, সে আল্লাহ্‌কে ঘৃণা করলো, আর যে আল্লাহ্‌কে ঘৃণা করলো, আল্লাহ্ তাকে ঘৃণা করেন।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "যার মধ্যে অতিথি–পরায়ণতা নাই তার মধ্যে কোনই কল্যাণ নাই।"

আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক বিত্তশালী লোকের নিকট উপস্থিত হয়ে কোথাও গমন করছিলেন। লোকটির প্রচুর সম্পদ ও গরু–ছাগলের পাল ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহ্‌মানী সে করে নাই। পরবর্তীতে জনৈকা স্ত্রীলোকের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন ; স্ত্রীলোকটি স্বল্প পরিমাণ ছাগলের মালিক ছিল। ছাগল যবেহ্ করে সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহ্‌মানী করলো। তখন তিনি বল্‌লেন ঃ "তোমরা এই দু' জনের আচরণে তারতম্য লক্ষ্য করেছ কি? বস্তুতঃ এ আখলাক ও উদার চরিত্র আল্লাহ্ তা'আলার খাছ দান; তিনি যাকে পছন্দ করেন, তাকেই এ নেয়ামত দান করেন।"

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত হযরত আবূ রাফে' (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মেহমানের আগমন হয়। তখন তাঁর ঘরে কিছু ছিল না। তিনি বল্‌লেন ঃ অমুক ইহূদীর নিকট গিয়ে বল, আমার মেহ্‌মান এসেছে ; রজব মাস পর্যন্ত সময়ের জন্য সে যেন আমাকে কিছু আটা ধার দেয়। ইহূদী বল্‌লো ঃ আমার কাছে অন্য কোন বস্তু বন্ধক না রাখলে আমি আটা ধার দিবো না। আমি হুযূরকে এ কথা জানালে পর তিনি

বল্লেন ঃ আল্লাহ্র কসম, আমি আসমানেও বিশ্বস্ত যমীনেও বিশ্বস্ত ; সে যদি (বিনা বন্ধকে) আমাকে ধার দিত, আমি অবশ্যই তা পরিশোধ করতাম। যাও, আমার যুদ্ধের এ বর্মটি নিয়ে তাঁর কাছে বন্ধক রেখে আটা ধার নিয়ে আস।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের চিরাচরিত অভ্যাস ছিল, যখনই তিনি আহার করতে ইচ্ছা করতেন, নিজের সঙ্গে আহারে শরীক করার জন্য মেহ্মানের তালাশে কখনও এক মাইল দুই মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে যেতেন। তাঁকে লোকেরা উপাধি দিয়েছিল 'আবূ-য্যাইফান' অর্থাৎ অতুলনীয় অতিথি-পরায়ণ। এটা তাঁর বিশুদ্ধতম নিয়ত ও অপরিসীম এখলাসেরই কল্যাণ যে, আজও পর্যন্ত তাঁর আবাসভূমি মক্কা মুকার্রমায় সেই অনুপম অতিথি-পরায়ণতা অব্যাহত রয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট প্রতি রাতে তিন থেকে দশ পর্যন্ত কখনও একশত পর্যন্ত অতিথি-মেহ্মানের সমাগম থাকতো। একটি রাতও মেহমান থেকে খালি যেতো না।

একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ঃ ঈমান কি? তিনি বলেছেন ঃ খানা খাওয়ানো এবং অধিক পরিমাণে সালামের প্রসার ঘটানো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুনাহ্-মাফী এবং আল্লাহ্র কাছে মর্তবা বুলন্দ হওয়ার জন্য এ পন্থা বলেছেন যে, "তোমরা লোকদেরকে খানা খাওয়াও, রাতে জেগে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড় যখন অন্যান্য লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কবূল হজ্জ কোন্টি? তিনি বলেছেন ঃ "যে হজ্জে লোকদেরকে খানা খাওয়ানো এবং হাস্যমুখে লোকদের সাথে কথা বলা রয়েছে।"

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন ঃ "যে ঘরে মেহ্মানের আগমন নাই, সে ঘরে ফেরেশতা আসে না।"

মোটকথা, খানার দাওয়াত ও আপ্যায়নের অনুকূলে অসংখ্য রেওয়ায়াত রয়েছে।

জনৈক আরবী কবি বলেন, যার সারমর্ম হচ্ছে ঃ "মেহ্মানের প্রতি আমার ভালবাসা কেন হবে না, তার আগমনে আমি কেন আনন্দিত ও

উল্লসিত হবো না? অথচ মেহমান আমার গৃহে উপস্থিত হয়ে সে নিজের রিযিকই আহার করে ; অধিকন্তু সে আমার কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে।"

পরিপক্ক জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান মনীষীদের উক্তি হচ্ছে—কারও প্রতিদান বা অনুগ্রহ তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে, যখন তা হৃষ্টচিত্তে হাসিমুখে ও মিষ্ট ভাষার মাধ্যমে হয়।"

জনৈক কবির বক্তব্য হচ্ছে, সওয়ারী থেকে অবতরণের পূর্বেই আমি আমার অতিথির মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলি ; তাকে আনন্দিত ও উৎফুল্ল করে তুলি অথচ আমার ঘরে তখন থাকে দুর্ভিক্ষ।"

দাওয়াত-দাতা মেজ্‌বানের উচিত, সে যেন নেক ও পরহেয্‌গার লোকদেরকেই আহ্‌বান করে। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا تَأكُلْ اِلَّا طَعَامَ تَقِيٍّ وَلَا يَأكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِيٌّ

"পরহেয্‌গার লোকের খাদ্য ছাড়া খেয়ো না এবং তোমার খাদ্যও পরহেয্‌গার লোক ছাড়া খেতে দিও না।" বিশেষভাবে অভাবী ও দরিদ্র লোকদেরকে আপ্যায়ন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক আপ্যায়নকারী মেজ্‌বানের জন্য এভাবে দো'আ করেছেন ঃ

اَكَلَ طَعَامَكَ الْاَبْرَارُ۔

"নেক ও সৎ লোকেরা তোমার খাদ্য আহার করুন।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى اِلَيْهَا الْاَغْنِيَاءُ دُوْنَ الْفُقَرَاءِ

"সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ওলীমা, ভোজ হচ্ছে যাতে শুধু ধনীদের দাওয়াত করা হয়, দরিদ্রদের করা হয় না।"

সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দাওয়াত হচ্ছে, যাতে আত্মীয়-পরিজনকেও দাওয়াত করা হয়। কেননা, এতে একদিকে যেমন আত্মীয়তার হক আদায় হয়, অপরদিকে তাদের সম্পর্কে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া থেকেও হেফাজত হয়। এমনিভাবে বন্ধুজন

ও পরিচিতজনদের মধ্যে তরতীব ও ক্রমিকতার প্রতিও লক্ষ্য রাখবে। কেননা, (একই মজলিসে বা অনুষ্ঠানে) কিছু লোকের বিশেষ আপ্যায়নে অবশিষ্টদের মনে কষ্ট প্রদান হয়।

এমনিভাবে মেজ্‌বানের আরও উচিত, গর্ব প্রকাশ ও সুনামের জন্য যেন আপ্যায়ন করা না হয় ; বরং নিয়ত হওয়া চাই—জনাব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের ইত্তেবা ও অনুকরণ এবং মুসলমান ভাইদের আনন্দ দান ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের লালন ও বৃদ্ধিকরণ। এমনি ভাবে যদি কারও পক্ষে দাওয়াত গ্রহণ করা মুশ্‌কিল হয়, তাকে যবরদস্তি করে বাধ্য করাও উচিত নয়। আর যে ব্যক্তির উপস্থিতি অন্যান্যদের জন্য অসহনীয় বা কোন কষ্টের কারণ হয়, তাদেরকেও একত্রে দাওয়াত করা উচিত নয়। কেবল এমন লোককেই দাওয়াত করা চাই যে স্বতঃস্ফূর্ত মনে তা কবূল করে।

হযরত সুফিয়ান (রহঃ) বলেন ঃ যদি কেউ এমন ব্যক্তিকে দাওয়াত করে, যে তা গ্রহণ করা অপছন্দ করে, তবে এর জন্য দাওয়াতকারী ব্যক্তি গুনাহ্‌গার হবে। এতদসত্ত্বেও যদি সে দাওয়াত কবূল করে নেয়, তবে দাওয়াতকারীর দু'টি গুনাহ্ হবে। কেননা, অপছন্দ করা সত্ত্বেও তাকে বাধ্যকরা হলো। আল্লাহ্-ভীতিপরায়ণ লোকদের আপ্যায়ণ করা মূলতঃ ইবাদতে তাদের শক্তি-যোগান ও সহযোগিতা করা, পক্ষান্তরে, অবাধ্য লোকদের খাওয়ানোর অর্থ হলো, না-ফরমানী ও পাপকার্যে তাদের সাহায্য করা।

জনৈক দর্জি ব্যক্তি হযরত ইব্‌নে মুবারক (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছেঃ আমি রাজা-বাদশাহ্‌দের পোষাক তৈরী করে দিই, এতে আমিও কি তাদের জুলুম-অত্যাচারের গুনাহের ভাগী হবো? তিনি বল্‌লেন ঃ কি বলছ? জালেমের গুনাহের ভাগী তো সে, যে তোমার কাছে সুই, সূতা ইত্যাদি সেলাই-কাজের উপাদান বিক্রি করে, আর তুমি নিজেই জালেম। দাওয়াত কবূল করা সুন্নতে মুআক্কাদাহ্। আবার ক্ষেত্র বিশেষে তা ওয়াজিবও হয়।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "ছাগলের একটি পায়া দ্বারাও যদি আমাকে আপ্যায়ন করা হয়, কিংবা আমাকে যদি ছাগলের একটি হাতের অংশও হাদিয়া দেওয়া হয়, আমি তা কবূল করবো।"

অধ্যায় ঃ ১০৮

জানাযা, কবর ও কবরস্থান

জেনে রাখ—জানাযা প্রকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকের জন্য বড় একটা শিক্ষণীয় বিষয়, আর যারা দ্বীন ও আখেরাতের চিন্তা-চেতনার বিষয়ে গাফেল ও উদাসীন, তাদেরকে মৃত ব্যক্তির এই জানাযা মৃত্যু, মৃত্যুর পরবর্তী সকল অবস্থা ও আখেরাতের বিষয় স্মরণ করিয়ে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু আফসূস, আজকাল অন্তরসমূহ এতো কঠিন হয়ে গেছে যে, অসংখ্য জানাযা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও সতর্ক হওয়া তো দূরের কথা, বরং মনের কাঠিন্য উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, তারা চিরকাল কেবল অন্যদেরই জানাযা দেখতে থাকবে, কিন্তু নিজেদেরও যে শীঘ্রই জানাযার খাটলিতে শুতে হবে, এ ধ্যান-খেয়াল কারও হয় না। অথচ প্রকৃত বাস্তব সত্য যা কাউকে ক্ষমা করবে না তা হচ্ছে, এক সময় অবশ্যই এমন এসে উপস্থিত হয়ে পড়বে, যখন তাদের এহেন সকল গর্ব-গুমান ভণ্ডুল প্রতীয়মান হবে। কেননা আজকে যাদের জানাযা চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, একদিন তারাও ঠিক এমনি ধরণের দম্ভ-অহমে লিপ্ত ছিল, কিন্তু কই— আজকে তাদের এ অবস্থা কেন? সুতরাং প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য যে, যখনই কোন জানাযা দেখবে, তখন মনে করবে যে, এটি আমারই জানাযা ; কেননা, ঠিক এরূপই আমার জানাযাও তৈরী হতে দেরী নাই, আজ না হোক কাল, না হয় পরশু আমার মৃতদেহও এভাবে খাটলিতে করে বহন করে কবরস্থানে নিয়ে দাফন করা হবে।

বর্ণিত আছে, হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) যখনই কোন জানাযা দেখতেন, তখনই বলতেন ঃ "চল, আমিও পিছনে পিছনে আসছি।"

হযরত মাকহূল দিমাশ্কী (রহঃ) জানাযা দেখেই বলতেন ঃ "চল, আমিও আসছি ; হায়! কত বড় শিক্ষা, কিন্তু এরই পাশাপাশি দ্রুত গাফলত ও উদাসীনতাই আমাদের ধ্বংস করে দিচ্ছে ; আগের জন চলে গেল অথচ পরবর্তী জনের কোনই চেতনা নাই।"

হযরত উসাইদ ইব্‌নে হুযাইর (রাযিঃ) বলেন ঃ "যখনই আমি কোন জানাযায় শরীক হয়েছি, আমার মনে একই প্রশ্ন বারবার জাগতে থাকে যে, কি হলো, এ মৃতের সাথে আরো কিরূপ ব্যবহার করা হবে?"

হযরত মালেক ইব্‌নে দীনার (রহঃ)–এর ভাইয়ের ইনতেকাল হলে তার জানাযার পিছনে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বের হলেন এবং বলতে থাকলেন যে, আল্লাহ্‌র কসম, আমার চক্ষু জুড়াবে না যে পর্যন্ত জানতে না পারবো যে, তুমি কোন্ দিকে যাচ্ছ, আর যতক্ষণ আমি যিন্দা ততক্ষণ তা জানতে পারবো না।"

হযরত আ'মাশ (রহঃ) বলেন ঃ "আমরা জানাযার পিছনে পিছনে যেতাম– তখন সকলেই দুঃখ–ভারাক্রান্ত থাকতাম ; কেউ বুঝতে পারতাম না যে, কে কাকে সান্ত্বনা দিবে।"

হযরত ছাবেত বুনানী (রহঃ) বলেন ঃ আমরা জানাযার পিছনে যেতাম—তখন প্রত্যেকেই বস্ত্র–খণ্ডে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকতো।"

এ ছিল তাঁদের অবস্থা ; তাঁদের অন্তরে মৃত্যুর ভয়, আখেরাতের চিন্তা। কিন্তু আফসূস! আমাদের অবস্থা এই যে, জানাযার পিছনে পিছনে আমরা যাই ; আর অধিকাংশই আমরা হাসতে থাকি, বেহুদা কথা বলতে থাকি, মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আলাপ–আলোচনায় মত্ত থাকি, আত্মীয়–স্বজনেরা কে কিভাবে কোন্ প্রক্রিয়ায় তার সম্পত্তি পেতে পারে— এসব বিষয় চিন্তা–ধান্দায় মগ্ন হয়ে যায়। অনতি পরেই যে নিজের জানাযাও ঠিক এরূপে আসছে, সে বিষয়ে কেউ চিন্তা করে না— তবে যাকে আল্লাহ্ পাক তওফীক দেন সে ব্যতিক্রমভুক্ত। বস্তুতঃ এহেন গাফলত ও উদাসীনতার কারণ হচ্ছে অধিক পাপাচার ও অবাধ্যতা। যার ফলে অন্তরসমূহ প্রস্তরসম কঠিন হয়ে গেছে ; অহেতুক কার্যকলাপে জীবনপাত হচ্ছে। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে এহেন ধংসাত্মক গাফলত থেকে হেফাজত করুন।

জানাযার পিছনে অনুসরণের সময় উত্তম হলো, অনুচ্চ আওয়াজে মনের গভীরতায় কাঁদতে থাকা। মানুষ যদি আপন জ্ঞান–বুদ্ধি দ্বারা কাজ নিতো, তবে এই করুণ মুহূর্তে সে মৃতের জন্যে না কেঁদে নিজের উপরেই কাঁদতো— হায় জানিনা আমার কি দশা হয়!

হযরত ইব্‌রাহীম যাইয়্যাত (রহঃ) একদা লক্ষ্য করলেন, কিছু লোক জনৈক মৃতের উপর কাঁদাকাটি করছে। তিনি বললেন ঃ ওহে! তোমরা তার উপর কাঁদছো? না ; বরং নিজেদের উপর কাঁদো, সে তো তার ভয়ানক তিনটি ঘাঁটি পার হয়ে গেছে ; মালাকুল–মওত তথা মৃত্যুর ফেরেশতার চেহারা দর্শন, মৃত্যুর যন্ত্রণা, আর পরিণাম ফলের ভয়।

হযরত আবূ আমর ইব্‌নে আলা (রহঃ) বলেন ঃ "আমি হযরত জরীর (রহঃ)–এর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি কাউকে কবিতার এক–দুটি পংক্তি লিখাচ্ছিলেন ; এমন সময় তাঁর সম্মুখ দিয়ে জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল; তৎক্ষণাৎ তিনি থেমে গেলেন আর বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, এসব জানাযা আমাকে পূর্বাহ্নেই বৃদ্ধ করে দিয়েছে, অতঃপর নিম্নের এ পংক্তিগুলো পাঠ করলেন ঃ

تَرُوِّعُنَا الْجَنَائِزُ مُقْبِلَاتٍ

وَنَلْهُو حِيْنَ تَذْهَبُ مُدْبِرَاتٍ

"জানাযার খাটলি সম্মুখপানে ধাবমান হয়ে আসে, আর আমাদের ভীত–সন্ত্রস্ত করে তুলে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তা যখন দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়, আমরা গাফেল–উদাসীন হয়ে যাই।"

كَرَوْعَةِ ثُلَّةٍ لِمَغَارِ ذِئْبٍ

فَلَمَّا غَابَتْ عَادَتْ رَاتِعَاتٍ

"ব্যাঘ্রের হুংকার ও আক্রমণের ভয়ে লোকেরা আতংকিত হয়, কিন্তু তা কেটে গেলে পর সেই পূর্ববৎ গাফলত ও নিশ্চিন্ত অবস্থা!"

জানাযায় উপস্থিত ও শরীক হওয়ার সময় উচিত হলো— গভীর ধ্যান ও চিন্তা করবে, বিনয় ও অবনত মস্তকে পিছনে পিছনে অনুসরণ করবে যেরূপ ফেকাহ–গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। মৃতব্যক্তি ভাল–মন্দ যেরূপ লোকই হোক না কেন তুমি তার সর্বাবস্থায় সুধারণা পোষণ করবে, নিজের ব্যাপারে কুধারণা রাখবে এবং সর্বদা আশংকা বোধ করবে ; যদিও বাহ্যতঃ তোমার

অবস্থা ভাল বোধ হয়। কারণ, জানা নাই তোমার শেষ পরিণতি কি হবে– প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত কিছু বলতে পারে না।

হযরত উমর ইব্‌নে যর (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তার জনৈক প্রতিবেশী মৃত্যুবরণ করে। কর্মজীবনে সে অসৎ লোক ছিল বিধায় কিছু লোক তার জানাযা থেকে পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু ইব্‌নে যর (রহঃ) তার জানাযায় শরীক হন। যখন তাকে কবরে রাখা হয়, তখন তিনি কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন ঃ "ওহে অমুকের পিতা! আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি রহম করুন— তুমি আল্লাহ্‌র তওহীদ ও একত্বে বিশ্বাসী ছিলে, সেজদায় মুখমণ্ডল ধূলায়িত করেছো ; যদিও লোকেরা বলে, তুমি পাপী ; কিন্তু পাপী আমাদের মধ্যে কে নয়। (বস্তুতঃ কেউ নিজের পরিত্রাণের বিষয় নিশ্চিন্ত হতে পারে না।)

কথিত আছে, বসরার কোন এক অঞ্চলে জনৈক দুষ্ট ও উশৃংখল প্রকৃতির লোক মারা যায়। তার জানাযা উঠানোর জন্য একজন লোকও সাহায্যকারী পাওয়া যায় নাই। কেননা, তার দুশ্চরিত্রের কারণে কেউ কোনদিন তার খোঁজ–খবর রাখে নাই ; এখন মৃত্যুর পর তার জানাযা উঠানোর বিষয়েও কারও কোন সদিচ্ছা বা আগ্রহ নাই। একমাত্র তার স্ত্রীই ছিল ব্যবস্থাপক। স্ত্রী দুজন শ্রমিকের মাধ্যমে জানাযা ময়দানে নিয়ে যায়, কিন্তু সেখানে কেউ তার নামাযে উপস্থিত হলো না। অবশেষে স্ত্রী তাকে দাফন করার জন্য বিজন মরুভূমিতে নিয়ে যায়। সেখানে অদূরেই একটি পাহাড়ের উপর ছিলেন একজন ইবাদত–গুযার আল্লাহ্‌র ওলী–বুযুর্গ। তিনি দেখলেন, জানাযা প্রস্তুত। নামাযের উদ্দেশ্যে তিনি পাহাড় থেকে নেমে আসলেন। তৎক্ষণাৎ গোটা শহরে খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, অমুক বুযুর্গ অমুক ব্যক্তির জানাযা পড়ার জন্য পাহাড় থেকে নেমে এসেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই অসংখ্য শহরবাসীরা এসে উপস্থিত হয়ে গেল। তিনি সকলকে নিয়ে সেই লোকের জানাযা পড়লেন। লোকেরা অবাক বিস্ময়ে নিশ্চল হয়ে গেছে যে, একজন ফাসেক ও দুরাচারী লোকের জানাযা তিনি পড়লেন! তাদের এ বিস্ময়ের জবাবে বুযুর্গ বলেছেন ঃ "আমাকে স্বপ্নযোগে বলা হয়েছে যে, তুমি অমুক স্থানে যাও ; সেখানে একটি জানাযা দেখবে, মৃতব্যক্তির স্ত্রী ছাড়া তার সাথে আর কেউ থাকবে না। তুমি সে লোকটির জানাযার নামায পড়ে

দাও, কেননা আল্লাহ্‌র দরবারে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।" লোকেরা এ কথা শুনে আরও বিস্মিত হয়ে গেল। অতঃপর সেই বুযুর্গ স্ত্রীলোকটিকে উপস্থিত করে তার স্বামীর আমল সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বললো ঃ আমার স্বামী নামকরা মদ্যপায়ী লোক ছিল, প্রায় সময়েই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে থাকতো। বুযুর্গ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার জানা মতে তার কোন নেক আমল ছিল কি? সে বললো ঃ তিনটি বিষয় তার মধ্যে ছিল ঃ এক. প্রতিদিন সকালে নেশা–অবস্থা থেকে হুঁশে এসেই কাপড়–চোপড় বদলিয়ে উযূ করে জামাআতের সাথে ফজরের নামায আদায় করতো। দুই. তার ঘরে সর্বদা এক–দুইজন এতীম অবশ্যই থাকতো, যাদেরকে সে নিজের সন্তানের চেয়ে বেশী ভালবাসতো ; যখনই তারা এদিক–সেদিক চলে যেতো সে অস্থির হয়ে তাদেরকে তালাশ করে বের করতো। তিন. রাতের অন্ধকারে মাঝে–মধ্যে মদমত্ততা থেকে নিস্কৃত হয়ে সে কাঁদতো আর বলতো ঃ "আয় আল্লাহ্! আমার মত এই জঘন্য পাপী ও দুরাচারীকে দিয়ে তুমি জাহান্নামের কোন্ কোণাটুকু ভরবে?" এই প্রশ্নোত্তরে সকলের কাছেই বিষয়টুকু খুলে গেল এবং সেই বুযুর্গও সেখান থেকে চলে গেলেন।

হযরত যাহ্হক (রহঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করেছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বাপেক্ষা দুনিয়াত্যাগী কে? তিনি বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কবর এবং কবরস্থিত আযাবের কথা কখনও বিস্মৃত হয় না, পার্থিব সাধ–অভিলাষ সম্পূর্ণ বর্জন করে চলে, চিরস্থায়ী জীবনকে ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, আগত পরবর্তী মুহূর্তটিরও কোন আশা–ভরসা করে না এবং নিজকে সর্বদা কবরবাসীদের একজন বলে গণ্য করে।"

হযরত আলী (রাযিঃ)–কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কি ব্যাপার—আপনি কবরবাসীদের প্রতিবেশী হয়ে গেছেন ; কেবল সেখানেই পড়ে থাকেন? তিনি বললেন ঃ আমি তাদেরকে অতি উত্তম ও সৎ প্রতিবেশী রূপে পেয়েছি– তারা সম্পূর্ণ নির্বাক ; অথচ আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

হযরত উসমান (রাযিঃ) কোন কবরের পার্শ্বে দাঁড়ালেই কাঁদতে আরম্ভ করতেন, এমনকি তাঁর দাড়ি মোবারক ভিজে যেতো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে— জান্নাত ও জাহান্নামের কত আলোচনাই তো আপনি করেন, কিন্তু

তখনও আপনাকে এরূপ কাঁদতে দেখা যায় না ; অথচ কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়েই আপনি অনবরত কাঁদতে থাকেন? তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কবরই হচ্ছে আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল, যদি এই প্রথম মঞ্জিলে মানুষ মুক্তি পেয়ে যায়, তবে পরবর্তী মঞ্জিলগুলো তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আর যদি এখানে তার মুক্তি না হয়, তবে পরবর্তী সবগুলো মঞ্জিল তার জন্য আরও কঠিনতর হবে।"

বর্ণিত আছে, হযরত আমর ইব্নে আস (রাযিঃ) একদা একটি কবরস্থান দেখে সওয়ারী থেকে নেমে গেলেন এবং দুই রাকআত নামায আদায় করলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো— ইতিপূর্বে এরূপ করতে আপনাকে আর কখনও দেখি নাই ; এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ "কবরবাসীদের আমি দেখলাম, তাদের এবং আল্লাহ্র মাঝখানে কোন অন্তরায় নাই, কাজেই দুই রাকআত নামাযের মাধ্যমে আমিও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে ব্রতী হলাম।"

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ "সর্বপ্রথম আদম-সন্তানের সাথে তার গর্ত (কবর) কথা বলে। সে বলে— আমি (বিষাক্ত) সাপ-বিচ্ছুর ঘর, আমি নির্জন একাকীত্বের ঘর, আমি অপরিচিত-অচেনা ঘর, আমি ঘোর অন্ধকার ঘর ; আমি তোমার জন্য এগুলোই প্রস্তুত রেখেছি, বল— তুমি কি প্রস্তুত করে এনেছো?

হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ) বলেন ঃ "আমি কি তোমাদেরকে আমার সর্বাপেক্ষা অসহায়ত্ব ও মোহ্তাজীর দিনটি বলবো? সে দিনটি হচ্ছে, যে দিন আমাকে কবরে রাখা হবে।"

অধ্যায় ঃ ১০৯

দোযখ-আযাবের ভয়

সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দো'আখানি বেশী বেশী করতেন ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আমাদের রব্ব! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন।" (বাকারাহ্ ঃ ২০১)

মুসনাদে আবূ ইয়া'লা কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবার মধ্যে বলেছেন ঃ ওহে লোক সকল! তোমরা বিরাট দুটি বিষয় অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নামের কথা কখনও ভুলো না। এ কথা বলে তিনি এতো কাঁদলেন যে, তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলের উভয় পাশ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। অতঃপর আরও বললেন ঃ কসম সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা যদি জানতে আমি যা জানি, তবে আবাদি ছেড়ে তোমরা বিজন এলাকায় ছুটে পালাতে এবং ভয়ে-আতংকে দিশাহারা হয়ে আপন আপন মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করতে।

ত্ববরানী আওসাতে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এমন এক সময় উপস্থিত হলেন, যখন তিনি ইতিপূর্বে কখনও উপস্থিত হন নাই। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত অগ্রসর হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে জিব্রাঈল! আপনার কি হয়েছে, আপনাকে এরূপ বিবর্ণ দেখা যাচ্ছে কেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা দোযখের

অগ্নি উত্তপ্ত করার হুকুম দিয়েছেন, তারপরেই আমি আপনার নিকট এসে হাজির হলাম। নবীজী বললেন ঃ দোযখের কিছু বিবরণ আপনি আমাকে শুনান। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা দোযখকে উত্তপ্ত হওয়ার হুকুম করলে সে এক হাজার বছর পর্যন্ত উত্তপ্ত হতে থাকে। ফলে, দোযখের অগ্নি শুভ্র বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর আবার হুকুম করলেন। এবারও এক হাজার বছর জ্বলতে থাকে। ফলে সে লাল বর্ণে রূপান্তরিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় দোযখকে আরও উত্তপ্ত হওয়ার হুকুম করেন। অতএব দোযখের অগ্নি আরও এক হাজার বছর জ্বলতে থাকে। পরিশেষে এ আগুন অন্ধকার কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে। বর্তমানে সেই আগুনের অবস্থা এই যে, এর স্ফুলিঙ্গের কোন শেষ নাই এবং এর লেলিহানেরও কোন অবধি নাই। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঐ পবিত্র সত্তার কসম খেয়ে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন— সুইয়ের ফুটো পরিমাণ অংশও যদি দোযখের ছিদ্র হয়ে যায়, তবে জগতের সমস্ত মানুষ ভয়ে আতংকে মরে যাবে। ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন, দোযখের প্রহরীদের একজনও যদি দুনিয়াবাসীর সম্মুখে প্রকাশ পায়, তবে সমগ্র দুনিয়াবাসী এর ভয়ে মৃত্যুবরণ করবে। ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন, দোযখের শিকলসমূহের এমন একটিও যদি দুনিয়ার পাহাড়–পর্বতের উপর রাখা হয় যার উল্লেখ পবিত্র কুরআনে করা হয়েছে, তবে পাহাড়সমূহ বিগলিত হয়ে যাবে আর শিকলটি যমীনের সর্বশেষ সীমানায় গিয়ে থেমে যাবে। নবীজী বললেন ঃ হে জিবরাঈল! ক্ষান্ত হও, আর বলো না ; মনে হচ্ছে যেন আমার অন্তর ফেটে যাবে ; আর আমি এখনই মৃত্যুবরণ করবো। এ কথা বলে নবীজী হযরত জিবরাঈলের প্রতি তাকিয়ে দেখলেন— তিনি কাঁদছেন। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কাঁদছেন, অথচ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আপনার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। জিবরাঈল (আঃ) আরজ করলেন, আমি কেন কাঁদবো না, আমার তো আরও বেশী পরিমাণে কাঁদা উচিত। কেননা, আল্লাহ্‌র কাছে যদি আমার বর্তমান অবস্থার স্থলে অন্য কোন অবস্থা হয়ে থাকে, তবে আমার কি উপায় হবে, তা আমি জানি না। আমি জানি না— ইবলীসের উপর যেভাবে বিপদ এসেছে, সেরূপ আমার উপরও এসে

পতিত না হয়, অথচ সেও ফেরেশতা ছিল। জানি না— হারূত ও মারূতের উপর যেভাবে আপদ এসেছে, আমার উপরও সেরূপ এসে না পড়ে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদতে লাগলেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ)-ও কাঁদতে লাগলেন, এভাবে উভয়ই কাঁদতে থাকলেন। এমন সময় গায়েব থেকে আওয়াজ আসলো— হে জিবরাঈল! হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের উভয়কে তাঁর নাফরমানী ও অবাধ্যতা থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ করে দিয়েছেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) ঊর্ধ্বজগতে চলে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহ থেকে বাইরে তশরীফ আনলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন, কয়েকজন আনসারী সাহাবী ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত রয়েছেন। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে নবীজী বললেন ঃ তোমরা হাসি-ঠাট্টা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মগ্ন রয়েছ, অথচ তোমাদের মাথার উপর রয়েছে জাহান্নাম, আমি যা জেনেছি তোমরা যদি তা জানতে, তবে খুবই কম হাসতে এবং অধিক মাত্রায় ক্রন্দন করতে, খাওয়া-দাওয়া তোমাদের কাছে ভাল লাগতো না এবং নির্জন ও উজাড় জঙ্গলে আল্লাহ্র তালাশে তোমরা বের হয়ে যেতে। এমন সময় অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো— হে মুহাম্মদ! আমার বান্দাদেরকে নিরাশ করো না, তোমাকে সুসংবাদ প্রদানকারীরূপে পাঠিয়েছি, হতাশ করার জন্য নয়।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "তোমরা সকলে মধ্য ও সঠিক পথের পথিক হয়ে যাও এবং হক ও সত্য থেকে দূরে সরে যেও না।"

বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছেন ঃ হে জিবরাঈল! আমি হযরত মিকাঈলকে কখনও হাসতে দেখি নাই ; এর কারণ কি? তিনি বললেনঃ যখন থেকে দোযখ বানানো হয়েছে, তখন থেকেই হযরত মীকাঈলের হাসি বন্ধ হয়ে গেছে।"

ইব্‌নে মাজাহ্ ও হাকেম (রহঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, তোমাদের দুনিয়ার এ আগুনের তাপ দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। পরন্তু এটাকে যদি আরও দু'বার পানি দিয়ে ধৌত করা না হতো, তবে সেটা তোমাদের ব্যবহারযোগ্য হতো না। তদুপরি এ আগুন আল্লাহ্র কাছে দো'আ করে,

যেন পুনরায় এর মধ্যে আর উত্তাপ না আসে।”

বায়হাকী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রাযিঃ) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ

“যখনই একবার তাদের চর্ম জ্বলে যাবে, তৎক্ষণাৎ আমি তাদের পূর্ব–চর্মের স্থলে অন্য চর্ম সৃষ্টি করে দিবো, যেন তারা আযাবই ভোগতে থাকে।” (নিসা ঃ ৫৬) অতঃপর তিনি হযরত কা'ব (রাযিঃ)–কে বললেনঃ আপনি এ আয়াতের ব্যাখ্যা করুন। যদি সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারেন, তবে আমি তা সমর্থন করবো, অন্যথায় প্রত্যাখ্যান করবো। হযরত কা'ব (রাযিঃ) ব্যাখ্যা করলেন যে, আদম–সন্তানের চর্ম প্রতিদিন ছয় হাজার বার জ্বালানো হবে এবং প্রতিবারই নতুন চর্ম সৃষ্টি করে নেওয়া হবে। হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন ঃ আপনি সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন ; আমি সমর্থন করি।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) উক্ত আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ “দোযখের আগুন তাদেরকে প্রতিদিন সত্তর হাজার বার খেয়ে ভস্মীভূত করবে ; প্রতিবার বলা হবে— পূর্বানুরূপ হয়ে যাও। বার বার এমনি হবে এবং এভাবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

দুনিয়ার সর্বাধিক সুখী–স্বচ্ছন্দ পাপাচারী দোযখী একজন মুসলমানকে এনে জাহান্নামের ভিতর একটা চুবানি দিয়ে আনা হবে। তারপর তাকে প্রশ্ন করা হবে, হে আদমের সন্তান! জীবনে কখনও সুখ–সাচ্ছন্দ্য দেখেছিলে? সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, কখনও দেখি নাই। অতঃপর দুনিয়াতে সর্বাধিক দুঃখ–কষ্টপ্রাপ্ত একজন বেহেশতীকে এনে তাকেও জাহান্নামের ভিতর একটা চুবানি দিয়ে আনা হবে। অতঃপর প্রশ্ন করা হবে ঃ জীবনে কখনও কোন কষ্ট দেখেছো? সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, কখনও দেখি নাই।

ইব্‌নে মাজাহ্ (রহঃ) রেওয়ায়াত করেন ঃ দোযখীদের মধ্যে ক্রন্দনরোল সৃষ্টি হবে। কাঁদতে কাঁদতে তাদের অশ্রুজল নিঃশেষ হয়ে চক্ষুযুগল হতে রক্ত ঝরতে থাকবে। এতে তাদের চেহারার ভিতর গর্তের মত হয়ে যাবে, যাতে নৌকা চালাতে চাইলে তা–ও সম্ভব হবে।

হযরত আবূ ইয়া'লা (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা কাঁদ, কাঁদতে না পারো তো কাঁদার ভাব-আকৃতি ধারণ কর। কেননা, দোযখীরা আগুনের ভিতর কাঁদতে থাকবে ; অশ্রুজল তাদের গণ্ডদেশে প্রবাহিত হবে যেমন নদীর পানি প্রবাহিত হয়। অবশেষে তাদের অশ্রুজল নিঃশেষ হয়ে যাবে অতঃপর তারা রক্তের অশ্রু প্রবাহিত করবে এবং তাদের চোখে (বড় বড়) খাদ পড়ে যাবে।

অধ্যায় ঃ ১১০

মীযান-পাল্লা ও পুলসিরাত

আবূ দাঊদ শরীফে হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আয়েশা! তুমি কাঁদছো কেন? হযরত আয়েশা বললেন ঃ আমার দোযখের কথা মনে পড়েছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেদিন আপনি আপনার স্ত্রী-পরিজনের কথা কি স্মরণ করবেন? হুযূর বললেন ঃ সেদিন তিন জায়গায় তো কারুরই কারো কথা স্মরণ থাকবে না ঃ ১. যখন মীযান-পাল্লা স্থাপন করতঃ আমলের পরিমাপ করা হবে, মানুষ ভীতি-বিহ্বল থাকবে যে, তার নেকীর পাল্লা ভারী হবে নাকি বদীর পাল্লা। ২. আমলনামা বিতরণের সময়, তা ডান হাতে আসে নাকি বাম হাতে অথবা পিছন দিক থেকে। ৩. পুলসিরাত পার হওয়ার সময়, যা জাহান্নামের উপর স্থাপিত ; যতক্ষণ পর্যন্ত সে জানতে না পারবে যে, পার হতে পারবে কিনা জাহান্নামে কেটে পড়ে যাবে।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত, হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেছি— ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য কি আপনি কিয়ামতের দিন শাফাআত করবেন? তিনি বললেন ঃ"ইনশাআল্লাহ্ করবো।" আমি আরজ করলাম ঃ সেদিন আপনাকে আমি কোথায় তালাশ করবো? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমাকে পুলসিরাতের নিকট তালাশ করো। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনাকে পুলসিরাতের নিকট না পাই? তিনি বললেন ঃ তাহলে মীযান-পাল্লার নিকট যেয়ো। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ যদি মীযান-পাল্লার নিকটেও না পাই? তিনি বললেন ঃ তাহলে আমাকে হাউজে-কাউসারের নিকট তালাশ করো। আমি এই তিন জায়গার যেকোন একটিতে অবশ্যই থাকবো।

হাকেম (রহঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, কিয়ামতের দিন মীযান-পাল্লা রাখা হবে। যদি সমগ্র আসমান-যমীনও এতে রাখা হয়, তবে তা রাখা সম্ভব। ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করবেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! এতে কার ওজন করা হবে? আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে আমি যার ইচ্ছা তার ওজন করবো। তখন ফেরেশতাগণ বলবেন ঃ

سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

"হে আল্লাহ্! আপনি অনন্ত পবিত্র আপনার হক আদায় করে আমরা কিছুই ইবাদত করতে পারি নাই।"

হযরত ইব্নে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন ঃ দোযখের পৃষ্ঠ বরাবর পুলসিরাতকে স্থাপন করা হবে। তলোয়ারের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও ধারালো হবে। পা পিছলিয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হবে। পরন্তু অগ্রভাগ বাঁকানো আঁকড়া তথা লোহার শলাকা হবে, যা দিয়ে সে ছোঁ মেরে আটকিয়ে নিবে। অনেকেই তাতে পড়ে যাবে। আবার অনেকে ভিতরে পড়ে যাওয়ার আতংক সহকারে বিদ্যুৎগতিতে পার হয়ে যাবে, অনুরূপ অনেকে ঝঞ্ঝাবাত্যার গতিতে, অনেকেই অশ্বের গতিতে, অনেকে দৌড়িয়ে, আবার অনেকে হাটার গতিতে পার হয়ে যাবে। অবশেষে একজন আসবে, আগুন যাকে স্পর্শ করেছে এবং দোযখের শাস্তি কিছুটা সে আস্বাদন করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আপন দয়া ও অনুগ্রহে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। অতঃপর তাকে বলবেন ঃ তুমি আমার কাছে চাও ; আবদার কর। সে বলবে, পরওয়ারদিগার! আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন, অথচ আপনি সারা জাহানের রব্ব! আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি চাও ; আব্দার কর (আমি দিবো)। অতঃপর সে বহু আশা-আকাংখা ও আব্দার পেশ করবে। সব যখন তার শেষ হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তুমি যা কিছু চেয়েছ, সে সঙ্গে আরও সেই পরিমাণ তোমাকে দেওয়া হলো।

মুসলিম শরীফে হযরত উম্মে মুবাশশির আনসারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি হযরত হাফসা (রাযিঃ)-কে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, সাহাবীগণের যারা বৃক্ষের নীচে 'বাইয়াতে রিদওয়ানে' ছিলেন, তাদের কেউ ইনশাআল্লাহ্ দোযখে

যাবেন না। হযরত হাফসা বললেন ঃ তবে কুরআনের এ আয়াত?

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا

"আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নাই, যে তা অতিক্রম করবেনা।" (মারয়াম ঃ ৭১)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ পরবর্তী আয়াতেই ইরশাদ হয়েছে ঃ

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ○

"অতঃপর আমি সেই সকল লোককে নাজাত করে দিবো, যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করতো এবং জালেম লোকদেরকে নতজানু অবস্থায় তাতে ছেড়ে দিবো। (মারইয়াম ঃ ৭২)

'মুসনাদে আহমদ' কিতাবে রয়েছে যে, 'দোযখ অতিক্রম করা'র বিষয়টিতে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন ঃ মুমিনদের জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন ঃ তা সকলেরই অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করেছে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নাজাত করে দিবেন।

হযরত জাবের (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন ঃ "তোমাদের সকলকেই তাতে যেতে হবে" ; এ কথা বলার সময় তিনি আপন কর্ণদ্বয়ের প্রতি অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করে বুঝাচ্ছিলেন যে, এ কথা যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট স্বকর্ণে না শুনে থাকি, তবে যেন আমি বধির হয়ে যাই। তিনি বলেন ঃ আয়াতে উল্লেখিত 'ওরূদ' অর্থ প্রবেশ করা ; সুতরাং নেক বান্দা কিংবা না-ফরমান বান্দা সকলেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তবে মুমিনদের জন্যে তা আরামদায়ক ও সুশীতল হয়ে যাবে, যেমন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর জন্য হয়েছিল। এমনকি তাদের এই আরামপ্রদ শীতলতার কারণে জাহান্নাম এই বলে আওয়াজ করবে ঃ

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ○

"অতঃপর আমি সেই সকল লোককে নাজাত করে দিবো, যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করতো, আর সীমালংঘনকারীদেরকে নতজানু অবস্থায় তাতে ছেড়ে দিবো।" (মারইয়াম ঃ ৭২)

হাকেম (রহঃ) বলেন ঃ লোকেরা (সুশীতল ও আরামদায়ক অর্থে) দোযখে প্রবেশের পর নিজ নিজ আমলের অনুপাতে অনেকেই বিদ্যুতের গতিতে, অনেকেই ঝঞ্ঝাবাত্যার গতিতে, অনেকেই অশ্বের গতিতে, অনেকেই সওয়ারীর গতিতে, অনেকেই দৌড়ের গতিতে, অনেকেই হাটার গতিতে বের হয়ে আসবে।

অধ্যায় ঃ ১১১

রাসূলুল্লাহ্‌র ওফাত

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত নিকটবর্তী হয়, তখন আমরা উম্মুল-মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর ঘরে উপস্থিত হলাম। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি দৃষ্টি করলেন। আমরা লক্ষ্য করলাম যে, তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তিনি বললেন ঃ খোশ আমদেদ ; মোবারকবাদ ! আল্লাহ্‌ তোমাদের হায়াত দরায করুন, তোমাদের আশ্রয় দান করুন, সাহায্য করুন। আমি তোমাদেরকে ওসীয়ত করছি— সর্বদা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ; তাকওয়া এখতিয়ার কর। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমি ভীতিপ্রদর্শকরূপে প্রেরিত ; তোমরা আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় তাঁরই সৃষ্ট ভূ-পৃষ্ঠে এবং তার বান্দাদের উপর কখনও দম্ভ-অহংকার করো না। আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে প্রত্যাবর্তনের সুনির্ধারিত সময় অতি নিকটবর্তী— এ প্রত্যাবর্তন সিদরাতুল-মুনতাহা, জান্নাতুল-মা'ওয়া ও ভরপুর বেহেশতী পেয়ালার দিকে। তোমরা সকলেই আমার সালাম গ্রহণ কর। আরও সালাম তাদের প্রতি, যারা আমার পর দ্বীন-ইসলামে প্রবেশ করবে।

বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে জিবরাঈল ! আমার পর উম্মতের নেগাহবান (রক্ষণাবেক্ষণকারী) কে হবে? এর জবাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত জিবরাঈলের নিকট ওহী করলেন ঃ আমার হাবীবকে সুসংবাদ দাও যে, তাঁর উম্মতের ব্যাপারে আমি তাঁকে লজ্জিত করবো না। তাঁকে আরও সুসংবাদ দাও যে, পুনরুত্থানের সময় তিনি সর্বপ্রথম যমীন থেকে বের হবেন ; হাশরের দিন তিনি সমবেত সকলের সর্দার হবেন এবং তাঁর উম্মত জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত অন্যান্য উম্মতের

জন্য জান্নাত হারাম থাকবে। নবীজী বললেন ঃ আমি শান্ত ও নিশ্চিন্ত হলাম।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুকুম করলেন সাত কূঁয়া থেকে সাত মোশক পানি সংগ্রহ করে তা দিয়ে তাঁকে গোসল করাতে। আমরা সে অনুযায়ী তাঁকে গোসল করানোর পর তিনি অনেকটা আরাম অনুভব করলেন। অতঃপর তিনি ঘর থেকে বের হলেন। এমনকি নামাযে ইমামতি করলেন, উহূদ জিহাদের শহীদানের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে ওসীয়ত করলেন ঃ হে মুহাজেরীন! তোমরা বৃদ্ধি পাবে, আর আনসারগণ যে অবস্থার উপর আছে, তার উপর বৃদ্ধি পাবে না। আনসারগণ আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, আমি তাদের কাছে আশ্রয় পেয়েছি। সুতরাং তোমরা তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও সম্মান কর, তাদের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে তা উপেক্ষা কর।

অতঃপর তিনি বললেন ঃ "আল্লাহ্ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার সমস্ত ধন-দৌলত ও সুখ-শান্তি দান করতে চাইলেন। কিন্তু সে তা গ্রহণ না করে আল্লাহ্কেই গ্রহণ করলো।" এ কথা শুনে হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) কাঁদতে লাগলেন ; তিনি বুঝে গেলেন যে, নবীজী নিজকেই উদ্দেশ্য করেছেন। হযরত আবূ বকর (রাযিঃ)-এর ব্যাকুলতা দেখে নবীজী তাঁকে শান্ত হতে বললেন, আরও বললেন যে, এই মসজিদের দিকে একমাত্র আবূ বকর ছাড়া অন্য কারও দরজা যেন খোলা না রাখা হয়। কেননা, প্রেম ও ভক্তির দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে আমি নিশ্চয়ই আবূ বকরকেই শ্রেষ্ঠ বলে জানি।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গৃহে, (পালাক্রমে নির্দিষ্ট) আমার দিনে এবং আমার কোলে ইনতেকাল করেন। সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা আমার লু'আব ও তাঁর লু'আব (মুখের লালা) একত্র করেছেন—আমার ভাই আবদুর রহমান এক খণ্ড মেসওয়াক হাতে আমার গৃহে উপস্থিত হোন। হযরত নবীজী এক দৃষ্টিতে মেসওয়াকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি মেসওয়াক করতে চাইছেন বুঝতে পেরে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম— মেসওয়াকটি আপনাকে দিবো? তিনি মস্তকে (সম্মতিসূচক) ইশারা করলেন। আমি তাঁকে মেসওয়াকটি দিলাম।

তিনি মুখে প্রবেশ করিয়ে মেসওয়াকটিকে শক্ত অনুভব করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম— মেসওয়াকটি আমি নরম করে দিবো? তিনি মস্তকে (সম্মতিসূচক) ইশারা করলেন। আমি তা নরম করে দিলাম। নবীজীর সম্মুখে পানির একটি মোশক রাখা ছিল। এর ভিতর তিনি হাত দিতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, বাস্তবিক মৃত্যুর যন্ত্রণা বড় কঠিন। অতঃপর তিনি উপরের দিকে হাত উঠিয়ে উচ্চারণ করলেন ঃ

الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى

"সেই প্রিয়তম বন্ধুকেই চাই।"

তখন আমার বুঝতে আর বাকী রইলো না যে, নবীজী এখন আর আমাদের মাঝে থাকতে রাজী নন।

হযরত সাঈদ ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ (রাযিঃ) আপন পিতা থেকে রেওয়ায়াত করেন যে, আনসারগণ যখন দেখলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে এসেছে, তখন মসজিদের চতুর্পার্শ্বে তারা ব্যাকুল হয়ে ঘুরতে লাগলেন। হযরত ফযল ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) নবীজীর নিকট হাজির হয়ে লোকদের এহেন অবস্থা জানালেন। অতঃপর হযরত আলী (রাযিঃ)-ও নবীজীর খেদমতে উপস্থিত হয়ে অনুরূপ জানালেন। পরিস্থিতি জেনে নবীজী বাইরের দিকে আপন হস্ত মোবারক সম্প্রসারণ করে বললেন, তোমরা আমার হাতখানি ধর। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর হাতখানি ধরে রাখলেন। হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তোমরা কি বলছো?" তাঁরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আপনার ওফাত হয়ে যায় আর স্ত্রীলোকেরা আপনার নিকট তাদের পুরুষদের জমা হওয়ার জন্য চিৎকার করতে লাগে। অতঃপর হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহস করে হযরত আলী ও হযরত ফযল (রাযিঃ)-এর কাঁধে ভর করে বের হলেন। হযরত আব্বাস (রাযিঃ) নবীজীর আগে আগে ছিলেন। নবীজীর মাথায় তখন পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি ধীরে ধীরে পা ফেলে অগ্রসর হয়ে মিম্বরের নীচের সিড়িটির উপর বসলেন। লোকজন সকলেই বসলো। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও সানা পাঠ করে বললেন ঃ "ওহে লোকসকল! আমি

জানতে পেরেছি, আমার মৃত্যুর ভয়ে তোমরা ভীত সন্ত্রস্ত। এর অর্থ হলো—প্রকারান্তরে তোমরা এ মৃত্যুকে অস্বীকার করছো। অথচ তোমাদের নবীর মৃত্যু কোন বিস্ময়কর বা অভূতপূর্ব বিষয় নয়। আমি কি তোমাদেরকে কোন মৃত্যুসংবাদ শুনাই নাই, অথবা তোমরাই কি এরূপ সংবাদ শুন নাই? আমার পূর্বের কোন নবী কি চিরকাল যিন্দা রয়েছেন? যার ফলে আমিও যিন্দা থেকে যাবো? শুনে নাও— আমি আমার পরওয়ারদিগারের সান্নিধ্য চাই, তোমরাও তার সাথে গিয়ে মিলবে। আমি তোমাদেরকে আওয়ালীন তথা প্রথম শ্রেণীর মুহাজিরগণের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য ওসীয়ত করছি আর মুহাজিরগণও পরস্পর যেন সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখে এ ওসীয়ত করছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

"যমানার কসম, নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং যারা নেক কাজ করে, এবং একে অপরকে সত্যের প্রতি উপদেশ দিতে থাকে, এবং একে অন্যকে (আমলের) পাবন্দ থাকার উপদেশ দিতে থাকে (তারাই ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে)।" (আছর ঃ ১–৩) জগতের প্রতিটি কাজ ও বিষয় আল্লাহ্র হুকুমেই সংঘটিত হয়। কোন বিষয়ে বিলম্ব হলে জলদি করতে নাই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা কারো তাড়াহুড়ার কারণে কোন বিষয় সময়ের পূর্বেই সংঘটিত করেন না। পরন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইচ্ছার বাইরে (সীমা লংঘন) করবে, সে পরাভূত হবে। আল্লাহ্কে যে ধোকা দিতে চেষ্টা করবে, সে নিজেই ধোকার মধ্যে পড়বে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ

"সুতরাং যদি তোমরা (যুদ্ধ হতে) সরে থাক, তবে কি তোমাদের এই

সম্ভাবনা আছে যে, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং পরস্পর আত্মীয়তা কর্তন করে ফেলবে?" (মুহাম্মদ ঃ ২২)

আমি তোমাদেরকে আনসারগণের সাথে সদ্ব্যবহার ও সুসম্পর্কের ওসীয়ত করছি। তারাই তোমাদের পূর্বে দারুল-ইসলামে (মদীনায়) এবং দ্বীন ও ঈমানের উপর অটল রয়েছে। কাজেই তাদের প্রতি তোমাদের এহসান ও সদ্ব্যবহার হওয়া চাই। তারা কি নিজেদের ফলমূলে তোমাদের অংশ রাখে নাই? তারা কি নিজেদের গৃহে তোমাদের আবাস দেয় নাই? তারা কি নিজেদের জীবনের উপর তোমাদের জীবনকে প্রাধান্য দেয় নাই? অথচ তাদের নিজেদেরও অভাব-অনটন ছিল? খবরদার! দুই ব্যক্তির উপরও যদি তোমাদের কেউ আমীর বা শাসক নিযুক্ত হয়, তবে তাঁদের নেক লোকদের উযর যেন কবূল করে এবং অন্যায়কারীকে মার্জনা করে। খবরদার! তাঁদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিও না। খবরদার! আমি তোমাদের জন্য সত্য ও সঠিক পথের দিশারী। অচিরেই আমার সাথে তোমাদের দেখা হবে। হাউজে-কাউসারে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি রইল। আমার হাউজে-কাউসার শ্যাম দেশের বুসরা থেকে ইয়ামানের সানআ পর্যন্ত দূরত্ব অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। হাউজে-কাউসারের পানি দুধের চেয়েও অধিক শুভ্র, মাখনের চেয়েও বেশী মোলায়েম, মধুর চেয়েও বেশী মিষ্ট ; তা থেকে একবার যে পান করবে সে পিপাসার্ত হবে না কোনদিন। হাউজের কাঁকরগুলো হচ্ছে মুক্তা ও মোতির দানার, আর নীচের যমীন হচ্ছে মুশকের। হাশরের ময়দানে যে ব্যক্তি এ থেকে বঞ্চিত হবে, সে আর সব রকম কল্যাণ ও সাফল্য থেকেও বঞ্চিত হবে। খবরদার! যে ব্যক্তি সেদিন আমার সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেন তার জিহ্বা ও হাতকে সংযত করে।

হযরত আব্বাস (রাযিঃ) আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কুরাইশদেরকে ওসীয়ত করুন। তিনি বললেন ঃ 'দ্বীনের ব্যাপারে আমি কুরাইশদেরকে ওসীয়ত করি। লোকেরা কুরাইশদের তাবে' বা অনুসারী— সৎ লোকেরা তাদের সৎ লোকের আর অসৎ লোকেরা তাদের অসৎ লোকের। সুতরাং কুরাইশদের উচিত হলো, মানুষের কল্যাণ ও হিতকামনা করা। হে লোকসকল! গুনাহ্ মানুষের সুখ-শান্তি ও নেআমতকে নষ্ট করে দেয় এবং সৌভাগ্যকে বদলিয়ে দেয়। সাধারণ লোকেরা যদি সৎ হয়, তবে

তাদের শাসকও সৎ হবে, আর যদি তারা অসৎ হয়, তবে তাদের শাসকও অসৎ হবে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظّٰلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

"আর এভাবেই আমি সংযুক্ত করে দেই জালেমদের কতিপয়কে তাদেরই কতিপয়ের সাথে তাদেরই কার্যকলাপের দরুন।" (আনআম ঃ ১২৯)

হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন ঃ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-কে বলেছেন ঃ হে আবূ বকর! তুমি কিছু বল। তখন তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার ওফাত কি নিকটবর্তী? তিনি বললেন ঃ হাঁ ;নিকটবর্তী আরও নিকটবর্তী। আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কাছে সংরক্ষিত নেআমত-রাজি আপনার জন্য মোবারক হোক, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আরও যদি এমন হতো যে, আমরা আমাদের পরিণাম সম্পর্কে জানতে পারতাম। হুযূর বললেন ঃ সিদরাতুল-মুনতাহার দিকে, তারপর জান্নাতুল-মা'ওয়া, উচ্চতর জান্নাতুল-ফেরদাউস,ভরপুর বেহেশতী পেয়ালা, প্রিয়তম বন্ধু ও পবিত্র নাজ-নেয়ামত ও প্রচুর আরাম-আয়েশের দিকে। আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে গোসল কে দিবে? বললেন ঃ আমার আহলে বাইত যারা। আরজ করলেন ঃ আপনাকে কিরূপ বস্ত্রে কাফন দেওয়া হবে? বললেন ঃ আমার পরিহিত এই পোষাকে, ইয়ামনী জোড়ায় এবং মিসরীয় সাদা কাপড়ে। আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার জানাযার নামায কে পড়াবে? এ কথা বলে আমরা কেঁদে ফেললাম, নবীজীও কাঁদলেন, অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তার নবীর পক্ষ থেকে তোমাদের উত্তম বিনিময় দন করুন ; তোমরা আমার গোসল ও কাফনকার্য সমাধা করার পর এ গৃহেই আমার কবরের পার্শ্বে জানাযার খাটলি রেখে দিও, অতঃপর কিছুক্ষণের জন্য তোমরা বাইরে চলে যেও। সর্বপ্রথম স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন আমার প্রতি দয়া ও রহমতের সালাত ও সালাম পড়বেন ঃ

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ

"তিনি ও তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের প্রতি রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।" (আহযাব ঃ ৪৩)

অতঃপর আমার জানাযার নামাযের জন্য ফেরেশতাগণ অনুমতিপ্রাপ্ত হবেন। সর্বপ্রথম তাঁদের মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তরপর হযরত মীকাঈল (আঃ) তারপর হযরত ইসরাফীল (আঃ) তারপর হযরত আযরাঈল (আঃ) প্রচুর ফেরেশতাদল সহকারে দরূদ ও নামায আদায় করবেন। তারপর অবশিষ্ট সকল ফেরেশতাগণ। অতঃপর তোমরা নামায আদায় করবে— পালাক্রমে দলবদ্ধ হয়ে তোমরা আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পড়বে, এ সময় কান্নাকাটি ও চিৎকার করে আমাকে কষ্ট দিও না। সর্বপ্রথম তোমাদের ইমামও আমার পরিবারবর্গ ও নিকট আত্মীয়গণ নামায পড়বে, তারপর মহিলাগণ এবং সর্বশেষে বালকেরা নামায পড়বে। আরজ করলেন ঃ আপনাকে কবরে কে স্থাপন করবে? তিনি বললেন ঃ আমার আহলে বাইতের মধ্যে নিকটতম আত্মীয়গণ। তাদের সঙ্গে থাকবেন বিপুলসংখ্যক ফেরেশতা, যাদেরকে তোমরা দেখবে না ; অথচ তারা তোমাদেরকে দেখবেন। এখন উঠ, আমার পক্ষ থেকে উম্মতের পরবর্তীদের নিকট দ্বীন পৌছিয়ে দাও।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের দিনটিতে শুরুভাগে যথেষ্ট আরাম বোধ করছিলেন। লোকেরা নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে কাজ–কর্মে মগ্ন হয়ে যায়। নবীজী তাঁর বিবিগণের সেবা–শুশ্রূষায় ছিলেন। আমরা এরূপ আনন্দিত ; যা ইতিপূর্বে আর হই নাই। এরই মধ্যে অকস্মাৎ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই স্ত্রীলোকেরাই অপেক্ষমান ফেরেশতার গৃহে প্রবেশে বাধা হয়ে রয়েছে ; এ ফেরেশতা আমার নিকট প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। এ কথা শুনে সকলেই ঘর থেকে বের হয়ে গেল ; কেবল আমিই রয়ে গেলাম। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শির মোবারক ছিল আমার কোলের উপর। ফেরেশতা গৃহে প্রবেশ করার পর নবীজী উঠে বসলেন, আমি গৃহের এক কোণে চলে গেলাম। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নবীজী ফেরেশতার সাথে একান্তে গোপন আলাপে মগ্ন রইলেন। অতঃপর তিনি আমাকে ডাকলেন এবং পুনরায় আপন শির মোবারক আমার কোলে

রাখলেন। অতঃপর অন্যান্য বিবিগণকে গৃহে প্রবেশের জন্য বললেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইনি কি হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসেছিলেন ? নবীজী বললেন ঃ না, মালাকুল-মউত হযরত আজরাঈল (আঃ) ; তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনার অনুমতি ছাড়া যেন গৃহে প্রবেশ না করি, এবং আপনি অনুমতি না দিলে যেন ফিরে যাই। আপনার অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশ করেছি। আল্লাহ্ আমাকে আরও হুকুম করেছেন যে, আপনার অনুমতি ছাড়া যেন আপনার রূহ কবজ না করি ; এখন আপনার কি হুকুম। নবীজী বললেন ঃ বিরত হোন, এই সময়টা হযরত জিবরাঈল (আঃ)এর উপস্থিতির সময়।"

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ এহেন অবস্থায় আমরা হতবাক ছিলাম, কি করবো কি না করবো কিছুই স্থির করতে পারছিলাম না। কারও মুখে কোন কথা বেরুচ্ছিল না ; দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তায় সকলেই ভারাক্রান্ত, আমাদের উপর বিরাট এক মুসীবত, ফলে সকলেই নির্বাক অস্থির ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ ইতিমধ্যে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তশরীফ আনয়ন করলেন এবং সালাম দিলেন। আমি তার আগমন ও কথা অনুভব করেছিলাম। উপস্থিত পরিবারবর্গ ও নিকট-আত্মীয়গণ বের হয়ে যাওয়ার পর হযরত জিবরাঈল (আঃ) গৃহে প্রবেশ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সালাম বলেছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আপনার অবস্থা এখন কেমন? যদিও তিনি সর্ববিষয় পরিজ্ঞাত, কিন্তু আপনার মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য এবং সমস্ত মাখলূকাতের উপর আপনার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তিনি এরূপ জিজ্ঞাসা করেছেন। সেইসঙ্গে আপনার উম্মতের মধ্যে এর প্রচলন ঘটানোও উদ্দেশ্য। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি অসুস্থতায় কাতর হয়ে গেছি। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ আপনি সুসংবাদ নিন— আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সেই স্থানে শীঘ্রই পৌছাবেন, যে স্থানটিকে শুধু আপনার জন্যই প্রস্তুত করে রেখেছেন। নবীজী বললেন ঃ হে জিবরাঈল ! মালাকুল-মউত অনুমতি নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন ; তিনি আমাকে আমার বিষয় জানিয়েছেন। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ !

আপনার পরওয়ারদিগার আপনার প্রতি উদ্‌গ্রীব ; হযরত জিবরাঈল কি এ বিষয় আপনাকে জ্ঞাত করেন নাই? আল্লাহ্‌র কসম, আজ পর্যন্ত মালাকুল-মউত কারও নিকট অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও তা করবেন না। কিন্তু আপনার পরওয়ারদিগার আপনার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চান। তিনি আপনার প্রতি উদ্‌গ্রীব। সুতরাং হযরত মালাকুল-মউত উপস্থিত হলে তাঁকে ফিরাবেন না। অতঃপর হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তিনি বললেন ঃ হে ফাতেমা! আমার নিকটবর্তী হও। হযরত ফাতেমা অতি সন্নিকটবর্তী হলে নবীজী কানে কানে কি যেন এক গোপন কথা বললেন। নবী-তনয়া এরপর কাঁদতে লাগলেন ; এমনকি তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। অতঃপর নবীজী তাঁকে পুনরায় নিকটবর্তী হতে বললেন। নবীজী তাঁর কানে কানে আর একটি গোপন কথা বললেন। এবার হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) হেসে উঠলেন ; এমনকি তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। আমরা এটা একটা আশ্চর্যকর বিষয় দেখলাম। পরবর্তীতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এর রহস্য খুলে বলেছেন যে, প্রথমবার নবীজী তাঁর আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছিলেন বলে আমি কেঁদেছিলাম। দ্বিতীয়বার তিনি জানান যে, তাঁর পরিবারের মধ্যে আমি সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে বেহেশতে মিলিত হবো। এইজন্যই আমি হেসেছিলাম। অতঃপর নবীজী হযরত ফাতেমা যাহরা (রাযিঃ)-এর দুই পুত্রকে নিকটে এনে তাদেরকে চুম্বন করলেন।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরও বলেন ঃ অতঃপর হযরত মালাকুল-মউত তশরীফ আনয়ন করেন এবং সালাম দিয়ে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। নবীজী তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। মালাকুল-মউত নবীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এবার আপনার কি মর্জ্জী, বলুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

أَلْحِقْنِي بِرَبِّي الْآنَ

"পরওয়ারদিগারের সান্নিধ্যে এখন আমাকে পৌছিয়ে দিন।"

তিনি বললেন ঃ হাঁ, আজকের দিনেই তা হবে। আপনার পরওয়ারদিগার আপনার প্রতি উদ্‌গ্রীব। একমাত্র আপনি ব্যতীত বারবার আমি অন্য কারও

নিকট যাই নাই, এবং আপনি ছাড়া আর কারও নিকট আমি অনুমতির অপেক্ষাও করি নাই। তবে এখনও কিছু সময় বাকি আছে। এই বলে হযরত মালাকুল মউত বের হয়ে যান। ইতিমধ্যে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তশরীফ আনয়ন করেন। নবীজীকে সালাম দিয়ে গৃহে প্রবেশ করে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দুনিয়াতে আমার এই সর্বশেষ অবতরণ, ওহী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ; সবকিছু গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে, দুনিয়ার জীবনও তার শেষ প্রান্তে। আপনার কাছে উপস্থিত হওয়াটাই দুনিয়াতে আমার কাজ ছিল ; অন্য কোন প্রয়োজন দুনিয়ার সাথে আমার আর নাই ; এখন আমি আমার স্থানেই অবস্থান করবো। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ সেই পবিত্র সত্তার কসম, যিনি মুহাম্মদকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন—তখন এমন অবস্থা দেখা গেছে যে, কারও ক্ষমতা নাই যে, সামান্যতম টু শব্দটিও করবে, আর না সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে কাউকে সংবাদ প্রেরণের কোন অবকাশ ছিল। সুতরাং আমরা যা শুনছিলাম ও অনুভব করছিলাম, তা শুনে ও অনুভব করেই রয়ে গেলাম ; আর আমাদের হৃদয়ে ছিল তখন ভয় আর দুঃখ।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শির মোবারক আমার কোলে রাখার জন্য আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। এক পর্যায়ে তিনি বেঁহুশ হয়ে গেলেন। তখন তাঁর চেহারা এতো বেশী ঘর্মাক্ত হয়ে গেল যে, এরূপ ঘর্মাক্ত হতে আমি আর কাউকে দেখি নাই। আমি তাঁর চেহারা হতে ঘাম মুছতে লাগলাম। তখন এতে আমি এমন খোশবূ অনুভব করলাম যে, এরচেয়ে উত্তম খোশবূ আমি কোনদিন আর কোথাও পায় নাই। নবীজীর চৈতন্য ফিরে আসলে আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উপর আমার মা-বাপ কুরবান হোন—আপনার চেহারা মোবারক প্রচুর ঘামাচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! ঈমানদারের জান ঘাম দিয়েই বের হয়, আর কাফেরের জান চোয়াল দিয়েই বের হয় ; যেমন গাধার জান বের হয়ে থাকে। এ কথা শুনে আমরা কেঁপে উঠলাম। অতঃপর অন্যান্যদের উপস্থিত হওয়ার জন্য খবর প্রেরণ করলাম। সর্বপ্রথম আমার ভাই উপস্থিত হলেন ; তাকে আমার পিতা আমার নিকট পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি উপস্থিত হওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে যায়। এমনিভাবে

অন্যান্যরাও হুযূরের ওফাতের পরই উপস্থিত হলেন। এভাবে মৃত্যুর পূর্বে কারও উপস্থিত হতে না পারার তাৎপর্য হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার মর্জীতে এরূপ হয়েছে যে, এ সময় হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈল (আঃ) বন্ধুরূপে ছিলেন। যখন নবীজীর বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো, তখন বলতেন ঃ

الرَّفِيقَ الْأَعْلَى

"পরম প্রিয়তম বন্ধুর সান্নিধ্য চাই।"

যখন তিনি কিছুটা কথা বলার মত হলেন, তখন বললেন ঃ

اَلصَّلٰوةَ الصَّلٰوةَ اِنَّكُمْ لَا تَزَالُوْنَ مُتَمَاسِكِيْنَ مَا صَلَّيْتُمْ جَمِيْعًا

"নামায, নামায ; তোমরা সকলে যতদিন নামাযের উপর দৃঢ় থাকবে, ততদিন তোমরা দ্বীন ও ঈমানের উপরও প্রতিষ্ঠিত থাকবে।"

এই নামাযের ওসীয়ত তিনি ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত এভাবে বারবার করতে থাকেন ঃ

اَلصَّلٰوةَ الصَّلٰوةَ

"নামায, নামায।"

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ "রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয় সোমবার দিন চাশত এবং দ্বিপ্রহরের মাঝামাঝি সময়ে।" হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (রাযিঃ) বলেন ঃ "সোমবার দিনে আমি (হুযূরের ইনতেকালে) যে শোক ও দুঃখের সম্মুখীন হয়েছি, এ দিনটিতে উম্মতের বড় বড় দুঃখ রয়েছে।" অথবা হযরত উম্মে কুলসুম (রাযিঃ) অনুরূপ উক্তি করেছিলেন, যেদিন হযরত আলী (রাযিঃ)–কে তীরবিদ্ধ করে নিহত করা হয়।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের দিন লোকদের খুব বেশী ভীড় হয়ে যায় এবং কান্নাকাটির আওয়াজ আসতে লাগে, তখন ফেরেশতাগণ আমার কাপড় দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলেন। মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর মতভেদ দেখা দিল।

কেউ বললেন, হুযূরের ওফাত হয় নাই। দুঃখ ও বেদনায় কারও কারও যবান বন্ধ হয়ে গেল ; অনেক দেরীতে কথা বলতে পারলেন। বিভিন্ন ধরণের অবস্থা তাদের উপর ছেয়ে আসলো। হযরত উমর (রাযিঃ) হুযূরের মৃত্যুকে অস্বীকার করছিলেন। (দুঃখ ও বেদনায় কাতর হয়ে এমন হয়েছিল)। হযরত আলী (রাযিঃ) দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে বসে পড়লেন। হযরত উসমান (রাযিঃ) কথা বলতে অপারগ হয়ে গেলেন। কেবল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত আব্বাস (রাযিঃ)-এর অবস্থা আপন নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু লোকেরা হযরত আবূ বকরের কথায় কর্ণপাত করছিল না। অবশেষে হযরত আব্বাস (রাযিঃ) তশরীফ এনে বললেন ঃ

وَاللّٰهِ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَقَدْ ذَاقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْتَ وَلَقَدْ قَالَ وَهُوَ بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ۝ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ۝

"একমাত্র মা'বূদ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কসম, নিঃসন্দেহে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছেন। তিনি নিজেই যখন তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন, তখন এ আয়াত তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন ঃ "হে নবী ! আপনাকেও মরতে হবে, এবং তারাও মরবেই। তারপর কিয়ামত-দিবসে তোমরা স্বীয় পরওয়ারদিগার-সমীপে মোকদ্দমা পেশ করবে।" (যুমার ঃ ৩১)

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) নবীজীর ওফাতের সময় বনী হারস ইব্নে খাযরাজের নিকট ছিলেন। সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ হাজির হলেন, অপলক নেত্রে নবীজীর মোবারক চেহারাখানির প্রতি তাকিয়ে রইলেন এবং কপালে চুম্বন করে বললেন ঃ

بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُذِيْقَكَ الْمَوْتَ مَرَّتَيْنِ

فَقَدْ وَاللّٰهِ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উপর আমার মা-বাপ কুরবান হোন ; আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দু' বার মৃত্যু আস্বাদন করাবেন না। অবশ্যই অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে গেছে।"

অতঃপর তিনি গৃহ থেকে বের হয়ে সমবেত লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَاِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ رَبَّ مُحَمَّدٍ فَاِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ط الاٰية

"ভাইসব! তোমরা যারা রাসূলুল্লাহ্‌র ইবাদত করেছো, তাদের জন্য তাঁর মৃত্যু হয়েছে জানবে। আর যারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করেছো, তারা জেনে রাখ-- আল্লাহ্ জীবিত এবং কখনও তাঁর মৃত্যু হবে না। অতঃপর তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ "মুহাম্মদ একজন রাসূল ব্যতীত কিছুই নন। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল গত হয়ে গেছেন। যদি তিনি মারা যান কিংবা নিহত হোন, তবে কি তোমরা পিছনের (পূর্বমতের) দিকে ফিরে যাবে।" (আলি-ইমরান ঃ ১৪৪)

লোকদের অবস্থা এই হলো যে, তারা আজকেই যেন প্রথম এ আয়াত শ্রবণ করলেন।

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) সংবাদ পাওয়া মাত্রই এসে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের গৃহে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি দরূদ শরীফ পড়ছিলেন আর হেঁচকি নিয়ে কাঁদছিলেন। তার চোখ বেয়ে ভরা কলসী থেকে ঢালা পানির ন্যায় অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ও দৃঢ়তায় পর্বতসম

মজবূত ছিলেন। নবীজীর মোবারক চেহারার উপর থেকে আবরণখানি তুলে তাঁর কপাল চুম্বন করলেন, চেহারায় হাত বুলালেন আর কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ আপনার উপর আমার মা-বাপ, পরিবার-পরিজন ও আমার জান কুরবান, আপনি জীবনে-মরণে সর্বাবস্থায় আনন্দময় রয়েছেন। আপনার ওফাতের পর ওহীর ধারা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল, যা ইতিপূর্বে আর কোন নবীর বেলায় হয় নাই। আপনি সুমহান ও শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিকারী, কাঁদাকাটির বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন আপনি। আপনি নিজ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য গুণেই সুখী, শান্ত ও সংরক্ষিত রয়েছেন ; এমনকি আপনার পূর্বাপর অবস্থা আমাদের কাছে একই রয়েছে। যদি মৃত্যু আপনার কাংক্ষিত ও পছন্দনীয় না হতো, তবে আপনার বিচ্ছেদে আমরা প্রাণ দিয়ে দিতাম, যদি আপনি আমাদেরকে কাঁদতে নিষেধ না করতেন, তবে আমরা আপনার জন্য অশ্রুর ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিতাম, আর যে বিষয়টি আমাদের শক্তি-সামর্থের বাইরে অর্থাৎ বিচ্ছেদ-বেদনা ; তা অবশ্যই থেকে যাবে ; কোনদিন ভুলা যাবে না। আয় আল্লাহ্! আমাদের এ কথাগুলো আপনার হাবীবের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট আমাদের স্মরণ করুন, আপনি নিজেও আমাদেরকে স্মরণ করুন। আপনি যদি আমাদেরকে ধৈর্য ও স্থিরতার শিক্ষা না দিতেন, তাহলে এই ব্যথা ও বেদনায় আমাদের কেউ দাঁড়াতে পারতো না। আয় আল্লাহ্! আপনার নবীর কাছে আমাদের এ আর্জীগুলো পৌঁছিয়ে দিন এবং আমাদেরকে নেক আমলের তওফীক দিন।

هَذَا اٰخِرُ مَا اَقْدَرَنَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَجَذَبَ قُلُوْبَنَا اِلَيْهِ لِيَكُوْنَ لَنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَنَرْجُوْ مِنَ اللّٰهِ اَنْ يُبَدِّلَ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ وَاَنْ يُلْحِقَنَا بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْاِيْمَانِ اِنَّهُ اَكْرَمُ مَسْؤُوْلٍ وَاَعَزُّ مَاْمُوْلٍ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

[মুকাশাফাতুল কুলূব পূর্ণ সমাপ্ত]